হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সুচিপত্র

বিশাল গড়ের দুঃশাসন

পূর্বার্ধ
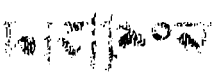
ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুর

বিশালগড় আগে ছিল স্বাধীন দেশীয় রাজ্য।

বিশালগড়ের স্বাধীনতা আজ আর নেই বটে, কিন্তু তার অধিকারীকে এখনও লোকে স্বাধীন রাজার মতোই ভয় ও ভক্তি করে। তাঁর নাম রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ।

মধ্যভারতের বিন্ধ্য শৈলমালার ছায়ায় বসে এই বিশালগড় আজও যেন তাকিয়ে আছে সেই সুদূর অতীতের দিকেই। তার চারিপাশেই আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন নেই কিছুমাত্র। কারণ, রাজার জমিদারি থেকে অনেক তফাতেই নির্মাণ করা হয়েছে এই বিশালগড় নামে দুর্গপ্রাসাদখানি। তার চারিদিকেই বিরাজ করছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের পর পাহাড়, গিরিশিখরের পর গিরিশিখর, বিপুল অরণ্যের গহন শ্যামলতা, শস্যহীন প্রান্তর, কলরবে মুখরা গিরিতরঙ্গিনী। সেখানে শব্দ সৃষ্টি করে কেবল নিবিড় বনের পত্রমর্মর ও নানান জাতের বিহঙ্গেরা, এবং সেখানে নৈশ আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে থেকে থেকে নিশাচর বাদুড়ের আন্দোলিত পক্ষ, আর কালপেচকের কর্কশ কণ্ঠ, আর বনবাসী হিংস্র পশুদের ভয়াল গর্জন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন এক স্থানে বিশালগড়ের দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একটিমাত্র পথ দিয়ে প্রাসাদের তোরণদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। সে পথও এমনি দুর্গম ও বন্ধুর যে, কোনও সাধারণ পথিককেই তা আকৃষ্ট করতে পারে না। কখনও নতোন্নত পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও বেগবতী স্রোতস্বতীর উপরকার জীর্ণ সেতুকে আশ্রয় করে, কখনও ধু-ধু প্রান্তরের একটি অংশকে চিহ্নিত করে এবং কখনও বা দিনেরবেলাতেও বিজন বনের অন্ধকারকে ভেদ করে সেই সুদীর্ঘ পথ অজগরের মতো এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে বিশালগড় অভিমুখে।

এই বিচিত্র দুর্গপ্রাসাদের বয়স কত, এখনকার কেউ তা জানে না। তবে আকার দেখে মনে হয়, বহু শতাব্দীর বহু ঋতু তার উপরে রেখে গিয়েছে আপন-আপন হাতের চিহ্ন। অভিশপ্ত তার মূর্তি! কোথাও তার কঠিন পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে শূন্যের দিকে বাহু বিস্তার করেছে রীতিমতো বড়ো বড়ো অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, কোথাও তার দেওয়ালের বাঁধন ছেড়ে নীচেকার ভূমিকে আশ্রয় করেছে ছোটো-বড়ো পাথরের পর পাথরের খণ্ড, এবং কোথাও বা তার সু-উচ্চ দেওয়াল এমনভাবে হেলে পড়েছে যে দেখলেই মনে হয়, তারা সশব্দে মাটির উপরে আছড়ে পড়বে এই মুহূর্তেই। লোকে বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরকে জানে ধনকুবের বলে। কিন্তু বিশালগড়ের ছন্নছাড়া মূর্তি দেখলে লোকের এই ধারণাকে একটুও সত্য বলে মনে হয় না। রাজার সম্বন্ধে লোকে আরও অনেক আশ্চর্য কথাই বলে। কিন্তু সে সব কথায় কান

পাতবার আগে আপনারা আমার কাহিনী শ্রবণ করুন। আমি যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, তাই এখানে অকপটে লিপিবদ্ধ করতে চাই। এ কাহিনী এতই ভয়াবহ, এতই রোমাঞ্চকর এবং এতই অপার্থিব যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অনেকে আমাকে যদি উন্মাদগ্রস্ত বলে ভাবেন, তাহলেও আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু লোকের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না আমার। কারণ আমি নিজে স্বচক্ষে যা দর্শন করেছি তা অসত্য নয় বলেই মনে করি।

এইবারে আমার নিজের কথা আরম্ভ। আমি কলকাতার এক অ্যাটর্নি-বাড়ির শিক্ষানবিশ, এবং নিজেও অ্যাটর্নি হবার জন্যে শেষ পরীক্ষা দিয়েছি। বিশালগড়ের রাজা আমাদের অফিসে পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক বিঘা জমি সমেত তিনি একখানি সুবৃহৎ বাগানবাড়ি ক্রয় করতে চান। এবং সেইসঙ্গে তিনি আর একটি অদ্ভুত অনুরোধও করেছেন। বাগানবাড়িখানি খুব জীর্ণ ও পুরাতন হলেই তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এ-রকম অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের অফিসে আর কখনও আসেনি।

কর্তা আমাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো বিনয়, লোকটির মাথায় বোধহয় দস্তুরমতো ছিট আছে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। সে পাগলই হোক, আর ছিটগ্রস্তই হোক, মক্কেল হচ্ছে মক্কেল। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেলেই আমরা তুষ্ট হব। কী বলো, তোমার কী মত?'

—'আজ্ঞে, আমারও ওই মত।'

—'এখন শোনো। এই ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুরটি যে-রকম বাড়ি চান, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইরকমই একখানা বাড়ি আমাদের হাতে আছে। কলকাতার খুব কাছেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে থাকলেও ওই বাড়িখানাকে কেউ কিনতে চায় না। কারণ সবাই বলে, ওখানা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি। আমি মনে করছি, রাজাবাহাদুরকে ওই বাড়িখানিই কিনতে বলব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?'

—'কেন হবে না?'

—'রাজা পুরোনো বাড়ি চেয়েছেন বটে, কিন্তু ভুতুড়ে বাড়ির উপরে তাঁর কোনও লোভ না থাকতেও পারে।'

কর্তা বললেন, 'বাপু, আমি মক্কেলকে ঠকাব না। তিনি কেনবার আগেই তাঁকে ওই দুর্নামের কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু সে কথা যাক। এখন তোমাকে ডেকেছি কেন, শোনো। রাজা থাকেন মধ্যভারতের বিশালগড়ে। তুমি কি বিশালগড়ের নাম শুনেছ?'

—'আজ্ঞে না, বিশালগড় যে কোথায় তাও আমি জানি না।'

—'তোমার জানবার বিশেষ দরকারও নেই। কারণ, একখানি কাগজে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে তোমার হাতে আমি দেব। তা দেখলেই তুমি অনায়াসে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারবে, কারণ আমি স্থির করেছি, বিশালগড়ের রাজার কাছে পাঠাব তোমাকেই। রাজার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহারও হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, যথাস্থানে আর যথাসময়ে আমার প্রতিনিধির জন্যে তাঁর গাড়ি উপস্থিত থাকবে। কালই তোমাকে বিশালগড়ে যাত্রা করতে হবে।'

দুই
শরীরী প্রেত

যথাসময়ে রেলপথে বিশালগড় এস্টেটের কাছারিবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, রাজার জমিদারি বিশালগড় নামে পরিচিত হলেও আসল বিশালগড় আছে সেখান থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে। রাজা নাকি বেশির ভাগ সময়েই সেইখানেই থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলেও আমারও সেখানে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কাছারিবাড়িতে আমার নামে লেখা রাজা রুদ্রপ্রতাপের একখানি পত্রও পেলুম। তাতে লেখা আছে

'প্রিয় বিনয়বাবু,

আশা করি আপনি নিরাপদে আমার দেশে এসে পৌঁছেছেন। ওখান থেকে আমার প্রাসাদ অবশ্য খুব কাছে নয়, কিন্তু সেজন্যে আপনার চিন্তার কারণ নেই, কারণ ওখান থেকে গোরুর গাড়ি চড়ে আপনি অনায়াসে 'পঞ্চগ্রাম' পর্যন্ত আসতে পারবেন। সকালে বা দুপুরে কোনও একটা সময়ে গোরুর গাড়ি আপনাকে পঞ্চগ্রামে পৌঁছে দেবে। সেখানে একখানি সরাই আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি সেইখানেই অপেক্ষা করবেন। তারপর আমার নিজের গাড়ি আপনাকে আনবার জন্যে পঞ্চগ্রামে উপস্থিত হবে। ইতি

রুদ্রপ্রতাপ'

পঞ্চগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সরাই খুঁজে নিতে দেরি হল না। ছোটো সরাই, আমার মতন আরও কয়েকজন পথিকও এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এবং তাদের তদারক করছেন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তিনিই নাকি সরাইয়ের মালিক। তিনি বিধবা; এই সরাই থেকে যে আয় হয় তার দ্বারাই তাঁর সংসার চলে যায়।

আমার মতন লোক এই সরাইয়ে বোধহয় বেশি আসে না। কারণ, আমার পরিচ্ছদ দেখে অনেকেরই চোখ হয়ে উঠল যেন সচকিত। তারা চুপিচুপি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগল। কিন্তু তাদের চোখ-মুখ দেখে বেশ বুঝলুম যে তারা আলোচনা করছে আমার সম্পর্কেই।

সরাইয়ের বৃদ্ধা অধিকারিণী হিন্দি ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললুম, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি, যাব বিশালগড় রাজপ্রাসাদে।'

বৃদ্ধা যে রীতিমতো চমকে উঠলেন, সেটা আমার নজর এড়াল না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি বিশালগড় রাজপ্রাসাদে যাবেন! কেন?'

—'রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে ডেকেছেন।'

বৃদ্ধার মুখের উপর দিয়ে যেন কেমন একটা কালো ছায়া পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি যেন উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, 'রাজাবাহাদুর আপনাকে ডেকেছেন! রাজা রুদ্রপ্রতাপ?'

—'হ্যাঁ, তিনিই। কিন্তু রাজার নামে আপনি যেন কিছু বিচলিত হয়েছেন। এর কারণ কী?'

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এর কিছুই কারণ নেই বাবুজি! আপনি তো সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন? আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দি।'

দুপুরে খাবার জন্যে আমার ডাক পড়ল। খাবার ঘরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক প্রবেশ করল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসল।

খেতে খেতে বেশ লক্ষ করলুম, সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে। সকলেরই চোখে ফুটে উঠেছে যেন একটা ভয়ের ও করুণার ভাব। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, এ-রকম দৃষ্টির অর্থ কী হতে পারে?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ একটি মাঝবয়সি লোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'মশাই, ক্ষমা করবেন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

আমি হেসে বললুম, 'অনায়াসেই।'

—'শুনলুম, আপনি নাকি বিশালগড়ের রাজবাড়িতে যাচ্ছেন?'

—'ঠিকই শুনেছেন।'

—'আপনি এর আগে কখনও এখানে এসেছেন?'

—'না।'

—'বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

—'না।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এখান থেকে বিশালগড়ের রাজবাড়ি হচ্ছে ত্রিশ মাইল দূরে। কেমন করে আপনি এই পথটা পার হবেন?'

—'রাজাবাহাদুরের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে।'

ঘরের ও-কোণ থেকে হঠাৎ আর-একজন লোক ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'আজ হচ্ছে অমাবস্যার শনিবার!'

আর-একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি স্বরেই বললে, 'তার উপরে আবার সন্ধ্যার সময়ে!'

আরও তিন-চারজন লোকের কণ্ঠে ফুটল অস্ফুট আর্তধ্বনি। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অবাক হয়ে এর-তার-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম। অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা এদের কাছে এমন কী গুরুতর অপরাধ করেছে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষটা জিজ্ঞাসা করলুম, 'মশাই, অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের এত বেশি মাথাব্যথা কেন? দেখছি, আপনারা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না!'

খানিকক্ষণ কেউ আর কোনও সাড়া দিলে না; সকলে আহার করতে লাগল নীরবে। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়েছে এবং আমি যখন উঠি-উঠি করছি, তখন প্রথম যে মাঝবয়সি লোকটি কথা কয়েছিলেন তিনি বললেন, 'আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ভদ্রলোক প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'এ অঞ্চলের সবাই কী বিশ্বাস করে জানেন? বিশালগড়ের দিকে যেতে ওই যে নিবিড় অরণ্য দেখছেন, প্রতি অমাবস্যার শনিবারে সেখানে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তখন বনের ভিতরে যে-সব নিশাচর আনাগোনা করে, লোকে বলে তারা মানুষ নয়।'

আমি হেসে বললুম, 'রাত্রে বনে বনে যারা বেড়ায় তারা যে মানুষ নয়, একথা সকলেই জানে। বনের জীব হচ্ছে বাঘ, ভাল্লুক, শেয়াল। তারাই তো নিশাচর।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, আমি বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলছি না।'

—'তবে আপনি কাদের কথা বলছেন?'

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাদের নাম আমি মুখে আনতে পারব না। এইটুকু জেনে রাখুন, তারা বাঘ-ভাল্লুকও নয়, আর মানুষও নয়।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'ও, আপনি বুঝি ভূত-প্রেতের কথা বলছেন? কিন্তু আমরা হচ্ছি কলকাতার ছেলে, কলেজে বিজ্ঞান পড়েছি। 'ভূতপ্রেত' শব্দ আমাদের অভিধানে নেই। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। আর ভূত থাকলেও তারা তো অশরীরী, আমাদের মতো শরীরী মানুষের কোনওই অনিষ্ট তারা করতে পারে না।'

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। একটা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে আর-একজন লোক বললে, 'বাবুজি, আপনি কি শরীরী প্রেতের কথা কখনও শোনেননি?'

—'না। কখনও শুনিওনি, কখনও দেখিওনি, আর কখনও দেখবার বা শোনবার আশাও করি না।' এই বলে আমিও আসন ছেড়ে উঠে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

পথশ্রমে শরীরটা কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাচারেক একটানা নিদ্রার পর জেগে উঠে দেখি, সন্ধ্যাসমাগমের আর বেশি বিলম্ব নেই। জানলা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সামনের নিবিড় অরণ্যের উপর দিয়ে দলে দলে বক আর বুনো হাঁস বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। নীচের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরও একজন মানুষও নজরে পড়ল না। সবাই যেন সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে কোন অজানা আতঙ্কে। কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়েও সেই আতঙ্কটা যে কী তা আন্দাজ করতে পারলুম না। শরীরী প্রেত? প্রেত কি কখনও শরীরী হতে পারে? প্রেতের কথা যদি মানা যায় তাহলেও দেখা যায়, মানুষের আত্মা নিরেট দেহ ত্যাগ করবার পরই 'প্রেতাত্মা' আখ্যা লাভ করে। তার পক্ষে শরীরী হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে চারিদিক ছেয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপরেই দেখতে পেলুম, অরণ্যের ওদিককার অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে দুটো আলো। ঘোড়ার পায়ের ও গাড়ির চাকার শব্দও শুনতে পেলুম।

কিছুক্ষণ পরে একখানা গাড়ি এসে থামল সরাইয়ের সামনে।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন সরাইয়ের মালিক সেই বৃদ্ধা। অল্পক্ষণ করুণ চোখে আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বাবুজি, রাজাবাহাদুরের গাড়ি এসেছে।'

আমি তখন উঠে পড়ে নিজের সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

বৃদ্ধা তখনও সেখান থেকে চলে গেলেন না। আমি ভাবলুম, তিনি নিজের পাওনা বুঝে নিতে এসেছেন। মনিব্যাগটা বার করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

বৃদ্ধা ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'বাবুজি, আপনার যা খুশি হয় দেবেন। আমি পাওনা আদায় করবার জন্যে এখানে আসিনি।'

—'তবে আপনি কী চান?'

—'আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি খালি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কি সত্যসত্যই ওই গাড়িতে চড়ে আজ রাত্রে বিশালগড়ে যেতে চান?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি চলবে না?'

—'না। কাল সকালে আবার আমি এখানে ফিরে এসে দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় যেতে চাই।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু রাজা কি আপনাকে ফিরতে দেবেন?'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফিরতে দেবেন না মানে?'

বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না বাবুজি, আমার কথার কোনও মানে নেই। আমি শুধু কথার কথা বললুম। আচ্ছা, আজ যদি নিতান্তই যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবার আসছি।'

বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

একটু পরেই বৃদ্ধা আবার ফিরে এলেন, তারপর আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, 'আমার একটি ছেলে ছিল, আপনাকে অনেকটা তারই মতো দেখতে।'

—'আপনার সে ছেলেটি এখন বেঁচে নেই?'

বৃদ্ধার দুই চক্ষু হয়ে উঠল সজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না বাবু, আজ তিন বছর তাকে হারিয়েছি। আপনাকে দেখে তার কথা আবার নতুন করে আমার মনে জেগে উঠেছে।'

আমি দরদভরা কণ্ঠে বললুম, 'আহা, আপনার কথা শুনে আমারও দুঃখ হচ্ছে। আপনার ছেলের কী অসুখ হয়েছিল?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, 'বাবুজি, তার কোনওই অসুখ হয়নি। এক রাতে ওই বনের ভিতরে গিয়ে সে আর আমার কাছে ফিরে আসেনি। তাই তো আমি ভয় পাচ্ছি বাবুজি, তাই তো আমার ইচ্ছা নয় যে আজ রাত্রে আপনি ওই বনের ভিতরে যান।'

বৃদ্ধার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝে আমি সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললুম, 'না মা, আমার কোনও বিপদ হবে না—আমি তো যাচ্ছি রাজাবাহাদুরের গাড়িতে।'

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, 'তাই তো আমার বেশি ভয় হচ্ছে বাবুজি, তাই তো আমি আপনার জন্যে এত ভাবছি!'

আমি আবার বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'রাজাবাহাদুরের গাড়িতে যাচ্ছি বলে আপনার ভয় আরও বেড়ে উঠেছে! এ কেমন কথা?'

বৃদ্ধা আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না বাবুজি, আবার আমি ভুল বলছি। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ও-সব কথা যাক। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

—'কী অনুরোধ?'

কাপড়ের ভিতর থেকে একটা জিনিস বার করে বৃদ্ধা বললেন, 'এই কবচখানা আমি আপনার গলায় পরিয়ে দিতে চাই। এতে আপনি আপত্তি করবেন না তো?'

—'কী আশ্চর্য, আমার জন্যে আপনি কবচ এনেছেন কেন! এ কবচ নিয়ে আমি কী করব?'

—'আপনাকে কিছুই করতে হবে না বাবুজি, এ কবচখানা সর্বদাই যেন আপনার গলায় থাকে।'

—'তাতে আমার কী উপকার হবে?'

—'উপকার কী হবে জানি না, তবে অপকার কিছু হবে না। এ হচ্ছে রক্ষাকবচ। এ কবচ গলায় থাকলে কোনও অপদেবতা আপনার কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'এখানকার আর সকলের মতো আপনিও বুঝি অপদেবতার ভয় করছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, আমি নিজে অপদেবতাকে ভয় করি না, এমনকি অপদেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করি না।'

বৃদ্ধা মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, 'বাবুজি, আপনি অপদেবতা মানুন আর নাই-ই মানুন, এই কবচখানা গলায় পরে থাকতে ক্ষতি কী? বুড়ির এই কথাটি কি আপনি রাখবেন না?'

আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। কবচখানা পরতে অস্বীকার করলে এই স্নেহময়ী প্রাচীনা নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে আঘাত পাবেন।

বৃদ্ধা রেশমি সুতোয় বাঁধা একখানি তামার কবচ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সরাইখানার বাইরে গিয়ে দেখি, চারিদিকের অন্ধকার হয়ে উঠেছে আরও ঘন, আরও নিরেট—তা ভেদ করে দুই হাত দূরেও নজর চলে না। দুই হাতের ভিতরেও যা দেখা যায়, তাও হচ্ছে আবছায়ার মতো।

হঠাৎ সরাইখানার দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে আমার কানে কানে বললে, 'বাবু, রাত বারোটার সময় বিশেষ সাবধানে থাকবেন। বনের যত ভয়, জেগে ওঠে ওই সময়েই।'

রাস্তার উপর থেকে খনখনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে একজন সকৌতুকে হেসে উঠল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সামনেই রয়েছে একখানা টোঙাগাড়ি, আর তার ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দীর্ঘ মূর্তি।

সবই দেখা গেল ভাসা-ভাসা, ঝাপসা। কিন্তু হাসল যে ওই মূর্তিটাই, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। মূর্তি এবার দুই পা এগিয়ে এসে বললে, 'বিনয়বাবু, ওই লোকটা আপনাকে এমন চুপিচুপি সাবধান হতে বললে যে, এতদূর থেকেও আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি।'

বিস্মিত হলুম। কারণ যে আমাকে সাবধান করে দিলে, সত্যিসত্যিই সে এত চুপিচুপি কথা হয়েছিল যে, কারুর পক্ষে অতদূর থেকে তা শুনতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবু সে কথা যদি ওই লোকটি শুনতে পেয়ে থাকে তাহলে তার শোনবার শক্তি যে অত্যন্ত অসাধারণ, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তার উপরে আর এক কথা। এই অন্ধকারে ওই মূর্তি আমাকে চিনলে কেমন করে? আমার নাম পর্যন্ত ওর অজানা নয়। তবে উনিই কি রাজাবাহাদুর স্বয়ং?

জিজ্ঞাসা করলুম, 'মহাশয় কি রাজাবাহাদুর?'

মূর্তি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না, আমি তাঁর কর্মচারী। অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে, দয়া করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।'

সুটকেসটা নিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজার সেই কর্মচারী একখানা দৃঢ় হস্তে আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে আমাকে গাড়ির উপরে উঠতে সাহায্য করলেন। তাঁর মুষ্টির দৃঢ়তা দেখেই

বুঝতে পারলুম, লোকটি হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাশালী। আমার মতন লোককে সে হয়তো শিশুর মতো অনায়াসেই দশ-পনেরো হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে।

তিন

নীল আলো এবং মৃত্যুর দূত

গাড়ি বেগে ছুটেছে বনের পথ দিয়ে। তার দুটো লণ্ঠনের আলোকশিখায় পথের দুইদিকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু নানা জাতের গাছের পর গাছ, আর জঙ্গলের পর জঙ্গল। পৃথিবীর সমস্তই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে,—গাছের পাতারা, বন্য বাতাস বা কোনও জীবজন্তুই কিছুমাত্র শব্দের সৃষ্টি করছে না—কেবল শুকনো পাথুরে পথের উপর জেগে জেগে উঠছে এই গাড়ির তেজি ঘোড়াটার অশ্রান্ত পায়ের শব্দ। গাড়ির চালক রাজার সেই কর্মচারীই।

মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনজঙ্গল, এবং তার বদলে দেখা যাচ্ছে এক-একটা মস্ত মাঠের তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতা। আবার কোথাও বা গাড়ি চলছে উঁচু নিচু পাহাড়ে পথের উপর দিয়ে এবং সেখানে এপাশে-ওপাশে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো কালিতে আঁকা ছোটো-বড়ো পাহাড়ের শিখর। এ-রকম বন্ধুর পথের উপর দিয়ে কোনও সাধারণ টোঙাগাড়ি যে এত বেগে আর এমন অনায়াসে অগ্রসর হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখে এসেছিল তন্দ্রা তা আমি বুঝতে পারিনি। খানিক পরে কী এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ভালো করে উঠে বসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখি, আমার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন ঠিক রাত বারোটা। সমানে ছুটে চলেছে গাড়ি।

বনের কোথা থেকে একটা কুকুর সুদীর্ঘ স্বরে কেঁদে উঠল। সে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠস্বরে জাগছে যেন একটা অত্যন্ত যন্ত্রণার ভাব। সে কান্না শেষ হতে-না-হতেই আবার আর-একটা কুকুর জুড়ে দিলে ঠিক সেই রকমই আতঙ্কগ্রস্ত ক্রন্দন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটার পর আর-একটা আবার তারপর আর-একটা—এমনি অনেকগুলো কুকুরই সমস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলে। বন্য কুকুরদের সেই অদ্ভুত কান্নার ঐকতান ভেসে ভেসে আসতে লাগল যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে, এমনকি অন্ধকারের অন্তঃপুর ভেদ করে।

গাড়ির ঘোড়াটাও চমকে চমকে উঠে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু চালকের আশ্বাসবাণী শুনে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হল। তারপর, পাহাড়ের ভিতরে দুধার থেকেই সমস্বরে জেগে উঠল আর এক সুতীক্ষ্ণ ও উচ্চতর চিৎকার। একসঙ্গে চিৎকার করছে অনেকগুলো নেকড়ে বাঘ।

গাড়ির ঘোড়াটা বিষম চমকে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং আমারও ইচ্ছা হল, এইবেলা গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছি আবার সেইদিকেই দৌড় মারি।

সরাইখানায় যতক্ষণ ছিলুম, ততক্ষণই শুনেছি কেবল আতঙ্ক আর অমঙ্গল আর ভূতপ্রেতের কথা। বিশ্বাস করি আর না-করি, সেইসব জল্পনা-কল্পনা আমার অজ্ঞাতসারেই এখন যে মনের

ভিতরে কাজ করছে, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম। সরাই ত্যাগ করবার অল্প আগে বৃদ্ধার মুখে শুনেছি, তাঁর ছেলে রাত্রে এই বনের ভিতরেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। দরজার কাছে কে আবার বলে দিলে, রাত বারোটার সময় সাবধানে থাকতে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অন্তরের মধ্যে জাগতে লাগল কেবল এইসব কথাই। নেকড়েগুলো সেই রকমই চিৎকার করছে বটে, তবে, চালকের আশ্বাসবাণী শুনে ঘোড়াটা আবার ছুটতে আরম্ভ করলে—কিন্তু আর তেমন জোরে নয়, এবং ভয়ে ভয়ে।

আচম্বিতে দেখলুম আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। খানিক তফাতে জঙ্গলের ভিতরে জ্বলছে একটা আশ্চর্য নীল রঙের আলো। সে আলোটা অত্যন্ত তীব্র বটে, কিন্তু তবু তার আভায় বনের আশপাশকার অন্ধকারের নিবিড়তা কিছুমাত্র কমে যাচ্ছে না। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু নিজের বাইরে এতটুকু আলো বিকীর্ণ করছে না।

চালকও আলোটা দেখলে। তখনই সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে পড়ল এবং এগিয়ে চলল সেইদিকে। আর-একটা ব্যাপার যা লক্ষ করলুম, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। চালকের মূর্তি ঠিক আমার আর আলোকের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এমন অবস্থায় আলোটা তার দেহের দ্বারা আবৃত হয়ে যাবারই কথা; কিন্তু দেহটাকে না ঢেকে সেই অস্বাভাবিক নীল আলোটা তার দেহ ভেদ করেই আমার চোখের সামনে জেগে রইল সমানভাবেই। এও কি সম্ভব? যে দেহ ফুটে এমনভাবে আলো বেরুতে পারে, সে কী রকম দেহ? রক্ত-মাংসে গড়া কোনও দেহই এমন স্বচ্ছ হতে পারে না।

আমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? কিংবা জেগে থেকেও আমার চোখ ভুল দেখছে?

আচমকা গাড়ির ঘোড়াটা আবার সভয়ে লাফিয়ে উঠল। যদিও গাড়ির দুটো লণ্ঠনের আলোতে বেশিদূর পর্যন্ত চোখ চলে না, তবু মনে হল, গাড়ি থেকে কিছু দূরে আমার দুই পাশে আর সামনের দিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক কতকগুলো জীবন্ত দেহ! থেকে থেকে সেখান থেকেও দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে যেন কতগুলো ক্ষুধিত ও নিষ্ঠুর দৃষ্টি!

টর্চটা তুলে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ও সামনের দিকে নিক্ষেপ করলুম সমুজ্জ্বল আলোক-শিখা। কী ভয়ানক! মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে আছে দলে দলে নেকড়ে বাঘ—চক্ষে তাদের জ্বলন্ত হিংসা, এবং প্রত্যেকেরই মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে টকটকে লাল ও লকলকে জিহ্বা। সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির পিছন দিকেও একবার আলোক-শিখা সঞ্চালন করে দেখলুম, সেখানেও বসে আছে আরও কতগুলো নেকড়ে বাঘ। সর্বনাশ, নেকড়ের দল যে চারিধার থেকেই ঘিরে ফেলেছে আমাদের গাড়িখানা! নিশ্চয় তারা কেবল আমাদের মুখ দেখে খুশি হবার জন্যেই এখানে এসে হাজির হয়নি, যে-কোনও মুহূর্তেই তারা তিরের মতো ছুটে এসে আক্রমণ করে আমাদের দেহ করে ফেলতে পারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন!

চালক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অপার্থিব নীল আলোটার কাছে। সেখানে সে যে কী করছে তা সেইই জানে, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয়, হয়তো সে নিজের বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এত কাছে এসেছে যে দলে দলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত, এটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে আমি তাকে ডাকলুম।

চালক আবার গাড়ির দিকে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে লাগল।

প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি নেকড়েগুলো লাফ মেরে চালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহকে করে দেয় খণ্ডবিখণ্ড! নেকড়েগুলো গাড়ির চারিদিক বেষ্টন করে মণ্ডলাকারে বসে রয়েছে, চালক কি তা দেখতে পাচ্ছে না? কেমন করে হিংস্র পশুদের এই ব্যূহ ভেদ করে গাড়ির কাছে সে আসবে?

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য! চালক যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করে কী বললে এবং কয়েকবার দিলে হাততালি। তারপর সে খুব সহজভাবেই সোজা গাড়ির কাছে এসে আবার নিজের আসনে উঠে বসল, সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে।

অতটা ভয় ও বিস্ময়ের মধ্যেও আমি দমন করতে পারলুম না আমার কৌতূহল। তাড়াতাড়ি আবার টর্চটা জ্বেলে চারিধারে নিক্ষেপ করলুম আলোক-শিখা।

যে জন্যেই হোক, নিশ্চয় আজ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কারণ কোনওদিকে তাকিয়ে আমি আর দেখতে পেলুম না একটামাত্র নেকড়ে বাঘকে!

চার

রাজা রুদ্রপ্রতাপ

শেষ রাত।

পূর্বাচলে ধরণীর ললাটে তখনও জাগেনি প্রভাতের জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ। অন্ধকার একটুখানি পাতলা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তখনও ঘোচেনি দৃষ্টির অন্ধতা।

বোধহয় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম, কারণ টোঙা যে কখন বিশালগড়ের সিংহদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে তার বিপুল আঙিনার প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেটা আমি একটুও টের পাইনি। গাড়ি থামতেই ছুটে গেল আমার তন্দ্রা।

স্পষ্ট তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, ঝাপসা ঝাপসা যেটুকু দেখা গেল মনে হল, আমরা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আকাশের গায়ে যে কালিমালিপ্ত অট্টালিকার বহিঃরেখা আঁকা রয়েছে তা যেমন উচ্চ, তেমনই প্রশস্ত।

সেইদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ টোঙাচালক আমার উপর-হাতটা চেপে ধরে বললে, 'এইবার আপনাকে নামতে হবে।' তখন যেমন করেছিলুম, এখনও তেমনই অনুভব করলুম, চালকের হস্তে আছে অসুরের মতন শক্তি। সে একটু জোরে চাপ দিলেই হয়তো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে আমার হাতের হাড়!

নীচে নেমে সে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে কোথায়, কে জানে। উঃ! চারিদিক কী স্তব্ধ! একটা কীটপতঙ্গেরও সাড়া নেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সেই অপরিসীম স্তব্ধতা যেন বিরাট একখানা জগদ্দল পাথরের মতন পেষণ করবার চেষ্টা করছে আমার হৃদয়-মনকে।

এমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অথচ কোথাও নেই একটিমাত্র আলো বা একটিমাত্র মানুষ। প্রায়

পনেরো মিনিটকাল ধরে চিন্তা এসে আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। এ আমি কোথায়, কার কাছে এসে পড়লুম? আরম্ভেই যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রহস্যময় গাড়ির চালক ও রহস্যময় নীল আলো! তারপর সেই সাঙ্ঘাতিক নেকড়েগুলো! তারা আমাকে আক্রমণ করতে এসে চালককে দেখে নিঃশব্দে আবার অদৃশ্য হল কেন? নেকড়ের মতন হিংস্র পশুদের উপরে কোনও মানুষের যে এমন প্রভাব থাকতে পারে, মন এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর যাঁর বাড়িতে আজ আমি এসেছি, সেই রাজাবাহাদুরই বা কী রকম মানুষ? সরাইখানার লোকগুলি যে কেউ রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করে, এমন তো মনে হল না। বরং তারা নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে আমাকে এখানে আসতেই নিষেধ করেছে বারংবার।

এইসব ভাবছি, হঠাৎ হুড়-হুড় করে একটা শব্দ হল, এবং সেই শব্দ শুনে কেবল আমি নয়, এখানকার সমস্ত অন্ধকার ও স্তব্ধতাও যেন চমকে জাগ্রত হয়ে উঠল। তারপর সামনের দিকে সুবৃহৎ একটা দ্বারপথের ভারী ভারী পাল্লা দু-খানা খুলে গেল ধীরে ধীরে। একটা লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকরেখা দরজার ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

ভালো করে চেয়ে দেখি, দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ। তাঁর মুখের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজোড়া লম্বা গোঁফ। কাঁকড়ার দাড়ার মতো লম্বা গোঁফের দুই প্রান্ত ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে চিবুকের তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে তাঁর ঘন কৃষ্ণবর্ণের কোর্তা ও পায়জামা। ডান হাত তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসুন বিনয়বাবু, আজ আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। বাড়ির ভিতরে আসুন।' আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বৃদ্ধ আর এক পদও অগ্রসর হলেন না, সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মতো।

তাঁকে নমস্কার করে আমি যখন বাড়ির দরজার ভিতর প্রবেশ করলুম, তখন তিনি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এত জোরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন যে আমার হাতের আঙুলগুলো যেন ভেঙে যাবার মতো হল। কোনও বৃদ্ধের হাতে এমন শক্তি থাকতে পারে, আমার পক্ষে এটা ছিল একেবারেই অভাবিত। কেবল তাই নয়, বৃদ্ধের হাত যেন কনকনে তুষারের মতো ঠান্ডা, আমার হাতের উপর রয়েছে যেন কোনও মৃতদেহের হাত!

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্বাগত, স্বাগত! স্বেচ্ছায় আমার বাড়ির ভিতরে আসুন! আবার নিরাপদে যখন ফিরে যাবেন তখন যে আনন্দ আপনি সঙ্গে করে এনেছেন, তার খানিকটা যেন এখানে রেখে যেতে ভুলবেন না।'

তখনও আমি নিজেকে ঠিক সামলে নিতে পারিনি। বৃদ্ধের বাহুর শক্তি আমাকে মনে করিয়ে দিলে সেই টোঙাচালকের বাহুর শক্তিকে। অন্ধকারে সেই চালকের মুখ একবারও আমি দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়তো সেই টোঙার চালক আর এই বৃদ্ধ দু-জনেই অভিন্ন। তাই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ?'

—'হ্যাঁ, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি। বিনয়বাবু, আমি আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। রাত্রে পথে আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। আসুন, আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন।'

যদিও শেষ-রাত্রে সেই জলযোগের প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাল, তবু আমি কোনও প্রতিবাদ করলুম না।

রাজা হেঁট হয়ে পড়ে আমার সুটকেসটা মাটির উপর হতে নিজেই তুলে নিতে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিতে গেলুম, কিন্তু তিনি কোনও মানা না মেনেই আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'না বিনয়বাবু, আপনি আমার অতিথি। বাড়ির লোকজনেরা কেউ এখন জেগে নেই, কাজেই আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আসুন।'

দ্বারপথ পার হয়ে খানিক গিয়েই পেলুম এক সোপানশ্রেণী। দ্বিতলে উঠে একটা দালানের উপরে এসে পড়লুম, তার মেঝেটা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

দালানের একপ্রান্তে এসে রাজা ঠেলে একটা দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলুম, প্রকাণ্ড ঘর, একটা ঝাড়লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত ঘরখানাই আলোকিত। মাঝখানে টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার, এবং টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে কয়েক রকম খাবারের থালা। রাজা ঘরের এক কোণে আমার সুটকেসটা রেখে দিয়ে আর এক দিকের আর একটা দরজা ঠেলে খুললেন। তারপর ইঙ্গিতে আমাকে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন।

ঘরে ঢুকে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি পালঙ্ক, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদরে মোড়া বিছানা পাতা। খাদ্য দেখে আমার মন কিছুমাত্র লুব্ধ হয়নি, কিন্তু রাত্রের অত কষ্টের পর এই কোমল শয্যা দেখে আমার ইচ্ছে হতে লাগল, এখনই ছুটে গিয়ে সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।

রাজা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, দেখছি আপনি বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আর কোনও কথা নয়। এখন আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার যা কিছু দরকার এই ঘরেই খুঁজে পাবেন। কাল সকালে একটু কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে। সন্ধ্যার চায়ের আসরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ

তিনটে অদ্ভুত স্বপ্ন

পরদিন সকালবেলা। রাজাবাহাদুরকে দেখতে পেলুম না এবং সকালের চা নিয়েও কেউ এল না। কিন্তু দুপুরে পাশের ঘরে টেবিলের উপরে পেলুম অন্যান্য আহার। তবে আশ্চর্য এই, সব খাবার ঠান্ডা। কোনও মানুষের সাড়াও শুনলুম না। কালকের অনিদ্রার ঘোর এখনও যায়নি। তাই এসব নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য গিয়েছে অস্তে।

তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করে মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরছি, এমন সময় ঘরের দরজার ওপাশে শোনা গেল রাজার কণ্ঠস্বর, 'বিনয়বাবু, আপনার দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি? এদিকে চা আর খাবার প্রস্তুত।'

দরজা খুলে বাহিরে বেরুতেই রাজা আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দামি দামি চায়ের সরঞ্জাম এবং টোস্ট, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য।

আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, চায়ের সঙ্গে এত খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। এ করেছেন কী?'

রাজা বললেন, 'এ নির্জন বনের ভিতরে এর বেশি আর কিছু আয়োজন করতে পারা যায় না। শহরে থাকলে আপনাকে এর চেয়ে ঢের বেশি খাবার খেতে হত। নিন, এখন আসন গ্রহণ করুন।'

টেবিলের একধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসে পড়লুম, রাজা বসলেন গিয়ে অন্য প্রান্তে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিনয়বাবু, আমি আগেই চা আর খাবার খেয়ে নিয়েছি, কাজেই এখন আপনাকে একলাই খেতে আর চা পান করতে হবে।'

খাবার খেতে খেতে রাজাবাহাদুরকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলুম। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। তাঁর মাথার চুলগুলি পেকে সাদা ধবধবে হয়েছে। তাঁর ভূর উপরেও খুব পুরু চুলের গোছা। সুদীর্ঘ নাসিকা। লম্বা ও মস্ত গোঁফজোড়ার মাঝখানে তাঁর ওষ্ঠাধর দেখলে তাঁকে একজন নির্দয় লোক বলেই মনে হয়। ওষ্ঠাধরের ফাঁকে যে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে অসাধারণ তাদের তীক্ষ্নতা।

রাজা কাল যখন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনই আমি আরও দু-একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। তাঁর দুই হাতের তালুর মাঝখানে আছে এক গোছা চুল, এবং তাঁর আঙুলের নখগুলোও যেন অস্বাভাবিক ধারালো। কেবল তাই নয়, আমার নাকেও এমন একটা বিশ্রী ঘ্রাণ এসে লেগেছিল, যে আর একটু হলেই আমি বমন করে ফেলতুম। যদিও সেটা অসম্ভব, তবু আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কোনও গলিত মাংসের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমার মুখের ভাব দেখে রাজা তখন তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চা পান করতে করতে রাজার কাছে আমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই পুরোনো ও ভাঙা বাগানবাড়িটার কথা তুললুম। রাজা নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি খুশি মুখে বললেন, 'ধন্যবাদ বিনয়বাবু, ধন্যবাদ। আমি ঠিক যেরকম বাড়ি আর জমি চাই, আপনি আজ তারই সন্ধান দিলেন। দেখুন, আমি সেকেলে মানুষ। তার উপরে শহরের বিলাসিতা আর আধুনিকতা ছেড়ে আমি বনের ভিতরে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে চাই। আমার এই বিশালগড় দেখছেন? কতকাল আগে আমার পূর্বপুরুষরা এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা আর এই গড় তৈরি করে গিয়েছেন, কত যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি এই বিশালগড়ের প্রত্যেক পাথরের গায়ে মাখানো আছে, অতীতের কত ঐশ্বর্য আগে একে অপূর্ব করে রেখেছিল, আজ আমরা সে সব কল্পনাতেও আনতে পারব না। আজ আমাদের সে গর্ব, ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি নেই বটে, কিন্তু আজও আমার দেহের ভিতরে, ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারার সঙ্গে জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের সেই প্রাচীন বংশগৌরব। সেইজন্যেই এই ভাঙা আর পুরোনো বিশালগড়কে আজও আমি ভুলতে পারিনি। আর এইখানে থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরম আধুনিক প্রকাণ্ড কোনও রাজপ্রাসাদ পেলেও তার ভিতরে গিয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি আমার হবে না। তাই একেলে শহর কলকাতাতে গিয়েও কোনও অট্টালিকায় বাস করবার ইচ্ছা আমার নেই। বংশে আমি প্রাচীন, মনে আমি প্রাচীন আর বয়সেও আমি প্রাচীন, তাই তো আমি কিনতে চেয়েছি প্রাচীন কোনও বাগানবাড়ি। সুতরাং আমার এই অদ্ভুত রুচি দেখে আপনারা কেউ বিস্মিত হবেন না, এমন আশা আমি করতে পারি।'

আমি বললুম, 'যেচে কেউ যে পুরোনো বাড়ি কিনতে চায় এটা আমরা জানতুম না। কাজেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম বইকি। কিন্তু এতক্ষণ পরে আপনার কথা শুনে সে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি কথা জানতে আমার আগ্রহ হয়েছে। আপনি বোধহয় বাঙালি নন?'

রাজাবাহাদুর বললেন, 'না, জাতে আমরা রাজপুত।'

—'কিন্তু আপনি এত ভালো বাংলা শিখলেন কী করে? বাংলা দেশে গিয়ে কখনও থেকেছিলেন কি?'

রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'না। কিন্তু খালি বাংলা কেন, ভারতবর্ষের আরও অনেক দেশের ভাষাই আমি জানি। ওপাশের ঘরে আমার লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন, সেখানে অন্তত হাজার-দুই বাংলা বই আছে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা, আমি ওই সব বই পড়েই অর্জন করেছি। এমনকি আপনাদের কলকাতায় কোথায় কোন রাস্তা আছে, আর কোন কোন রাস্তায় কে কে বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করেন, সে খবরও আমার নখদর্পণে।'

—'বই পড়তে আমি বড়োই ভালোবাসি, পড়বার ইচ্ছে হলে আমি কি আপনার লাইব্রেরিতে যেতে পারি?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! এই বিশালগড়ের যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন; কিন্তু দরজা যেখানে বন্ধ দেখবেন সেখানে কোনওদিন ঢোকবার চেষ্টা না করলেই আমি খুশি হব। কারণ এই বিশালগড় আপনাদের কলকাতা শহরের কোনও অট্টালিকা নয়। এখানে এমন অনেক কিছুই আছে, যার অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। সেইজন্য আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত মনে করছি।'

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কালকের রাত্রের রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা। তাই নিয়েই রাজার কাছে আমি কোনও কোনও প্রশ্ন তুললুম। তিনি কোনও প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং কখনও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

তখন তাঁর কাছে সেই নীল আলোর প্রসঙ্গ তুললুম। তিনি বললেন, 'আপনি তো শুনেছেন, এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট রাত্রে—যেমন, অমাবস্যার শনিবারের রাত্রে—এ অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে যেখানে দেখা যায় নীল রঙের একটা অদ্ভুত আলো সেইখানেই মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় গুপ্তধন। আমার কর্মচারী বোধহয় গুপ্তধনের লোভেই সেই নীল আলোর কাছে গিয়েছিল।'

আমার চা পান শেষ হল। রাজাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের অফিসে আমি এখনই খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি যে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি কলকাতায় যাবার আগেই আমি এখান থেকেই ও-বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা-দুই পরে কামাবার আরশিখানা বার করে টেবিলের উপরে রেখে একমনে দাড়ির উপর ক্ষুর চালনা করছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললে, 'অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

এই সম্ভাষণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠতে ক্ষুর লেগে আমার চিবুক গেল কেটে।

ফিরে দেখি, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর। বিস্মিত হলুম। কারণ আরশির ভিতর দিয়ে

আমার পিছন দিক ও দরজার কাছটা দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট। অথচ রাজা যে কখন ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন আমি তা একটুও দেখতে পাইনি। সন্দেহ দূর করবার জন্যে আর-একবার আরশির দিকে ফিরে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার ঠিক পিছনেই, অথচ দর্পণের মধ্যে নেই তাঁর মূর্তির ছায়া। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এদেশে এসে পর্যন্ত যেসব অভাবিত কথা শুনছি আর যেসব অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করছি, তার কোনওটারই অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আজ এখনই যা দেখলুম, তাও কি সেইরকমই কোনও আজগুবি ব্যাপার? মানুষ আছে, দর্পণে নেই মানুষের দেহের ছায়া?

কিন্তু তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলুম না, কারণ আমার চিবুকের ক্ষত থেকে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছিল।

স্টিকিং প্লাস্টার বার করবার জন্যে সুটকেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় রাজাও আমার চিবুকের অবস্থাটা দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল অসম্ভব রূপে। মনে হল, আমার সামনে দেখছি যেন একটা রক্তলোভী হিংস্র জন্তুর ভয়াবহ মুখ—তার মধ্যে নেই কিছুমাত্র মানবতার চিহ্ন! রাজা আচম্বিতে বাঘের মতন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে চেপে ধরলেন আমার দুই স্কন্ধদেশ। তাঁর বিকৃত মুখখানা এগিয়ে এল আমার মুখের খুব কাছে এবং তার পরেই তাঁর চোখ পড়ল আমার গলায় ঝোলানো কবচখানার দিকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা আবার শান্ত হয়ে এল। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, সাবধানে থাকবেন। আমার বাড়িতে রক্তপাত করা নিরাপদ নয়!'

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে আরশিখানা তুলে নিয়ে সক্রোধে তিনি বললেন, 'এই আরশিই হচ্ছে সর্বনাশের জিনিস! মানুষ নিজের আমিত্বকে বড়ো করে দেখবার জন্যে সৃষ্টি করেছে এই আরশি! চুলোয় যাক,—চুলোয় যাক!' বলতে বলতে জানলার ধারে গিয়ে আরশিখানা তিনি ছুড়ে ফেলে দিলেন বাইরের দিকে। তারপর আর কোনও কথা না বলেই হন-হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। কী থেকে কী যে হল আর কেন যে হল, তার কোনও হদিশ খুঁজে পেলুম না। পরে-পরে মনের ভিতরে জাগল তিনটে অদ্ভুত প্রশ্ন। আরশিতে রাজার ছায়া পড়ল না কেন? আমার চিবুকের রক্ত দেখে রাজার মুখের ভাব অমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কেন? আর আরশি দেখে তাঁর অতটা রাগের কারণই বা কী?

ছয়

রাত্রির সন্তান

আমি বন্দি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে জানতে পেরেছি এই ভয়াবহ সত্য কথাটা। কেমন খেয়াল হল দোতলা থেকে নেমে প্রকাণ্ড সদর দরজাটার কাছে গেলুম। ইচ্ছা ছিল একবার বেরিয়ে বাইরের চারিদিকটা ঘুরে আসি। কিন্তু দরজার পাল্লা টানতে গিয়ে দেখি, বাহিরের থেকে সেটা বন্ধ।

তখন ভিতরে ফিরে এসে একতালার চারিদিক অন্বেষণ করতে লাগলুম, বাইরে বেরুবার যদি আর কোনও দরজা থাকে। লম্বায় চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট ব্যাপী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ উঠোন, তার চারিধারে প্রশস্ত দরদালান এবং তার পর সারি সারি ঘরের পর ঘর। কিন্তু প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই বড়ো-বড়ো কুলুপ লাগানো এবং কোনও দিকেই জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সেখানকার অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমি যেন কোনও অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভিতরে এসে পড়েছি।

প্রাঙ্গণের আর-একদিক দিয়ে আর-একটি পথ আছে। এবং সেই পথের শেষেও আর একটা বন্ধ দরজা। খুব সম্ভব এটা হচ্ছে এ মহল থেকে অন্য মহলে যাবার পথ, কারণ সেখানকার রাজারাজড়াদের প্রাসাদে বা কোনও ধনী ব্যক্তির অট্টালিকায় তিন-চারটির কম মহল থাকত না। এখানকার অন্য মহলে কী আছে তা জানবার কোনওই উপায় নেই, কেননা ওদিকে যাবার যে একটিমাত্র দ্বার, তাও ওপাশ থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আবার উপরে লাইব্রেরি-ঘরে ফিরে এসে বসলুম। এমনভাবে নিজেকে বন্দি বলে বুঝে মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেল। দুই-তিনখানা কেতাব নিয়ে নাড়াচাড়া করলুম, পড়তে ভালো লাগল না। উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

নীচেই দেখা যাচ্ছে বিশালগড়ের বিস্তৃত অঙ্গন। এক সময়ে অঙ্গনের সমস্তটাই যে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এখন অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই স্থানচ্যুত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেইসব শৈবাল-চিত্রিত শিলাখণ্ড দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না, যে তাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দীর ঝড় ও বৃষ্টি। অঙ্গনের যে-সব জায়গার পাথর সরে গিয়েছে, সে-সব স্থান বন্য লতাগুল্ম ও ঝোপঝাপের দ্বারা সমাবৃত।

অঙ্গনের পরে বিশালগড়ের সু-উচ্চ এবং সুদীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীর। ভূমিতল থেকে তার উচ্চতা ৫০ ফুটের কম নয়। এই প্রাচীর লঙ্ঘন করে কোনও মানুষের পক্ষেই ভিতর থেকে বাহির বা বাহির থেকে ভিতরে আসা সম্ভবপর নয়। প্রাচীরের ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং কোথাও বা সুদূর বনের সুনীল রেখা এবং তার উপরে নত হয়ে পড়েছে সূর্যের অস্তরাগরেখায় বিচিত্র নীলাকাশ। বাহির থেকে ভেসে আসছে স্বাধীন বিহঙ্গদের কলকাকলি। তাদের সেই মুক্ত প্রাণের সঙ্গীত শুনে আমার প্রাণে জাগল দীর্ঘশ্বাস। স্বাধীন, তারা স্বাধীন—কিন্তু আমি? বন্দি!

নীচের সদর দরজা খোলার শব্দ পেলুম। গবাক্ষ দিয়ে হেঁট হয়ে দেখি, রাজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল, রাজা তবু আমার কাছে এলেন না। কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, আমার শোবার ঘরের দরজাটা আধখানা খোলা রয়েছে। আলতো পায়ে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে দেখলুম, আমার জন্যে রাজা করছেন, স্বহস্তে শয্যারচনা। নিঃশব্দে আবার ফিরে এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। তাহলে আমি মনে মনে যে সন্দেহ করেছিলুম তা মিথ্যা নয়? এই বিশাল অট্টালিকায় রাজা একাকী বাস করেন। এমনকি, আমার জন্যে তাঁকে আহার্য আর শয্যা পর্যন্ত প্রস্তুত করতে হয়!

এখানে যখন রাজা আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, তখন টোঙার যে চালক সরাই থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, সে-ও তাহলে রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। এতক্ষণ পরে আমার মনে পড়ল, অন্ধকারে আমি টোঙাচালকের মুখ একবারও দেখতে পাইনি, নিশ্চয় রাজা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছিলেন অন্ধকারের সেই সুযোগ।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সমস্ত হৃদয়-মন। সেই ভয়াবহ টোঙাচালক, যার দেহ ভেদ করে ওপাশের আলো দেখা যায়, যার একটিমাত্র নীরব ইঙ্গিতে ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের দল শিকার ছেড়ে অদৃশ্য হয় এবং যার দুই বাহুতে আছে ভীমের মতন অসাধারণ শক্তি!

সরাইখানায় যা শুনেছিলুম, আবার সেইসব কথা একে-একে মনে পড়তে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে এখানে আসতে মানা করেছিল। অনেকে শরীরী প্রেতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি। আর সেই পুত্রহারা বৃদ্ধা, যে রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমার কণ্ঠদেশে, তার কথা ভেবে আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার অবিশ্বাসী মন তখন এই কবচের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেনি, কিন্তু এখন এই কবচখানা যে আমার গলায় ঝুলছে, এটা ভেবেও আমি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারলুম।

এর পর আমার কী করা উচিত? আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজাকে জানতে না দেওয়া যে আমি তাঁর কোনও গুপ্ত কথা আবিষ্কার করতে পেরেছি। রাজা যে ইচ্ছা করেই আমাকে এখানে বন্দি করে রাখতে চান, এটা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে আমি যে বন্দি বলে জেনেছি, এই ভাবটা কিছুতেই তাঁর কাছে প্রকাশ করা হবে না। আমার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদাই দৃষ্টিকে সজাগ রাখা এবং রাজা কী করছেন না করছেন পদে পদে সেইদিকে লক্ষ রাখা। জনশূন্য বিশালগড়ে আমি বন্দি; এখন একমাত্র নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা ছাড়া আমার মুক্তিলাভের আর কোনও উপায় নেই।

রাজা এই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে সেই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদ। আজ নতুন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাজার বর্ণ গৌর বটে, কিন্তু তাঁর হাত ও মুখের শুভ্রতার ভিতরে রক্ত-আভার কোনওরকম আভাস নেই। বহুক্ষণ-মৃত মানুষের মতন তাঁর দেহের বর্ণ হচ্ছে পাণ্ডুর। কালো পোশাকের ভিতরে সেই পাণ্ডুরতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেই বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার প্রতিনিধি আজকেই কলকাতায় যাত্রা করেছেন।'

আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, তাহলে আমার কর্তব্য তো শেষ হয়েছে, আমিও তো এখন অনায়াসেই কলকাতায় চলে যেতে পারি?'

—'এত শীঘ্র?'

—'আমি স্বাধীন নই, অপরের কর্মচারী মাত্র। বলে এসেছি, তিন-চার দিনের বেশি এখানে থাকব না। যথাসময়ে কলকাতায় না ফিরলে আমার উপরওয়ালা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, 'না না বিনয়বাবু, তা হতেই পারে না। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। এত শীঘ্র আপনাকে ছাড়া হবে না। আরও কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।'

নাচারভাবে বললুম, 'বেশ, তাহলে আর উপায় কী?'

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির করে গম্ভীরভাবে ও কঠিন স্বরে রাজা বললেন, 'আর একটা কথা আপনাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। আপনাকে যে-কয়টি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছি, তা ছাড়া আর কোনও ঘরেই আপনি যেন ঢোকবার চেষ্টা না করেন। এই প্রাসাদ হচ্ছে অনেক কালের পুরোনো, এর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে বহু কালের বহু প্রাচীন স্মৃতি। অনেক স্মৃতিই সুখের নয়; তারা আনন্দ দেয় না, ভয় দেখায়। নিজের সীমা অতিক্রম করলে আপনাকে রীতিমতো বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আর সেইসব বিপদ এমন কল্পনাতীত যে—' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন এবং উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনতে লাগলেন।

আমিও শোনবার চেষ্টা করলুম। জানলা দিয়ে দেখলুম, বাহিরের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত করে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধ যবনিকা। চারিদিক স্তব্ধ, পাখিরাও নীরব। কিন্তু সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে এমন এক রোমাঞ্চকর ধ্বনি, যা হিম করে দেয় বুকের রক্ত! তা হচ্ছে একদল নেকড়ে বাঘের গর্জন।

রাজার দুই চক্ষু যেন জ্বলে উঠল উৎকট আনন্দে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'শুনুন, শুনুন! রাত্রির সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনুন! আহা, তারা রচনা করছে কী মধুর সঙ্গীত!'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম, কোনও কথাই বলতে পারলুম না।

রাজা অল্প একটু হেসে বললেন, 'ও, বুঝেছি। আপনারা হচ্ছেন শহুরে জীব, শিকারির বন্য আনন্দ অনুভব করবার শক্তি আপনাদের নেই।' বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

আমি যেন তলিয়ে গেলুম বিস্ময়-সাগরে। হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল সন্দেহে এবং আতঙ্কে। এমন সব অপার্থিব কথা আমি ভাবতে লাগলুম, বাইরে যা প্রকাশ করা অসম্ভব। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!

সাত

ত্রিমূর্তি

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন আমার এমন অবস্থা, যে ভালো মন্দ কোনওরকম চিন্তা করবার শক্তিই আমার ছিল না। মিনিট কয়েক পরে ধীরে ধীরে কেটে গেল আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা। বাড়ির ভিতরে রাজার কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে দোতলার দালানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দোতলা থেকে আরও উপরে উঠে গিয়েছে। আনমনার মতো সেই সোপান ধরে আমিও উঠতে লাগলুম উপরদিকে। দোতলার পর তেতলা পার হয়ে পেলুম মস্ত বড়ো একটা খোলা ছাদ। ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। নিজেকে বন্দি জেনে এবং সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে এতক্ষণ আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, এখন মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে মনের ভিতরে জাগল একটা পরম আশ্বস্তি।

সেদিন ছিল প্রতিপদের রাত্রি। সুন্দর আলোকে চারিদিক ঝকঝক করছে প্রায় দিনের বেলার মতো। রুপোলি কিরণধারায় দূরের পাহাড়গুলো যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। বনে বনে আর

উপত্যকায় দুলছে আলোছায়ার বিচিত্র দোলা। ওই পাহাড়ে যে বিচরণ করে সজাগ মৃত্যুদূতরা, সে কথা ভুলিয়ে দেয় আজকের এই প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য। তাকিয়ে রইলুম বিমুগ্ধ হয়ে।

আচম্বিতে তেতলার একটা গবাক্ষের দিকে আমার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। সেখানে গবাক্ষের তলা থেকে ভূমিতল পর্যন্ত বাড়ির যে জীর্ণ অংশটা ছিল তার নানাস্থানেই দেওয়ালের পাথরগুলো দেওয়াল থেকে অল্প-সল্প বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। গবাক্ষের ভিতর থেকে বাহিরে এল আস্তে আস্তে একটি কালো পোশাক পরা মানুষের মূর্তি। এত উঁচু থেকে তার মুখ দেখতে না পেয়েও আমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে সে মুখ রাজার ছাড়া আর কারুর নয়।

তারপরে সভয়ে দেখলুম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নীচের দিকে মুখ এবং উপর দিকে পা করে রাজা দেওয়ালের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলেন মস্ত একটা সরীসৃপের মতন! প্রথমটা ভাবলুম আমারই বুঝি দেখবার ভুল হয়েছে। তারপর ভালো করে দেখলুম, রাজা, হাতের আঙুল—এবং যেন পায়ের আঙুলগুলোও—দিয়ে সেই দেওয়াল থেকে বেরিয়ে-পড়া পাথরের ধার চেপে ধরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। তাঁর ঝলঝলে কালো পোশাক দেহের দুই দিকে ছড়িয়ে থাকাতে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো।

ভগবান জানেন, এই রাজা কোন জাতীয় জীব! এঁকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি কি মানুষ? বাড়িতে সিঁড়ি থাকতেও কোনও মানুষ কি এমন করে দেওয়াল বেয়ে মাটিতে গিয়ে নামতে চায়?

কী ভয়ানক জায়গাতেই আমি এসে পড়েছি! দেখছি আমার আর উদ্ধার নেই! গবাক্ষ থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে আছে পৃথিবীর দৃশ্য। মাটিতে নামবার পর রাজার মূর্তি আর দেখতে পেলুম না। হয়তো একটা গর্ত বা অন্য কোনও কিছুর ভিতরে ঢুকে তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

রাজা বাড়ির ভিতর নেই জেনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলার দালানে নেমে এলুম। সেখানে রয়েছে ঘরের পর ঘর। টর্চটা আমার সঙ্গেই ছিল। টর্চের আলো ফেলে ঘরের দরজাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রত্যেক দরজাতেই রয়েছে এক-একটা বড়ো কুলুপ। দরজাগুলো পুরাতন বটে, কিন্তু কুলুপগুলো নতুন। যেন সবে কিনে এনে লাগানো হয়েছে। দরজার পর দরজার উপরে দৃষ্টি চালনা করতে করতে সেই সুদীর্ঘ দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেরিয়ে গেলুম। সেখানে দুটো ছোটো ছোটো কুঠরির দরজা ছিল খোলা, কিন্তু ভিতরে ঢুকে কেবল ধুলো আর আবর্জনা আর দু-চারটে ভাঙাচোরা সেকেলে আসবাব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। বোধহয় ও দুটো হচ্ছে পরিত্যক্ত ঘর। তারপরেই আর একটা দরজা এবং বাহির থেকে কেবলমাত্র শিকল তুলে সে-দরজাটা বন্ধ করা আছে। শিকল খুলে ঘরে প্রবেশ করলুম। মস্ত ঘর—হলের মতো বড়ো। একপাশে সার-গাঁথা জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে সমস্ত ঘরখানাকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। একটা জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিচালনা করে দেখলুম, বিশালগড়ের প্রাকারের এক পাশে অদূরেই রয়েছে একটা উপত্যকা। তারপরেই অনেকগুলো পাহাড়ের পর পাহাড় আর শিখরের পর শিখর ক্রমেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। এ ঘরটা খুব বেশি পরিষ্কার না হলেও এখানে

ধুলো-জঞ্জালের কোনওই বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকখানা সোফা, কৌচ, চেয়ার, লেখবার টেবিল ও সাজপোশাক পরবার টেবিল প্রভৃতি আসবাবও রয়েছে। কিন্তু কোনও আসবাবই একালের উপযোগী নয়। তবে, এইটুকু কেবল অনুমান করতে পারলুম, খুব সম্ভব এটা হচ্ছে কোনও স্ত্রীলোকের ঘর। সেকালে বোধহয় রাজবাড়ির কোনও নারী এই ঘরটা ব্যবহার করতেন।

মনের ভিতরে জাগল কেমন শ্রান্তির ভাব। শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইলে। একটা সোফার উপরে ঝুপ করে বসে পড়লুম। তারপর সেই আধা-আলো ও আধা-অন্ধকারে আমার চোখের উপরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল তন্দ্রার আমেজ। একটা অসীম স্তব্ধতাকে বুকের ভিতরে অনুভব করতে করতে বোধহয় আমি ঘুমিয়েই পড়লুম। রাজা যে আমাকে বলেছিলেন আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, একথা আমার একবারও মনে পড়ল না। এবং মনে পড়লেও হয়তো আমি তাঁর হুকুম মানতুম না। তাঁর অবাধ্য হওয়াও এখন আমার কাছে বিশেষ একটা আনন্দের মতো।

খানিকক্ষণ পরে মনে হল, ঘরে আমি আর একলা নই। আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলুম কি না জানি না, কিন্তু চোখ খুলেই দেখলুম চন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল ঘরের একটা অংশ। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সুন্দরী তরুণী। আশ্চর্য এই, তারা চাঁদের আলোর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, তবু মূর্তিগুলোর সামনের দিকে মেঝের উপরে নেই কারুর দেহের ছায়া।

যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি জাগে, তাদেরও হাসির ধ্বনি হচ্ছে সেইরকমই সুমধুর।

একটি মেয়ে বললে, 'দিদি, এগিয়ে যা! প্রথমে তোরই পালা!'

আর-একজন বললে, 'লোকটার বয়স দেখছি কাঁচা। নিশ্চয় এর রক্তও খুব তাজা!'

এই অদ্ভুত উক্তি শুনে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কিন্তু কী যেন মোহিনী-মন্ত্রে অভিভূত হয়ে আমি একটুও নড়তে, উঠে বসতে বা দাঁড়িয়ে উঠতে পারলুম না। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, একটি তরুণী এগিয়ে এসে আমার সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার মুখ আমার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল এবং তার দুই চক্ষে জাগল একটা উৎকট ও ক্ষুধিত আনন্দের দীপ্তি। তারপরেই আমার কণ্ঠদেশে অনুভব করলুম দুটো ধারালো দাঁতের দংশন।

কিন্তু আমার গলার উপরে তার দাঁত দুটো ভালো করে চেপে বসতে না বসতেই ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হল আর একটি সুদীর্ঘ মূর্তি। দেখেই চিনলুম স্বয়ং রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

রাজার চোখদুটো জ্বলছে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো। সে চক্ষের দীপ্তি যেন ভয়ানক নরকাগ্নির মতন। যে তরুণী আমার কণ্ঠের উপরে দংশন করেছে, রাজার একখানা বলবান হাত বেগে গলা চেপে ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলে।

ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'কোন সাহসে তোরা এর কাছে এসেছিস? কোন সাহসে তোরা এর উপরে নজর দিয়েছিস—আমি কি তোদের মানা করিনি? চলে যা, চলে যা এখান থেকে! এ লোকটার উপরে আমি ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই!'

তিন তরুণী আনন্দহীন তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ করে তুললে। সে কী অলৌকিক হাসি, আমার প্রাণ যেন হৃদয়ের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইল।

একটি তরুণী বললে, 'আমাদের উপরে তোমার কোনও দয়া নেই!'

রাজা খুব মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন আমার মুখের উপরে। তারপর ফিরে সহজভাবে সান্ত্বনাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে বললেন, 'তোদের উপরে যে আমার দয়া আছে, এ কথা কি তোরা জানিস না? আচ্ছা, এ লোকটাকে নিয়ে আগে আমার কাজ শেষ হোক, তারপর একে সঁপে দেব তোদের হাতে। এখন যা যা, চলে যা! আমাকে এখন একে জাগাতে হবে!'

আর-একজন তরুণী বললে, 'আজ কি তাহলে আমাদের উপবাস?'

—'না, কে তোদের উপবাস করতে বলছে? এই নে।' বলেই তিনি একটা পোঁটলা মেঝের উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। পোঁটলাটা মাটির উপরে পড়েই নড়ে-নড়ে উঠল—যেন তার ভিতরে আছে জীবন্ত কোনও-কিছু।

একটা স্ত্রীলোক পোঁটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর মতন মহা আগ্রহে। তারপর পোঁটলাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম একটা হাঁপিয়ে-ওঠা চাপা গলার কান্নার শব্দ। কেঁদে উঠল যেন কোনও কচি শিশু। তারপরেই নিদারুণ ভয়ে স্তম্ভিতের মতন দেখলুম, সেই ভয়ানক পোঁটলাটা নিয়ে স্ত্রীলোক তিনটে একসঙ্গে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। কেমন করে বেরিয়ে গেল আমি জানি না, কারণ যেখান দিয়ে তারা অদৃশ্য হল, সেখানে দরজা বা গবাক্ষ কিছুই ছিল না। তারা মিশিয়ে গেল যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে। তারপরেই জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, শূন্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে যেন তিনটে জীবন্ত ছায়া।

আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আট

নেকড়ের খোরাক

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, শুয়ে আছি নিজের বিছানায়।

কেমন করে আমি এখানে এলুম? রাজা কি নিজেই আমাকে বহন করে এনেছেন?

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লুম। রোদের সোনামাখা আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কালকের রাত্রের ঘটনাগুলো মনে হতে লাগল মিথ্যা স্বপ্ন বলে। তারপরেই বোধ হল, আমার গলার এক জায়গা যেন জ্বালা করছে। সেখানে হাত দিয়েই বুঝলুম, আমার গলায় রয়েছে একটা ক্ষত। সামান্য ক্ষত বটে, কিন্তু কাল রাত্রে এইখানেই তো পেয়েছিলুম সর্বনেশে স্ত্রীলোকটার দাঁতের স্পর্শ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্নের ক্ষত কখনও জাগরণে থাকে না। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। কাল রাত্রে আমি কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিলুম? তবে কি তারা প্রেতিনী? চলতি কথায় যাদের বলে পেতনি? প্রেতিনী এত সুন্দরী হয়? রাজাকে দেখতে তো মানুষের মতো, প্রেতিনী কি মানুষের মতো; প্রেতিনী কি মানুষের হুকুম তামিল করে? আর এই অদ্ভুত রাজাই কি প্রেতিনীদের খোরাক জোগান?

ভীষণ, ভীষণ এই চিন্তা! আজ থেকে আর আমি রাজার অবাধ্য হব না, সন্ধ্যার পর আর

কোনওদিন নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করব না! আবার অন্য ঘরে গেলে আর বোধহয় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। আমার পক্ষে এই ঘরই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

সেদিন দুপুরে বাইরের অঙ্গন থেকে কয়েকজন লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। জানলার ধারে গিয়ে দেখি, সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জন লোক। পোশাক দেখে তাদের বেদে বলেই মনে হল।

ভাবলুম, আচ্ছা এদের সাহায্যে আমার অবস্থার কথা লিখে কলকাতায় লুকিয়ে চিঠি পাঠালে কেমন হয়? এই কথা মনে হতেই ছুটে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। এবং তাড়াতাড়ি কয়েকটা লাইন লিখে কাগজখানা খামে মুড়ে তার উপরে দিলুম আমার অফিসের ঠিকানা। তারপর সেই খামের সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট একগাছা সুতো দিয়ে বেঁধে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই একজন যুবক বেদে আমার জানলার ঠিক তলায় এসে উপস্থিত হল।

যতটা সম্ভব নিচু গলায় তাকে বললুম, 'এই চিঠিখানা যদি ডাকঘরে দেবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে দশ টাকা বকশিশ পাবে।'

লোকটা আমাকে সেলাম করে হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে, আমার কথামতো কাজ করতে সে নারাজ নয়।

নোটের সঙ্গে চিঠিখানা নীচের দিকে ফেলে দিলুম, লোকটা আর-একবার সেলাম ঠুকে হন-হন করে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

সন্ধ্যাবেলায় রাজা আমার ঘরে এসে হাজির। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং অত্যন্ত শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললেন, 'একজন বেদে এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে গেল।'

আমার বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু মুখে কোনও কথা বললুম না। রাজা একটুখানি হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে একটি কাঠি জ্বেলে চিঠিখানা তার শিখার উপরে তুলে ধরলেন। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চিঠিখানা।

আর একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে রাজা ধীর পদে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

হতাশভাবে বসে রইলুম। ওই বেদেগুলো যে রাজারই লোক সেটা বেশ ভালো করেই বোঝা গেল। চিঠিখানা যে রাজা পড়ে দেখেছেন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। ব্যর্থ হল আমার মুক্তির চেষ্টা।

জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম দুঃখিতভাবে।

বাইরে চন্দ্রালোকের মহা সমারোহ। বন থেকে ভেসে আসছে গানের পাখির কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য আজ আমার মন গ্রহণ করতে পারলে না।

আমার দৃষ্টি দেখছিল আর একটা দৃশ্য। চন্দ্রকিরণের স্থানে স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন অনেকগুলো অতি-শুভ্র ধুলোর কণা এবং মণ্ডলাকারে উড়তে উড়তে জায়গায় জায়গায় তারা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। দৃশ্যটা দেখতে আমার চোখে ভালোই লাগল।

হঠাৎ উপত্যকার দিক থেকে একদল কুকুরের কেঁউ-কেঁউ করে আর্তস্বরে কান্না জেগে উঠল এবং আমার দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল কেমন একটা চমৎকার শিহরণ। কুকুরের কান্না ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে এবং সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রালোকে উত্তপ্ত ধূলিপুঞ্জগুলো যেন নূতন নূতন আকার গ্রহণ করতে লাগল। আমার মনে হল, কে যেন কোথা থেকে আমাকে ডাকছে, ডাকছে, আর ডাকছে! সেই অজানার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমার কেমন একটা আগ্রহ হতে লাগল। কানে কানে ও প্রাণে প্রাণে শুনলুম ও অনুভব করলুম সে কী এক অদ্ভুত সম্মোহন-মন্ত্র।

শূন্যে ধূলিপুঞ্জের নৃত্য হয়ে উঠল দ্রুততর। তারা বেগে সঞ্চালিত হতে লাগল এপাশে-ওপাশে, উপরে ও নীচে। চন্দ্রালোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল কীসের একটি কম্পন। তারপরে ক্রমে-ক্রমে সেই ধূলির পুঞ্জগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কী রকম সব আকার লাভ করতে লাগল! তারপর দেখলুম যেন চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি তিনটে নারীর মূর্তি। কাল রাত্রে যাদের আমি ও-ঘরের ভিতরে স্বচক্ষে দেখেছিলুম, তারা ছাড়া এরা আর কেউ নয়।

রাজা কাল বলেছিলেন, পরে তাদেরই হাতে আমাকে তিনি সমর্পণ করবেন। এরা কি আজ তারই জন্যে আমাকে আবার দাবি করতে এসেছে? সভয়ে তাড়াতাড়ি দুমদাম শব্দে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। আমার কাছে এই অন্ধকার ঘরই নিরাপদ, এখানে নেই বাইরের বিপজ্জনক চন্দ্রালোক! জানলা বন্ধ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

ঘণ্টা-দুই কেটে গেল। আমার ঘরের ঠিক উপরেই ছিল রাজাবাহাদুরের শয়নগৃহ। মনে হল, সেইখানেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল যেন এক কিশোর কণ্ঠস্বর। তারপর হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই থেমে গেল শিশুর সেই ক্রন্দন। আমার বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরুতে গেলুম, কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ। হতাশভাবে নিজের বিছানায় এসে বসলুম। কী কর্তব্য, তাই চিন্তা করতে লাগলুম।

তারপরে বাড়ির বাইরে নীচের দিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার কেঁদে উঠল কোন এক নারীর কণ্ঠ। আবার উঠে ছুটে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিলুম। মুখ বাড়িয়ে দেখি জানলার ঠিক নীচেই অঙ্গনের উপরে জানু পেতে বসে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক নারীমূর্তি। তার এলানো চুলগুলো বিশৃঙ্খলভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুই হাত দিয়ে এমনভাবে সে নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে যে দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে এখানে এসে পড়ে নিজের হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে।

জানলায় আমার মুখ দেখে সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর তীব্র স্বরে চিৎকার করে বললে, 'দে রাক্ষস, আমার খুকিকে ফিরিয়ে দে!'

সে আবার জানু পেতে বসল ও দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে এমনভাবে আবার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করলে যে, নিদারুণ দুঃখে বুকটা যেন আমার ভেঙে গেল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে কখনও সে মাটির উপরে আছড়ে-পিছড়ে পড়তে ও কখনও দুই হাতে বুক চাপড়াতে ও কখনও নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য!

বোধহয় উপরের ঘর থেকেই শুনতে পেলুম রাজার কর্কশ কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলছিলেন, তার একটা বর্ণও বোঝা গেল না। কারণ সে যেন কতকগুলো অর্থহীন অদ্ভুত ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই

নয়। সঙ্গে-সঙ্গে এদিক ওদিক ও সুদূর থেকে আকাশ-বাতাসকে যেন বিষাক্ত করে তুললে দলে-দলে নেকড়ে বাঘের বুভুক্ষু গর্জনের পর গর্জন। রাজা কি তবে তাদেরই আহ্বান করেছেন? মানুষের পক্ষে দুর্বোধ রাজার এই অর্থহীন ধ্বনির অর্থ কি তাহলে নেকড়েদের কাছে সুস্পষ্ট? রাজা কি নেকড়েদের ভাষাও জানেন? আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মূর্তিমান ঝড়ের মতো বেগে একদল নেকড়ে বাঘ রাজার অঙ্গনের ভিতরে এসে অভাগী নারীমূর্তিটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারীর কণ্ঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা গেল না, নেকড়েদেরও গর্জন হল স্তব্ধ। খানিক পরে তারা একে-একে লকলকে জিভ দিয়ে নিজেদের মুখ চাটতে চাটতে অঙ্গনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বললুম, মৃত্যুই শ্রেয়, অভাগীর মৃত্যুই শ্রেয়! তার শিশুর কী পরিণাম হয়েছে, তা আমি জানি। এর পরও বেঁচে আর লাভ নেই।

কিন্তু আমি কী করব, আমি কী করতে পারি? কেমন করে আমি এই ভয়াল রাজা এবং ভীষণ আতঙ্ক এবং অন্ধকার রাত্রির কবল থেকে নিস্তার লাভ করব? ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আকাশের কোলে খেলা করছে আনন্দময়ী তরুণী ঊষা।

রাত্রে যে আমার মতন যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, তার কাছে ভোরের আলো যে কতখানি মিষ্টি, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই তা বুঝতে পারবে না। বিশালগড়ের উচ্চ তোরণের ঠিক উপরেই আকাশপথে দেখা দিলে গৌরবময় প্রভাতসূর্য। তাকে দেখেই আমার সমস্ত ভয় সর্বাঙ্গ থেকে খসে পড়ল বিষধরের খোলসের মতো। এইবার আমাকে নামতে হবে কার্যক্ষেত্রে। যা কিছু করবার, দিনের আলো থাকতে থাকতেই সব শেষ করে ফেলতে হবে। উঠে দাঁড়ালুম। সামনের আনলাটার দিকে নজর গেল। সেটা একেবারেই খালি। সেখানে আমার যত জামা-কাপড় ও চাদর সাজানো ছিল, সমস্তই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার 'পোর্টম্যান্টো'টা পর্যন্ত আর ঘরের ভিতরে নেই।

এ কীর্তি যে রাজার, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন কী করব? আমি যে একেবারে রিক্ত! আমার পরনে আছে কেবল একখানা আধ-ময়লা কাপড় আর একটি মাত্র গেঞ্জি। আমার পায়ের তিন জোড়া জুতো পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। এমন বেশে, এমন নগ্নপদে আমি যে বাড়ির বাহিরে যেতে পারব না, নিশ্চয় তাই বুঝেই রাজা এই ব্যবস্থা করেছেন।

নয়

রাজার দেহ

কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেবল রাত্রিবেলাতেই আমি হই নানান আতঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত। রাত্রেই আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রকম-রকম বিপদ-আপদ। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই, আজ পর্যন্ত দিনের

বেলায় সূর্যাস্তের আগে একদিনও আমি রাজার দেখা পাইনি। এর হেতু কী? পৃথিবী যখন জাগে, উনি কি তখন ঘুমোন, আর পৃথিবী যখন ঘুমোয়, তখনই কি তিনি ওঠেন জেগে?

আজ সকালে দেখছি, আমার ঘরের দরজাটা বাহির থেকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। খালি পায়ে আর প্রায় অর্ধনগ্ন দেহে আমি যে এই বিশালগড় ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করব না, এইটুকু আন্দাজ করেই রাজা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছেন আমার সম্বন্ধে।

কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে চলাফেরায় আমার যখন বাধা নেই, তখন দিনের বেলায় এখানকার রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? খুব সম্ভব সমস্ত রহস্যের মূল তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রাজার ওই তিনতলার শয়নগৃহে প্রবেশ করলে। কিন্তু কেমন করে সেখানে যাব? দেখছি সে-ঘরের দরজা সর্বদাই তালাবন্ধ থাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আচ্ছা, রাজা নিজের ঘরের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে যেভাবে নীচে নেমে আসেন সেইভাবেই কি কেউ বাহির থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে না? আমি নিজের চোখে তাঁকে ওখান থেকে নামতে দেখেছি, চেষ্টা করলে আমিই বা কেন ওই পথ দিয়ে উপরে উঠতে পারব না? অবশ্য পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু আসুক বিপদ, আমি এখন মরিয়া। এখানে আর কিছুদিন থাকলেও যখন বাঁচব না, তখন বাঁচবার চেষ্টা করেও যদি মরতে হয়, তবে সেটা হবে মন্দের ভালো। বেশ, দেখা যাক। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন।

জানলার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখলুম, আমার ঘরের গবাক্ষের ঠিক নীচে দিয়ে বাড়ির এদিক আর ওদিকে চলে গিয়েছে দোতলার সুদীর্ঘ কার্নিশটা। সেকালকার বড়ো-বড়ো বাড়ির কার্নিশ এমন চওড়া হত যে একটু চেষ্টা করলেই তার উপর দিয়ে অনায়াসেই পদচালনা করতে পারা যেত। রাজার তিনতলার ঘর থেকে জীর্ণ দেওয়ালের যে ধার-বার-করা পাথরগুলো একতলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, আমার এই গবাক্ষ থেকে দেওয়ালের সেই অংশটার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। সুতরাং ওখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বলেই মনে করি।

গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। বুকটা একবার কেঁপে উঠল, কারণ এই সেকেলে বাড়ির অতি পুরাতন কার্নিশ আমার ভারে যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তাহলে বিদায় আমার পৃথিবী, বিদায় আমার বাঁচবার আশা!

নীচের দিকে তাকালুম না—হয়তো ভূমিতলের দূরত্ব দেখে মাথা ঘুরে যেতে পারে। দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে পায়ে পায়ে রাজার ঘরের নীচেকার এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলোর কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলুম। তারপর দুই হাত আর দুই পায়ের সাহায্যে সেই ধার-বার-করা পাথরগুলো অবলম্বন করে সাবধানে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে লাগলুম।

এই তো সেই গবাক্ষ, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে রাজা সেদিন নীচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন। ঘরের ভিতরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বুকটা আমার দুরদুর করে উঠল। কিন্তু তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে জনপ্রাণী নেই। জানলার উপরে হাত চাপড়ে কয়েকবার শব্দ করলুম, ভিতর থেকে তবু কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিশেষ বিস্মিত হলুম। রাজা তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে যান? কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হয়নি কেন? আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি কেবল নিশাচর রূপেই।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে নামলুম। গৃহতল মর্মর-মণ্ডিত বটে, কিন্তু ধুলোর প্রলেপে ও যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে মর্মরের তাজা শুভ্রতা। সেই প্রশস্ত ঘরের চারিদিকেই রয়েছে হরেক রকম আসবাব। প্রত্যেক আসবাবই অত্যন্ত গুরুভার ও বহুকাল আগেকার। এসব আসবাব যে ব্যবহৃত হয়, এমন কোনও প্রমাণও পেলুম না।

এক জায়গায় রয়েছে মস্ত-বড়ো একটা সেকেলে টেবিল। তার উপরে স্তূপীকৃত হয়ে আছে অনেক রকম স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণ-স্তূপের উপরেও জমে উঠেছে প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। বোঝা গেল সেসব মুদ্রাও অনেক কাল স্পর্শ করা হয়নি। মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করলুম। কোনও মুদ্রারই বয়স তিনশো বছরের কম নয়। তাহলে কী বুঝতে হবে, এইসব স্বর্ণমুদ্রা তিন শতাব্দীর মধ্যে কোনও মানুষের ব্যবহারে আসেনি? কেবল কি মুদ্রা? মণিমুক্তোখচিত ভারী ভারী কতরকম জড়োয়া গহনা! সেরকম গহনাও একালে কারুর দেহেই শোভা পায় না।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এ কী অদ্ভুত ঘর! এখানে এসে দাঁড়ালে বর্তমানের আধুনিকতা যেন চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সুদূর অতীতের সমস্ত রহস্য যেন কার জাদুমন্ত্রে জীবন্ত হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে!

শুনেছিলুম এটা নাকি রাজার শয়নগৃহ। কিন্তু তিনি শয়ন করেন কোথায়? চারিদিকে তাকিয়েও কোনও খাট-পালঙ্ক, এমনকি ঘরের মেঝেতে পাতা কোনও শয্যা পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। এটা শয়নগৃহ হলে মানতে হয়, এর মালিক শয়ন করেন ধূলিধূসর নগ্ন মেঝের উপরে। কিন্তু সেটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। দেখলুম ঘরের ভিতরে একদিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে আর একটা দরজা। তার পাল্লা দুখানা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল একটা সরু পথ। অগ্রসর হয়ে পথের শেষে দেখলুম, সঙ্কীর্ণ এক সার সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সে-রকম অন্ধকারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হল না। আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। সেখানে খোঁজাখুঁজি করে একটা টেবিলের তলা থেকে বার করলুম সেকেলে এক বাতিদান, তার উপরে রয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ পোড়া একটা বাতি। বাতির মুখে আলো জ্বেলে আবার সেই সরু পথটার ভিতর দিয়ে এগিয়ে সিঁড়িগুলোর কাছে গেলুম। তারপর খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে লাগলুম নীচের দিকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপেই জমে আছে যে কত যুগের পুরাতন ধুলো, আন্দাজে তা হিসাব করে বলা অসম্ভব। মনে হল, শতাব্দীর পরে এই সিঁড়িগুলোর উপরে সর্বপ্রথমে পড়ল আমার পদচিহ্ন। কারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেও ধুলার পটে পেলুম না আর কারুর পায়ের দাগ। ভাবতে লাগলুম, প্রাসাদের তিনতলায় রাজার শয়নগৃহের পাশে এক সার সিঁড়ি থাকার সার্থকতা কী? তবে কি এর নীচে আছে সেকালকার চোরাকুঠরির মতো কোনও একটা জায়গা,—সমূহ বিপদের সময়ে যার ভিতরে আত্মগোপন করা যায়?

ক্ষীণ দীপালোকের ধাক্কায় অন্ধকারের নিবিড়তাকে অল্প অল্প সরিয়ে নীচের দিকে যতই নেমে যাচ্ছি, মনের ভিতরে ততই প্রবল হয়ে উঠছে একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভয়। আমার আত্মা যেন অনুভব করতে লাগল, ইহলোকের দিকে পিছন ফিরে এগিয়ে চলেছে সে অলৌকিক এক রহস্যের অভিমুখে।

অবশেষে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানে পায়ের তলায় পেলুম

শীতল কাঁচা মাটির স্পর্শ। বোধহয় আমি আবার নেমে এসেছি বাড়ির একতলায়। সামনে আবার একটা গলিপথ। সেখানে বদ্ধ হাওয়ায় জমে রয়েছে কেমন একটা ভীষণ দুর্গন্ধ। সে যেন কোনও গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ, তা সহ্য করা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিলুম, কিন্তু তবু তার কবল থেকে নিস্তার পেলুম না।

দ্বিগুণতর ভয়ে বুকের ভিতরে জাগল ঘন-ঘন কম্পন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কীসের এই দুর্গন্ধ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলুম না বটে, তবু যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই পদচালনা করে গলিপথটার শেষে গিয়ে পেলুম আর একটা অত্যন্ত নিচু ও সঙ্কীর্ণ ঘর। সেখানকার বাতাস পর্যন্ত যেন বিষাক্ত, প্রতি মুহূর্তে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সেখানকার অন্ধকার এমন পুঞ্জীভূত যে, ক্ষীণ দীপশিখাটাকে দেখাতে লাগল তার গায়ে একটা তুচ্ছ, রক্তহীন ও হলদে ক্ষতচিহ্নের মতো। সেখানকার আনাচে-আনাচে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে যেন এমন সব অভাবিত বিভীষিকা, যে-কোনও মুহূর্তে যারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো দৃশ্যমান হয়ে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে পারে জীবন-প্রদীপের শিখা।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব বিসদৃশ চিন্তাকে মনের ভিতর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে মনে নিজের মনকে ডেকে নিজেই বলে উঠলুম—তুমি জাগ্রত হও, ভুলে যাও অন্য সব তুচ্ছ ভাবনা। তুমি এসে পড়েছ এখন রহস্যের শেষ প্রান্তে। এখন আর ইতস্তত করলে চলবে না।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা কুলুঙ্গি। তার উপরেই রেখে দিলুম বাতিদানটা।

ঘরের কোনওদিকেই কোনও কিছুই নেই—কেবল মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স। মেপে দেখলুম বাক্সটা লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় দুই হাত। খুব মজবুত পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি সেই বাক্সটা, তার ডালাটা এত ভারী যে টেনে তুলতে যথেষ্ট শক্তির দরকার হয়।

কিন্তু ডালা তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম বিদ্যুতাহতের মতো। দুঃস্বপ্নেও এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না! কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

বাক্সের মধ্যে লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে রাজার দেহ। বুঝতে পারলুম না সে দেহ মৃত কি নিদ্রিত। কারণ, তার দুই চক্ষুই ছিল বটে উন্মুক্ত ও আড়ষ্ট, কিন্তু মৃতের চক্ষে থাকে যে-রকম অস্বাভাবিক ভাব, এখানে তার কোনওই চিহ্ন নেই; মুখের বিবর্ণতার মধ্যেও ফুটে আছে যেন জীবনের তপ্ততা এবং ওষ্ঠাধরের আরক্ত আভাও মলিন হয়ে যায়নি কিছুমাত্র।

কিন্তু জ্যান্ত মানুষের বুক যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠে এবং নামে এই দেহে তার কোনও চিহ্নই নেই। বক্ষস্থল একেবারে স্থির। আমি রাজার উপরে নত হয়ে পড়লুম। জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা।

আচম্বিতে লক্ষ করলুম, রাজার সেই আড়ষ্ট মৃত চক্ষুর ভিতরেও ফুটে আছে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব। সে চক্ষুদুটো আমাকে যে দেখতে পাচ্ছে না এবং আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন এটাও আমি বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু সেই মারাত্মক মরা দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে করতে লাগল আতঙ্কবৃষ্টি। সহ্য করতে পারলুম না, প্রাণপণে ছুটে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম—এমনকি, বাতিদানটাও তুলে নিয়ে আসবার অবসর পর্যন্ত পেলুম না।

দশ

আজ, নয় কাল

সূর্য অস্তাচলে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও আকাশের মেঘে মেঘে খেলা করছিল খানিকটা পরিত্যক্ত রক্তরাগ। আর একটু পরেই হবে তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার আগমন।

আজও আমি উপরের খোলা ছাদে একলা দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার বন্দিজীবনে এখানকার মুক্ত আলোক ও বাতাস ছাড়া আর কিছুই উপভোগ করবার উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝে ছাদে না এসে থাকতে পারি না।

হঠাৎ দেখলুম রাজার ঘরের গবাক্ষের কাছে কী যেন একটা নড়ে নড়ে উঠছে। ভালো করে দেখেই আমার চোখ উঠল চমকে। এ যে একখানা ভয়ঙ্কর কালো মুখ! মানুষের মুখ নয়, কোনও কুৎসিত জন্তুর মুখ। তার দুটো ছোটো-ছোটো চোখে কী বিষম তীব্রতা! মনে হল, জ্বলন্ত চক্ষে সেই মুখখানা তাকিয়ে আছে আমার পানে।

আলোক তখন অস্পষ্ট, ওটা যে কী জন্তু তা আন্দাজ করা গেল না। তারপর আমার দৃষ্টিকে অধিকতর বিস্মিত করে সেই জন্তুর সমস্ত দেহটা করলে আত্মপ্রকাশ। একটা মস্ত বড়ো বাদুড়। বাদুড় যে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের ঘরে বসে থাকতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। তারপরেই মনে হল, রাজা তো মানুষের দেহেও মানুষ নন। তাঁকে অমানুষ বললেও কোনও অত্যুক্তি হয় না। এমন অমানুষের সঙ্গে যে বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি অমঙ্গলকর জীব বাস করবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

বাদুড়টা তখনও মুখ ফিরিয়ে আছে আমার দিকে। অমন করে ও আমাকে দেখছে কেন? আমাকে দেখে ওর তো লুকিয়ে পড়বার কথা। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে আমি জোরে কয়েকবার হাততালি দিলুম। তার দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে ঠিকরে পড়ল যেন আগুনের ফিনকি! তারপর সে হঠাৎ উঠে ছাদের প্রাচীরের উপরে এসে বসল এবং আবার দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

এ-রকম আশ্চর্য বাদুড় জীবনে কখনও দেখিনি। মানুষকেও ভয় করে না, উলটে মানুষের কাছে এগিয়ে আসে এবং জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে চেষ্টা করে ভয় দেখাবার।

একবার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে বাদুড়টার উপরে এক ঘুসি বসিয়ে দিই। কিন্তু তাও পারলুম না, কেমন ভয় হল। হয়তো রাজা যেমন মানুষ হয়েও মানুষ নন, এই বাদুড়ের পিছনেও তেমনই কোনও রহস্য আছে। হয়তো এটাকে বাদুড়ের মতন দেখালেও বাদুড় নয়।

দূর থেকে তাকে ছুড়ে মারবার জন্যে ছাদের উপরে হেঁট হয়ে একখণ্ড ইষ্টক তুলে নিলুম। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলেই দেখি বাদুড়টা আর সেখানে নেই, দুদিকে দুখানা পাখনা বিছিয়ে দিয়ে সবেগে উড়ে যাচ্ছে সান্ধ্য আকাশের তলায় প্রকাণ্ড একটা অভিশপ্ত কালো প্রজাপতির মতো।

অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ধীরে, ধীরে, ধীরে। আর ছাদের উপরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। এখনই এখানে এসে দেখা দিতে পারে সেই তিন পেতনির মূর্তি। তাদের কথা স্মরণ

করেই বুক ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে পালিয়ে এলুম। তারপর বিছানার উপর শুয়ে পড়তেই অসময়ে চোখে এল ঘুম।

খানিক পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রাজা স্বয়ং। তাঁর মুখ এমন গম্ভীর যে দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু রাজা শোনালেন সুমিষ্ট এক আশ্বাসবাণী। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, এখানে আজই আপনার শেষ রাত্রি। কালকেই আপনি কলকাতায় যাত্রা করতে পারবেন। আমি আজই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কারণ আর একটু পরেই আমাকেও করতে হবে বিদেশ যাত্রা। বিশেষ এক গোপনীয় কারণে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার যাওয়ার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা তা আমি করে যাব।'

এই হানাবাড়িতে আমাকে একলা থাকতে হবে? এমন চিন্তাও আমার পক্ষে ভয়াবহ। বললুম, 'আমিও তো আজকেই যেতে পারি?'

—'তা হয় না বিনয়বাবু। আমার কোচম্যান আজ এখানে নেই।'

—'কিন্তু যদি আপনি আদেশ দেন, তাহলে আমি পায়ে হেঁটেই এখান থেকে যাত্রা করতে পারি।'

রাজা হাসলেন একটুখানি শান্ত হাসি। আমার সন্দেহ হল, এই শান্ত হাসির পিছনে আছে নিশ্চয়ই কোনও নূতন অশান্তি। তিনি বললেন, 'সঙ্গের জিনিসপত্তর না নিয়েই আপনি চলে যেতে চান?'

—'চুলোয় যাক জিনিসপত্তর! পরে সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমি লোক পাঠিয়ে দেব।'

অতিশয় ভদ্রের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'বেশ, তাহলে আসুন, বন্ধু! আপনি যদি এখনই যেতে চান, আমি কোনওই বাধা দেব না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করি না।'

মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিপুল আনন্দে। কিন্তু মনের ভাব বাইরে গোপন করে রাজার পিছনে পিছনে আমি হলুম অগ্রসর। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একেবারে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা দরজার পাল্লা দুখানা খুলে দিলেন—খানিকটা চাঁদের আলো দ্বারপথের ভিতরে এসে পড়ল। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে তুললেন তাঁর দীর্ঘ একখানা বাহু এবং তাঁর বাহু ঊর্ধ্বোত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ত্রস্ত কর্ণে প্রবেশ করল একদল নেকড়ে বাঘের বীভৎস চিৎকার-ধ্বনি। তারপরেই সভয়ে দেখলুম, আঙিনা জুড়ে দরজার দিকে পালে পালে ছুটে আসছে নেকড়ের পর নেকড়ে! তাদের ক্রূর চক্ষু ও নির্দয় দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠছে চাঁদের আলোয়।

আমি বাড়ির ভিতর পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই রাজা বজ্রমুষ্টিতে ডান হাতটা চেপে ধরলেন। আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম না, কারণ চেষ্টা করলেও আমি সফল হতুম না—আগেই পেয়েছি ওই বাহুর শক্তির পরিচয়। নাচার হয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ানক কথা। নেকড়েগুলো তখন আমাদের খুব কাছেই এসে পড়েছে।

দুরাত্মা রাজা কি নেকড়েদের কবলেই আমাকে সমর্পণ করতে চান? তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'দরজা বন্ধ করুন, আজ আমি এখান থেকে যেতে চাই না!'

নির্বাক মুখে সশব্দে রাজা দরজার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলেন। এবং নির্বাক মুখেই দুজনে আবার দোতালার ঘরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর মৌনব্রত ভঙ্গ না করেই রাজা আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে আমি বন্ধ করে দিলুম।

অল্পক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি যখন শোবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ আমার ঘরের দরজার ওপাশে শুনতে পেলুম কাদের কণ্ঠস্বর। ফিস-ফিস করে কারা কথা কইছে। দরজার উপরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাজা বলছেন, 'বিদেয় হ, বিদেয় হ! নিজের জায়গায় চলে যা! এখনও তোদের সময় আসেনি। সবুর কর! ধৈর্য ধর! আজকের রাত হচ্ছে আমার। কাল আসবে তোদের রাত।'

তারপরেই শুনতে পেলুম নিম্ন অথচ মিষ্ট মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হাসির রোল।

দুর্জয় ক্রোধে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেলুম। সশব্দে দরজাটা খুলে ফেলে দেখলুম, সেই তিনটে প্রেতিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আমাকে দেখেই তারা খলখল অট্টহাস্য করে উঠে দ্রুতপদে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের পুতুলের মতো। আজ নয়, কাল? আমার অন্তিমকাল কি এতখানি ঘনিয়ে এসেছে? আজ নয়, কাল—আজ নয়, কাল! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

এগারো

মুক্তি

সকাল হবার আগেই আমার ঘুম গেল ভেঙে। আজ আমার মৃত্যুর দিন। কিন্তু মৃত্যু যদি আসে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মদান করব না।

দূর থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলে, আবার এসেছে নতুন প্রভাত।

মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও মন হল প্রসন্ন। বুঝলুম, রাত্রি যখন বিদায় নিয়েছে, তার বিভীষিকাগুলো এখন আর আমাকে ভয় দেখাতে আসবে না। আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, আমিও ততক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু এই দিনের আলো থাকতে থাকতেই আজ আমাকে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমেই মনে জাগল একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা। রাজা কোথায় আছেন আমি জানি, আমি আর একবার তাঁকে দেখতে চাই।

প্রথম দিন যে উপায়ে রাজার ঘরে ঢুকেছিলুম, সেদিনও তাই করলুম। ভাবলুম, রাজা যদি জেগে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তেই আমাকে হত্যা করবেন। কিন্তু আজই যখন আমাকে মরতে হবে, তখন আর মৃত্যুকে ভয় করে লাভ কী? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, আজও রাজা ঘরে নেই।

সেদিনও বাতিটা নিয়ে ঘরের ভিতরকার দরজা দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, এই বাতিদানটা সেদিন আমি ফেলে এসেছিলুম নীচেকার ঘরের কুলুঙ্গিতে। কিন্তু বাতিদানটা আবার উপরে নিয়ে এল কে? নিশ্চয়ই রাজা নিজেই। তাহলে তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে আমার সব কীর্তি? বুঝেছি, এইজন্যেই হয়েছে আমার উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। রাজার গুপ্ত কথা যখন জেনে ফেলেছি, তখন আর আমার রেহাই নেই। উত্তম! তাহলে আমিও আজ রাজাকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই!

সেই স্যাতসেঁতে ভীষণ অন্ধকার গৃহ, সেই অসহনীয় গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেই প্রকাণ্ড বাক্সটা আবার পড়ে আছে আমার চোখের সুমুখে।

দুই হাতে টেনে ভারী ডালাটা খুলে ফেললুম। তারপর এমন কিছু দেখলুম যে, আমার আত্মা পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কল্পনাতীত এক আতঙ্কে।

তেমনিভাবেই চিত হয়ে বাক্সের ভিতরে রাজা শুয়ে আছেন, কিন্তু রাজার জরাগ্রস্ত দেহের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে যেন যৌবনের তারুণ্য। মাথার সেই ধবধবে সাদা চুলগুলো পর্যন্ত আবার কালো হয়ে উঠেছে। তাঁর দুই গণ্ড ছিল কোটরগত, এখন হয়েছে পুরন্ত। সারা মুখখানার উপরে ফুটে উঠেছে গোলাপি আভা। কিন্তু রাজার ওষ্ঠাধরের দুই পার্শ্ব দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও কীসের চিহ্ন? রক্ত, রক্ত? হ্যাঁ, রাজার ঠোঁটের দুই পাশ দিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে তাঁর চিবুক ও কণ্ঠদেশ পর্যন্ত করে দিয়েছে চিহ্নিত। এমনকি, তাঁর সেই বীভৎস চোখদুটোও হয়ে উঠেছে যেন নবজীবনের উচ্ছ্বাসে জীবন্ত। বোধ হল, এই ভয়াবহ জীবটা কার রক্ত পান করে দেহের ভিতরে আবার সঞ্চয় করেছে নবযৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য।

বুকটা আমার শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, কিন্তু সমস্ত অন্তরাত্মা হয়ে উঠল বিদ্রোহী। ভালো করে একবার রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। মনে হল, আমাকে দেখে সে-মুখ যেন হাসছে বিদ্রূপ-হাস্য। সেই হাসি দেখে রাগে আমি যেন পাগলের মতো হয়ে উঠলুম। এই অমানুষিক মানুষ পৃথিবীতে প্রতিদিন করছে নরহত্যার পর নরহত্যা এবং এখনও হয়তো করবে আরও কত নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা। এ যখন কলকাতাতেও যেতে চায়, তখন বোধ হচ্ছে সেখানে গিয়েও দিনের পর দিন দেবে আরও কত নরবলি। আর এই পিশাচকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য করতে আজ আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! এই মূর্ত মহাপাপ কলকাতায় গিয়ে যদি হাজির হয়, তবে তার সমস্ত অপরাধের জন্যে দায়ী হতে হবে আমাকেই। না, আমি একে কিছুতেই সে সুযোগ দেব না!

ঘরের এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ভারী শাবল। আমি তখনই শাবলটা নিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরলুম, তারপর মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলুম সবলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার মুখখানা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বিজাতীয় চক্ষু দিয়ে করলে যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ। আমার দেহ হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো আড়ষ্ট এবং হাতের শাবলটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে রাজার কপালের উপর দিয়ে চলে গিয়ে কেবল একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। শাবলটা আবার যখন টেনে তুলতে গেলুম, তখন তার ধাক্কা লেগে বাক্সের ডালাটা আবার পড়ে গেল সশব্দে। সে ডালাটা আর আমার খোলবার ইচ্ছা হল না। জীবন্ত মৃতদেহের যে দৃশ্য দেখলুম, আমার পক্ষে হল তাই-ই যথেষ্ট।

ভাবতে আর ভাবতে আর ভাবতে লাগলুম, অতঃপর আমার কর্তব্য কী? যেমন করেই হোক, আজ দিনের বেলাতেই এখান থেকে পালাতে না পারলে আমার পক্ষে আজকের রাত্রিই হবে শেষের রাত্রি।

বাড়ির উপরতলা থেকে একতলায় নামবার উপায় তো আমার হাতেই রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে যে-পথটা বাড়ি থেকে বেরুবার জন্যে রাজা নিজে ব্যবহার করতেন, যদিও তাকে কুপথ বা বিপথ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, তবু সেই পথই আজ আমাকে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। কারণ, রাজার মতন আমিও জানি ওই পথটা কেমন করে ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু কেবল বাড়ির বাইরে গেলেই তো চলবে না, বাইরের অঙ্গনের পরেই আছে বিশালগড়ের অত্যন্ত উচ্চ প্রাচীর। সেই দুরারোহ প্রাচীর পার না হতে পারলে বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনওই লাভ নেই।

প্রাঙ্গণের ভিতরে কাল রাত্রে দেখেছি রাজার পোষ মানা সেই নেকড়ে-বাঘগুলোকে। হয়তো আজ দিনের বেলায় তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে না। খুব সম্ভব ওই নেকড়েগুলোও হচ্ছে রাজার মতো নিশাচর, দিনের আলোয় আসতে ভয় পায়।

কিন্তু প্রাচীর পার হই কেমন করে—প্রাচীর পার হই কেমন করে! মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির তেতলায় গিয়ে উঠলুম। সেখানে সেই যে ধুলো-জঞ্জাল-আবর্জনাভরা ছোটো ছোটো দুখানা কামরা দেখেছিলুম, সে-দুটোর দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে না; হঠাৎ মনে পড়ল তারই একখানার ভিতরে দেখেছিলুম অনেকগুলো নারিকেল দড়ি। আজও আবার সেই ঘরে ঢুকে দেখলুম, দড়ির গোছা যথাস্থানে সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। সেই দড়িগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে ও যুক্ত করে সুদীর্ঘ একগাছা কাছি তৈরি করে ফেললুম। তারপর আবার নীচে নেমে এলুম।

ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের এধার ওধার পর্যন্ত লক্ষ করে দেখতে লাগলুম। কারণ কাছি ঝুলিয়ে আমি প্রাচীরের বাইরের দিকে নেমে যেতে পারি বটে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করব কী উপায়ে?

ভগবানের আশীর্বাদে তারও উপায় আবিষ্কার করে ফেললুম। অঙ্গনের ভিতরে প্রায় প্রাচীর ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ ও প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ এবং তারই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে। ওই গাছটা হবে এখন আমার অবলম্বন।

এর পরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির বাইরে অঙ্গনের ভিতরে গিয়ে পড়লুম। কোথায়ও জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেউ আমাকে বাধা দিতে এল না। গাছে উঠে ডাল ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর প্রাচীরের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া একটা ডালে কাছিগাছা বেঁধে ঝুলে পড়লুম দুর্গা বলে। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

আবার আমি স্বাধীন! নরকের ভিতর থেকে আমি ধরিত্রীর শ্যাম কোলে ফিরে এসেছি! নরকের দূতরা আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না!

শরীরী প্রেত—শরীরী প্রেত! তার কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি, কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখেছি স্বচক্ষে। তার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারব না।

খুব সম্ভব এর পর এই শরীরী প্রেতের কর্মক্ষেত্র হবে কলকাতার মুক্ত জনতার মধ্যে। শরীরী প্রেতকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। কিন্তু তার অমানুষিক কবল থেকে কলকাতাকে রক্ষা করতে হবে,—রক্ষা করতে হবেই! এখন আমার সামনে রইল কেবল এই কর্তব্য।

খালি পা। দেহে আছে খালি ময়লা গেঞ্জি ও কাপড়। এই বেশে আমার এই ছন্নছাড়া চেহারা দেখলে কেউ হয়তো আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এখন যে-কোনও উপায়ে একবার কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

পথ-খরচের জন্যে ভাবি না। পথ-খরচের জন্যে যে টাকার দরকার হবে, এটা আমি ভুলিনি। তাই বাড়ির বাইরে আসবার আগে রাজার ঘরের সেই টেবিলের উপর থেকে আমি দুই মুঠো সোনার মোহর পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

(বিনয়ের ডায়েরি আপাতত এইখানেই শেষ হল)

উত্তরার্ধ

এক

কলকাতায় ভ্যাম্পায়ার

অবিনাশবাবু একজন রীতিমতো মজলিশি লোক। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপরে ছিল তাঁর বসতবাড়িখানি। সেইখানে রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানায় হত নানা শ্রেণীর লোকের আগমন। এবং রোজই সেখানে তপ্ত পিয়ালার গরম চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশত সিগার-সিগারেট বা গড়গড়ার ঘূর্ণায়মান ধূম্ররাশি। তার উপরে প্রতিদিন যে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবারের ব্যবস্থা হত না, অবিনাশবাবু সম্বন্ধে এমন অভিযোগও করা যায় না।

অবিনাশবাবু পঞ্চাশের ওপারে গিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে বৃদ্ধ বললেও তিনি আপত্তি করতে পারবেন না—যদিও তাঁর মাথার চুল ও ঠোঁটের উপরকার গোঁফজোড়াটি এখনও পক্কতার উপরে দাবি করতে পারে না। তাঁর দেহ এখনও আছে দস্তুরমতো কর্মঠ ও বলিষ্ঠ। তাঁর পিতা পরলোকে যাবার সময় ইহলোকে এমন কিছু রেখে গিয়েছেন যার মহিমায় অবিনাশবাবুকে কোনওদিনই ভাবতে হয়নি ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা। সংসারের ভাবনাকেও জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন, কারণ আজ পর্যন্ত তিনি সুদূরে পরিহার করে এসেছেন বিবাহ নামক সুপ্রসিদ্ধ উপদ্রবটা। বিয়ের পর রাঙাবউ আসা ব্যাপারটা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে ওই পর্যন্ত। তারপর আসতে শুরু করে যখন 'পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা', ব্যাপারটা তখন গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করে। তারপরে সেই সূত্রে আসে যে কতরকম বিপদ, বিভ্রাট ও বিভীষিকা, এখানে তার তালিকা দাখিল করবার দরকার নেই। অতএব আপনারা খালি এইটুকুই জেনে খুশি থাকুন, অবিনাশবাবুর গৃহস্থালিতে তিনি নিজেই হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়।

কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় রোজ যে নিয়মিত আসরটি বসে, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই। এই আসরের মাঝখানটিতে বসতে পারলেই তিনি ছাড়তে পারেন আরামের নিঃশ্বাস। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রোজই সেখানে চলে তাস-দাবা-পাশা খেলা এবং গোটা দুনিয়াকে নিয়ে উত্তপ্ত বা অল্পতপ্ত বা অতি শান্ত আলোচনা। সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রিটা এইভাবে না কাটালে তাঁর উপরে দয়া করতেন না নিদ্রাদেবী।

অবিনাশবাবুর আর একটি শখ হচ্ছে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। এ-বিষয় নিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। বাংলায় ও বাংলার বাইরেও প্রথম শ্রেণীর প্রেততত্ত্ববিদ বলে অবিনাশবাবুর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কারুর কোনও জিজ্ঞাসা থাকলেই জবাব খোঁজবার জন্যে তিনি হতেন অবিনাশবাবুর দ্বারস্থ। এই জিজ্ঞাসুদের জন্যে অবিনাশবাবু প্রতিদিনই অনেকটা সময় ব্যয় করতে বাধ্য হন।

সেদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অবিনাশবাবু দেখলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন একটি যুবক। মানুষটির মনের ভিতরে যে বিশেষ এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, মুখ দেখলে সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

অবিনাশবাবু নিজের নির্দিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবক শুধোলে, 'মহাশয়ের নাম কি অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—'একটি গুরুতর কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কারণটি কী?'

—'কারণ বলার আগে এই খবরের কাগজের একটা জায়গা আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি?'

—'অনায়াসেই।'

যুবক একখানি খবরের কাগজ বার করে পাঠ করতে লাগল

'কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নহে, উপরন্তু রীতিমতো বিপজ্জনক। এমনকি, সাঙ্ঘাতিক!

'গত একমাসের মধ্যে ওখানে একই কারণে সাতজন লোক মারা পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায় মাত্র সাতজনের মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, প্রতি মিনিটেই সেখানে হয়তো একাধিক ব্যক্তি করিতেছে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। তথাপি এই সাতজন লোকের মৃত্যু লইয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে অত্যন্ত বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণের অভাব নাই।

'কারণগুলি এই

'পরে-পরে এই সাতজন লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে শয্যায় শায়িত অবস্থায়, নিদ্রার সময়ে।

'প্রত্যেক লোকটিরই স্বাস্থ্য ছিল ভালো এবং কোনও পীড়ায় তাহাদের মৃত্যু ঘটে নাই। যদিও হত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশে পাওয়া গিয়াছে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, তবু কোনও হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া যে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ, প্রতি ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিরা ছিল রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে। প্রতি ঘটনাস্থলেই বাহিরের কোনও লোকের প্রবেশ ও প্রস্থানের কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কোনও মৃত ব্যক্তিরই এমন শত্রু ছিল না, যে তাহাকে হত্যা করিতে পারে। কাহারও ঘর হইতে কোনও মূল্যবান দ্রব্যও অদৃশ্য হয় নাই।

'অথচ প্রত্যেকেই মারা পড়িয়াছে একই অস্বাভাবিক কারণে। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ রক্তহীনতা। মৃত ব্যক্তিদের কাহারও রক্তহীনতা ব্যাধি ছিল না, অথচ কোনও মৃত ব্যক্তিরই দেহের মধ্যে পাওয়া যায় নাই একবিন্দু রক্তের অস্তিত্ব। রক্তহীনতা ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটিলেও মানুষের দেহের এমন অবস্থা ঘটে না। দেখিলে মনে হয়, তাহাদের দেহের ভিতর হইতে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের একই কারণে এমনভাবে মৃত্যু হওয়াতে শহরের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

'কাহারও কাহারও ধারণা, এ একরকম নূতন রহস্যময় ব্যাধি, হয়তো অবিলম্বে সাবধান না হইলে এই বিশেষ ব্যাধি মড়কের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে।

'কেহ-কেহ এই ঘটনাগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু পুলিশ বিপদে

পড়িয়াছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই কণ্ঠের উপরকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন লইয়া। মৃত্যুর আগে তাহাদের কাহারও কণ্ঠে যে ও-রকম ক্ষতচিহ্ন ছিল না, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওই সব ক্ষতচিহ্নের জন্য দায়ী কে? এটুকুও বুঝা গিয়েছে, অত ছোটো ক্ষতের জন্য কোনও মানুষের মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ওই লোকগুলির মৃত্যুর সঙ্গে যে ওই-সব ক্ষতের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

'কোনও কোনও লোক আর-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এইসব মৃত্যুর জন্য দায়ী হইতেছে Vampire Bat বা পিশাচ-বাদুড়। এই জাতীয় বাদুড়দের স্বভাব, নিদ্রিত জীবজন্তুদের রক্ত শোষণ করা।

'তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কেহ-কেহ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পিশাচ-বাদুড়ের স্বদেশ হইতেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ও-শ্রেণীর বাদুড় পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। উত্তরে প্রথম দল বলিতেছেন, পিশাচ-বাদুড়রা যে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই বাস করে, একথা তাঁহাদেরও কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু দৈবগতিকে ওই জাতীয় দু-একটা বাদুড় যে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে পারে না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। হয়তো আমেরিকা হইতে আগত কোনও জাহাজের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতসারেই তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে।

'এ সম্বন্ধে কাহার কথা সত্য ও কাহার কথা মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই যে অত্যন্ত রহস্যময় ও বিপজ্জনক, সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইবে।'

পড়া সাঙ্গ করে যুবকটি বললে, 'এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমার কোনও মতামত নেই। আপনি পড়লেন, আমি শুনলুম—এইমাত্র।'

—'লোকগুলি এমনভাবে যে মারা পড়ল, তার কি কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে না?'

—'কারণ তো অনেকেই দেখিয়েছে, আমি আর নতুন কী কারণ দেখাতে পারি?'

—'আজ্ঞে, আপনি তাই পারেন বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কী রকম? আমি গোয়েন্দাও নই, ডাক্তারও নই; মৃত্যুর বা হত্যার রহস্য নিয়ে কোনওদিনই কারবার করিনি।'

—'কিন্তু আপনি হচ্ছেন বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্ববিদ।'

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি সচকিত হয়ে উঠল। চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে যুবকের মুখের উপরে ভালো করে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার নাম কী?'

—'শ্রীবিনয়ভূষণ ভৌমিক।'

—'কী করেন?'

—'আমাকে আইন-ব্যবসায়ী বলে মনে করতে পারেন।'

—'আমি প্রেততত্ত্ববিদ বলেই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনি কি মনে করেন, খবরের কাগজের ওই রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে প্রেততত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ আছে?'

—'আজ্ঞে, তা না মনে করলে আপনার কাছে আসব কেন?'

—'আপনার এ-রকম সন্দেহের কোনও কারণ বুঝলুম না।'

বিনয় সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'Vampire কাকে বলে?'

—'সার্বিয়ান ভাষার Vampir শব্দ থেকে ইংরেজি এই Vampire কথাটির জন্ম। সার্বিয়ানদের বিশ্বাস, কোনও দানব বা সদ্যোমৃত লোকের প্রেতাত্মা অন্য কোনও মানুষের মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে জীবন্ত জীবদের রক্ত শোষণ করে বেড়ায়। বাংলায় Vampire কে আমরা পিশাচ বলে ডাকতে পারি।'

—'আচ্ছা অবিনাশবাবু, পৃথিবীতে পিশাচ আছে, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'করি।'

—'আপনি কখনও পিশাচ দেখেছেন?'

—'স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পেয়েছি।'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলকাতাতেও এক দুর্দান্ত পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। ওই সাতজন লোকের মৃত্যু তারই কীর্তি।'

অবিনাশবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কোনওরকম প্রমাণ না পেয়েই আপনি এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন?'

—'না অবিনাশবাবু, তা নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

—'যথা?'

—'ঠিক ওভাবে আমি কোনও প্রমাণ দেখাতে চাই না। আপনার কাছে একটি কাহিনি বলতে চাই, আর সে-কাহিনির নায়ক হচ্ছি আমিই। আপনি কি দয়া করে সে কাহিনিটি শুনবেন?'

বিনয়ের মুখের উপরে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

তারপর বিনয় একে-একে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলে সে সব কথা তার ডায়েরি পাঠ করে আগেই আমরা জানতে পেরেছি।

গম্ভীর মুখে খুব মন দিয়ে অবিনাশবাবু কাহিনির সমস্তটা শ্রবণ করলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনে মৃদু স্বরে বললেন, 'এ-রকম আশ্চর্য কাহিনি আর কখনও আমি শুনিনি। বিনয়বাবু, আপনি যা বললেন তা শ্রবণ করে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে।'

—'কী-কী প্রশ্ন?'

—'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই ভাঙা বাগানবাড়িটা রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ কি এরই মধ্যে কিনে নিয়েছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাজা কি বাড়িখানা কেনবার জন্যে নিজেই কলকাতায় এসেছিলেন?'

—'না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।'

—'রাজা কলকাতায় এসেছেন বলে আপনারা কি কোনও খবর পেয়েছেন?'

—'না।'

—'ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িতে এখন কোনও লোক বাস করে কি?'

—'একদিন আমি বাড়িখানা দেখতে গিয়েছিলুম। বাড়ির দরজায় তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু বাগানের কোণে যেখানে মালিদের ঘর আছে সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে একদল বেদে জাতের লোক। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম, রাজা এখনও কলকাতায় আসেননি। কিন্তু রাজা না এলেও ওই বেদেগুলো যে রাজারই আশ্রিত লোক, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। রাজার বিশালগড়েও আমি অনেক বেদে দেখেছি।'

—'কলকাতায় এই যে রক্তহীনতার জন্যে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে রাজার কোনও হাত আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহ করি না বললে সত্য বলা হয় না।'

—'রাজা যদি কলকাতায় না থাকেন, তাহলে ওই মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনি দায়ী হবেন কেন?'

—'আমার বিশ্বাস, রাজা কলকাতাতেই আছেন। বেদেরা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে।'

—'আপনার এ-রকম বিশ্বাসের কারণ বুঝলুম না।'

—'একটা কারণের কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'কথাটা এতই আজগুবি, শুনলে হয়তো আমাকে আপনি পাগল বলে মনে করবেন।'

অবিনাশবাবু একটুখানি হেসে বললেন, 'আজ যে কাহিনি আমাকে বললেন, তা শুনেও যখন আপনাকে পাগল বলে মনে করিনি, তখন আরও কিছু অদ্ভুত কথা শুনলে আপনার সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণা একটুও বদলাবে না। বিনয়বাবু, আমি প্রেততত্ত্ববিদ। অনেকের মতে প্রেততত্ত্বটাই হচ্ছে একটা আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু আমি ভূত যখন মানি, আমার কাছে অলৌকিক বা আজগুবি বলে কোনও কিছু নেই। আপনি যা বলতে চান, অসঙ্কোচে বলুন।'

বিনয় বললে, 'আমার বাড়ির বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা বড়ো কাঁঠাল গাছ আছে। আমার দোতালার শোবার ঘর থেকে কাঁঠাল গাছটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেই গাছটার একটা ডালে আজকাল মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত বাদুড় এসে বসতে শুরু করেছে।'

—'অদ্ভুত বাদুড়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাধারণত বাদুড়দের স্বভাব, দুখানা পা দিয়ে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকা। কিন্তু এ-বাদুড়টা ঠিক পাখির মতোই ডালের উপরে বসে থাকে। কাজেই তাকে অদ্ভুত ছাড়া আর কী বলব বলুন?'

—'আজ কদিন থেকে বাদুড়টাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

—'প্রায় মাসখানেক ধরে। কিন্তু সে রোজ আসে না। একমাসের মধ্যে তিনদিন সে দেখা দিয়েছে, আর সেই তিনদিনই ছিল শনিবার। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, সে দেখা দেয় ঠিক তখনই। আকারেও সে সাধারণ বাদুড়ের চেয়ে অনেক বড়ো—এত বড়ো বাদুড় আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'

—'এই বাদুড়ের সঙ্গে রাজার কলকাতায় আগমনের সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু তবু আগে আমার সব কথা শুনুন। কাঁঠাল গাছের ডালে বসে বাদুড়টা এক দৃষ্টিতে কেবল আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। বললে হয়তো আপনি

বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তার চোখদুটোও ঠিক বাদুড়ের মতো নয়। দেখে আমার মনে হয়েছে, যেন ঠিক দুটো মানুষের চোখ উগ্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। আর সেই চোখদুটোও দেখতে যেন অবিকল রাজার চোখের মতো। রাজার চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ—এ কথাটা হাস্যকর নয়?'

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'না বিনয়বাবু, মোটেই হাস্যকর নয়! কী বললেন? মানুষের চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ? আর সেই চোখদুটো কেবল তাকিয়ে থাকে আপনার দিকেই?'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু। একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেই সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, কে যেন আমাকে বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে প্রাণপণে আকর্ষণ করছে! কে যে আকর্ষণ করছে তা বুঝতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে তার আকর্ষণকে রীতিমতো অনুভব করি। তখন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে সরে যাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে, তখনও বাদুড়টা সেখানে থাকে কি না আর বোঝা যায় না।'

অবিনাশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সাবধান বিনয়বাবু! হয়তো আপনাকে কেউ সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। আপনার পক্ষে রাত্রে একলা রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয়।'

বিনয় বললে, 'আর একটা আশ্চর্য কথা শুনুন। গেল শনিবারে, রাত যখন তিনটে বেজে গেছে, হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে শুনলুম বাড়ির বাহির থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আশু বলে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। কিন্তু অবিনাশবাবু, বিশালগড় থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই রাত্রে যা-কিছু দেখি আর শুনি তাইতেই আমার মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। ডাকের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। গুরুজনরাও ছেলেবেলায় সাবধান করে দিতেন, রাত্রের কারুর ডাকে সাড়া দিতে নেই—অন্তত তিনবার ডাকবার আগে। হঠাৎ সেই কথাটাই আমার মনে হল। আমি সাড়া দিলুম না। কিন্তু কে ডাকছে, তা দেখবার জন্যে টর্চটা হাতে করে জানলার কাছে গেলুম। নীচে টর্চের আলো ফেলে কারুকেই দেখতে পেলুম না। কেবল শুনতে পেলুম, কাঁঠাল গাছের একটা ডাল সশব্দে নড়ে উঠল। তারপরেই দুখানা বড়ো বড়ো পাখনার ঝটপট শব্দ। শূন্যে আলো ফেলে দেখি, মস্তবড়ো একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরদিন ভোরবেলাতেই আশুর বাড়িতে ছুটলুম। সেখানে শুনলুম যে কাল রাত্রে আমাকে ডাকতে আসবে কী, জ্বরের আক্রমণে আজ তিন দিন ধরে সে শয্যাগত হয়ে আছে। এ-সব কী ব্যাপার অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশালগড়ে যাবার সময় সরাইখানার সেই বুড়ি আপনাকে যে কবচখানা দিয়েছিলেন, সেখানা এখনও আপনার গলায় ঝোলানো আছে তো?'

—'আজ্ঞে না, কলকাতায় এসে সেখানা গলা থেকে খুলে রেখেছি।'

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, 'সর্বনাশ, করেছেন কী! জানেন, সেই কবচের গুণেই বিশালগড় থেকে আপনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন? বিশালগড়ের রাজা সত্য-সত্যই যদি পিশাচ হয় তাহলে তার ভৌতিক দৃষ্টি এখনও আপনার উপরে নিবদ্ধ আছে। সে যখন স্বহস্তে আপনাকে স্পর্শ করেছে, তখন কলকাতায় এলেও আপনি খুব সহজেই আবার তার

প্রভাবে গিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ওই রক্ষাকবচখানি আপনার গলায় থাকলে সে আর কিছুতেই আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সেই কবচ ধারণ করা। তারপর আর এক কথা। আজও তো শনিবার। আপনার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কাঁঠাল গাছে আজও আবার বাদুড়ের আবির্ভাবের সম্ভাবনা। আমি আজ সন্ধ্যার আগে আপনার বাড়িতে যেতে চাই! আপনার আপত্তি নেই তো?'

বিনয় খুশি হয়ে বললে, 'বিলক্ষণ! আপত্তি কী মশাই, এটা তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয়!'

দুই
বাগানবাড়ির ঝোপ

সেইদিন সন্ধ্যার আগে।

বিনয়ের শয়নগৃহ। অবিনাশবাবু ও বিনয়।

সূর্য অস্তগত। ধীরে ধীরে ময়লা হয়ে আসছে দিনের আলো। আর মিনিট-কয়েক পরেই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এখনই দৃষ্টির সামনে ভাসছে কেমন একটা ছায়া-ছায়া ভাব।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিনয় একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ওই দেখুন অবিনাশবাবু, ওই দেখুন!'

সাগ্রহে দৃষ্টিচালনা করে অবিনাশবাবু দেখলেন, খানিক দূর থেকে উড়ে আসছে মস্ত বড়ো একটা কালো বাদুড়।

বাদুড়টা সোজা এসে কাঁঠাল গাছের একটা বড়ো ডালের উপরে চুপ করে বসে পড়ল।

বিনয় বললে, 'দেখুন আমার কথা সত্য কি না। আর এও দেখছেন তো, বাদুড়টা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার ঘরের দিকেই? ওর চোখদুটোও লক্ষ করুন।'

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'সবই দেখছি, সবই লক্ষ করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন, ওর চোখদুটো মোটেই বাদুড়ের মতো নয়। বাদুড়ের চক্ষু-কোটরের ভিতর দিয়ে মানুষেরও দৃষ্টি ফুটে ওঠেনি—এ হচ্ছে কোনও অভিশপ্ত অমানুষের দৃষ্টি! ও-দৃষ্টি যার উপরে পড়বে তার সর্বনাশ না হয়ে যায় না!'

বিনয় কাতর কণ্ঠে বললে, 'তাহলে এখন আমি কী করব?'

—'আজকেও কি কোনও আকর্ষণ আপনাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে?'

—'না অবিনাশবাবু। আজ আমি সে-সব কিছুই অনুভব করছি না।'

—'সেই কবচখানা ধারণ করেছেন তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'জানবেন, ওই কবচ আপনার গলায় থাকলে কোনও দুষ্ট আত্মাই আর আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। আর একটা বিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

—'কী বিষয়ে?'

—'আমি দেখতে চাই, ওই বাদুড়টার ভিতরে সত্য-সত্যই কোনও অপার্থিবতা আছে কি না।'

—'কেমন করে দেখবেন?'

—'আপনার ওই কবচখানা বাহিরে বার করুন। তারপর ও-খানা হাতে করে তুলে ধরে একেবারে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। সত্যই যদি ওই কবচের কোনও গুণ থাকে, তাহলে এখনই তার স্পষ্ট প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

অবিনাশবাবুর কথামতো বিনয় কবচখানা বার করে জানলার ধারে গিয়ে সামনের দিকে তুলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেন কোনও অদৃশ্য হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বাদুড়টা কাঁঠাল গাছের ডালের উপর থেকে নীচের দিকে ঠিকরে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গিয়ে পড়বার আগেই সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে তিরবেগে আকাশের দিকে উঠে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

অবিনাশবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আর আমার কোনওই সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সাধারণ বাদুড় নয়। আপনার কবচের শক্তি দেখলেন তো?'

বিনয় অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আপনার কথাই সত্য অবিনাশবাবু, কবচ খুলে ফেলে বিপদকে আমি যেচেই ডেকে আনতে চেয়েছিলুম। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন কাজ করব না!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা এখন থাক, আপাতত আমরা কী করব, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক। আপনার ধারণা, পিশাচ রাজা আবার কলকাতায় এসেছে?'

—'আমার তো তাই ধারণা। ওই বাদুড়টা দেখে আপনারও মনে কি ওই-রকম সন্দেহ জাগছে না?'

—'খালি সন্দেহ নিয়ে কোনও কাজই হবে না, আমি চাই স্পষ্ট প্রমাণ।'

—'কী রকম প্রমাণ?'

—'শুনুন। পিশাচ বা ভ্যাম্পায়ারের একটা বিশেষ স্বভাব আছে। দিনে তারা কোনও গোরস্থানের কবরে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ঠিক মৃতদেহের মতোই পড়ে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হয় তাদের জাগরণ। তখন তারা জ্যান্ত মানুষের মতন লোকালয়ে গিয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সারা রাতটাই তাদের কেটে যায় এইভাবে। তারপর পূর্ব-আকাশে দিনের আলো ফোটবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই তারা আবার স্বস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা কলকাতায় এসেছে কি না, আর সে সত্য-সত্যই পিশাচ কি না, এটা আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'আপনি তো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িটা চেনেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আপনি সেখানে যেতে পারবেন?'

বিনয় শিউরে উঠে বললে, 'রাত্রে! সেই পোড়ো বাড়িতে!'

—'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ভয় পাবার কিছুই নেই। স্মরণ রাখবেন, আপনার সঙ্গে আছে অব্যর্থ রক্ষাকবচ। ওই পোড়ো বাড়িটা হানাবাড়ি হলেও কবচের গুণে আপনার কোনও ভয় নেই। আর আমারও কোনও ভয় নেই,—কারণ, আমার সহায় মন্ত্রশক্তি। আমাদের মতন যারা প্রেততত্ত্ব

নিয়ে কারবার করে, দুষ্ট আত্মাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্বদাই তাদের মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাহলে কী বলেন, আজ এই বাগানবাড়িতে গিয়ে রাত জাগতে রাজি আছেন?'

বিনয়ের মুখ দেখে মনে হল না যে সে বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে। নাচারের মতন বললে, 'আপনি যখন বলছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনার কোনও ভাবনা নেই। আমরা সেই বাগানবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করব। আপনার মুখে শুনেছি, বাড়ির চারিদিকেই অনেকখানি জমি আছে। সুতরাং এটুকু অনুমান করতে পারি যে, সেই পোড়ো বাগানে ফুল আর ফলগাছ না থাক, ঝোপ-ঝাপ আগাছা আছে যথেষ্টই। তাই নয় কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই জমির উপরে আছে দস্তুরমতো একটি জঙ্গল। ঝোপঝাপ খুঁজে নিতে একটুও দেরি লাগবে না।'

—'ব্যস্, তাহলেই চলবে। পোড়ো জঙ্গলেই আজ আমরা রাত্রিবাস করব। মন্দ কী? এও একটা নূতনত্ব!'

রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে প্রভাত-তীর্থে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে। কিন্তু প্রভাত আসন্ন হলেও এখনও ভোরের পাখিদের ঘুম ভাঙেনি এবং উষার শুভ্র ছোঁয়ায় এখনও হয়নি বিষণ্ণ অন্ধকারের মৃত্যু।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ভাঙা বাড়ির পোড়ো বাগানের যেখানে আগে ছিল মস্তবড়ো ফটকটা, এখন তার কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নেই। কিন্তু সেখান দিয়ে একটা পথ ভিতর দিকে অগ্রসর হয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সেই পথের ধারেই ছিল এমন একটা প্রকাণ্ড ঝোপ যে, তার ভিতরে একটা হস্তীরও স্থানসঙ্কুলান হতে পারে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয় আশ্রয় নিয়েছে সেই ঝোপটার মধ্যেই। বাহির থেকে কোনও দৃষ্টিই তাদের আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু ভিতর থেকে ঝোপের ফাঁক দিয়ে পথের উপরটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে তারা।

সারারাত শুকনো পাতা নড়লেই সাপের ভয়ে চমকে চমকে উঠে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে হৃষ্টপুষ্ট মশকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনয়ের দেহ মন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে। অবিনাশবাবু কিন্তু এমন স্থিরভাবে বসে আছেন যে দেখলে মনে হয় না তিনি একটামাত্র মশারও কামড় খেয়েছেন।

খুব দূরে কোথা থেকে একটা বড়ো ঘড়ি ঢং-ঢং করে পাঁচ বার বেজে উঠল।

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বিনয়ের গায়ে ঠেলা মেরে বললেন, 'হুঁশিয়ার!'

বিনয় আঁতকে উঠে বললে, 'কী হয়েছে অবিনাশবাবু?'

—'হবে আর কী? এখানে সত্যিই যদি কোনও পিশাচ থাকে, তাহলে তার আসবার সময় হয়েছে। ওই দেখুন, রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে, পূর্ব দিকের আকাশও এখন অনেকটা ফরসা। পিশাচের চোখ কোনওদিন উষার আলো পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।'

—'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

—'কিছু করতে হবে না, চোখ দুটোকে সজাগ রেখে খালি চুপ করে বসে থাকতে হবে।'

ভোরের বাতাসের প্রথম ঝাপটা তাদের কপালের উপর বুলিয়ে দিয়ে গেল ভারী মিষ্টি একটি ঠান্ডা ছোঁয়া। কোনও গাছ থেকে ডেকে উঠল দুটো-একটা কাক।

—'অবিনাশবাবু!'

—'চুপ, ওইদিকে দেখুন!'

হালকা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সুদীর্ঘ মূর্তি বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে। মূর্তির দেহের কালো পোশাকটা অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখের শুভ্রতা। মস্ত একজোড়া পাকা গোঁফের দুই প্রান্ত হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, বিনয় তাও দেখতে পেলে। মুখখানাকে ভালো করে চিনতে পারলে না বটে, কিন্তু জাঁদরেলি গোঁফজোড়া চিনে ফেলতে তার একটুও কষ্ট হল না। এই গোঁফের একমাত্র মালিক রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

বাগানের ভিতরে ঢুকে মূর্তিটা ঝোপের ঠিক পাশের পথে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কী সন্দেহ হল জানি না, কিন্তু সে যখন ফিরে ফিরে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করছিল, তখন তার দুই চক্ষে জ্বলে জ্বলে উঠছিল যেন তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অমানুষিক কণ্ঠে মূর্তিটা করে উঠল ভয়াবহ অট্টহাস্য। বিনয় সভয়ে অবিনাশবাবুর একখানা হাত দুই হাতে চেপে ধরলে এবং অবিনাশবাবুও খানিকটা স্তম্ভিতের মতন হয়ে গেলেন। এমন অট্টহাসি মানুষের কর্ণ বোধহয় কোনওদিনই শ্রবণ করেনি।

তেমনি হা হা হা হা হা হা হাসতে হাসতে মূর্তিটা দ্রুতপদে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল। তারপর শোনা গেল দরজা খোলার ও দুম করে বন্ধ হবার শব্দ।

বিনয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'অবিনাশবাবু! ও অমন করে হাসলে কেন?'

—'হয়তো আমাদের অস্তিত্ব জানতে পেরেছে।'

—'কিন্তু তবু ও তো আমাদের আক্রমণ করলে না?'

—'ভোরের পাখি ডেকে উঠেছে। ওর আর কোনও শক্তিই নেই।'

তিন

আবার নতুন খবর

পরদিনের বেলা সাড়ে দশটা।

বিনয় হন্তদন্তের মতো অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

গতকল্যকার নিশা-জাগরণের পর আজ অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু বেলায়। প্রথম চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিনয়কে দেখে বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী! আপনার মুখের ভাব তো সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না?'

বিনয় একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আপনার কথার উত্তর না দিয়ে আমি এই খবরের কাগজখানা পাঠ করতে চাই।'

—'আবার খবরের কাগজ! কাল কি আবার নতুন কোনও মানুষ রক্তশূন্যতা রোগে মারা পড়েছে?'

—'শুনুন।' এই বলে বিনয় খবরের কাগজখানা পাঠ করতে লাগল

'কলিকাতায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়!

অনেকেই এতদিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন, কাল রাত্রে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ইয়াঙ্কি মুল্লুকের ভ্যাম্পায়ার বাদুড় দেখা দিয়াছে ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায়।

পুলিনবিহারী বসু শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করেন। তিনি একজন কারবারি লোক। গতকল্য সন্ধ্যার পর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নিজের শয়নগৃহে গমন করেন। তাহার পর যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না, নিজের কোনও আত্মীয়ের বাড়ি বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। পুলিনবাবু সেদিন শয়নগৃহের দরজা কেবল ভেজাইয়া রাখিয়াছিলেন, স্ত্রী আসিলে দরজার অর্গল খুলিবার জন্য পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়েই ভিতর হইতে তিনি দরজা বন্ধ করেন নাই।

তাঁহার স্ত্রী দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের আলো জ্বালাই ছিল, এবং সেই আলোতে তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন ভয়াল এক দৃশ্য।

প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণবর্ণের কী জীব তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর দেহের উপরার্ধ প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া শয্যার উপরে স্থির হইয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়াই তিনি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবটা তাঁহার স্বামীর দেহের উপর হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডানার ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে জীবটা বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুলিনবাবুর স্ত্রী বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, তখনও তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই এবং তাঁহার কণ্ঠদেশের উপর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তের ধারা। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর নিদ্রা ভাঙিতে না পারিয়া পুলিনবাবুর স্ত্রী ডাক্তারের বাড়িতে খবর পাঠান।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষার পরে বলেন, পুলিনবাবু জীবিত আছেন বটে এবং তাঁহার প্রাণেরও কোনও আশঙ্কা নাই, তবে রক্তশূন্যতার জন্য অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছেন।

যদিও এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই, তবু যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি, ইহার আগে কলিকাতায় গত এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের যে রহস্যময় মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ওই সাতজন লোকও মারা পড়িয়াছে রক্তশূন্যতার জন্য। পুলিনবাবুও যে ঠিক এই কারণেই মৃত্যুমুখে পড়িতেন সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। তাঁহার স্ত্রীর আকস্মিক আগমনের জন্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।

পূর্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি, রক্তশূন্যতার জন্য এতগুলি লোকের মৃত্যু দেখিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইসকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। যে-কোনও উপায়েই হউক, এক বা একাধিক ওই জাতীয় জীব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেরই মত সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। কারণ, পুলিনবাবুর স্ত্রী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর দেহের উপরে একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। এবং এই বাদুড়টাই যে পুলিনবাবুর রক্ত শোষণ করিতেছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদিন পরে উত্তর-কলিকাতার এই বিচিত্র রহস্যের একটা সমাধান হইল। কিন্তু এখন একটা বড়ো প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোন উপায়ে ওই ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কবল হইতে শহরবাসীরা উদ্ধার লাভ করিবে? কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতেছি।'

সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু আগে নীরবে খালি করলেন চায়ের পেয়ালাটা। তারপরে বললেন, 'কাগজওয়ালাদের বিশ্বাস, এতদিন পরে সব রহস্যের সমাধান হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ও দেখা গিয়েছে, আর সাতজন লোকের মৃত্যুর কারণও জানতে নাকি কারুর বাকি নেই। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা মানুষ, আসল রহস্যের কতটুকু খবরই বা আমরা রাখতে পারি? ভ্যাম্পায়ার বাদুড়! রাবিশ! আসল কথা জানতে পারলে শহরবাসীদের নাড়ি একেবারে ছেড়ে যাবে!'

বিনয় কাতর মুখে বললে, 'অবিনাশবাবু, কলকাতাবাসীদের মাথার উপরে কী ভীষণ বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, এটা তো এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনি কি চেষ্টা করলে এই বিপদ দূর করতে পারেন না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'পারি বিনয়বাবু, পারি। চেষ্টা করলে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরেই আমি ওই পিশাচ রাজার সব লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিতে পারি।'

—'তবে সেই চেষ্টাই করুন অবিনাশবাবু, সেই চেষ্টাই করুন!'

অবিনাশবাবু ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করুন। পুলিশের কাছ থেকে আমরা কোনওই সাহায্য পাব না, কারণ পুলিশ কোনওদিনই ভূত-প্রেত, পিশাচ, দৈত্য বা দানব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হবে না। আমাদের মুখে সব কথা শুনলে তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাইবে পাগলা গারদে। সুতরাং পুলিশের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে আমাদের দুজনকে কাজ করতে হবে খুব গোপনে আর স্বাধীনভাবে।'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু, আপনার এ অনুমান মিথ্যা নয়।'

—'বিনয়বাবু, কাল রাতে আপনি ছিলেন বিনিদ্র। আজকেও কি সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারবেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সূর্যোদয়ের পরেই পিশাচ রাজা ওই বাড়ির ভিতরে কোনও এক জায়গায় নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে, সন্ধ্যার আগে তার দেহে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দিনের বেলায় তার অবস্থা হয় একান্ত অসহায়ের মতন; আক্রান্ত হলেও সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। পিশাচকে বধ করবার উপায় আমার অজানা নেই। দিনের বেলায় একবার তাকে হাতে পেলেই তার কবল থেকে তখনই পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারি।'

—'এ জন্যে রাত জাগবার দরকার কী, অবিনাশবাবু? কাল সকালেই তো সূর্যোদয়ের পরে আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারি?'

—'বিনয়বাবু, আপনি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন। বাগানবাড়ির মালিদের ঘরে একদল বেদেকে কি আপনি স্বচক্ষে দেখেননি? ওরা কেন যে ওখানে আছে, তাও কি বুঝতে পারছেন না? ওরা হচ্ছে রাজার মাহিনা-করা অনুচর; বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যেই রাজা ওদের নিযুক্ত করেছে। রাজা নিজেও জানে, দিনের বেলায় সে হয় অত্যন্ত অসহায়। তাই সেই সময় বাড়ির চারিদিকেই থাকে বেদেদের কড়া পাহারা। আমরা কেমন করে তাদের চোখে ধুলো দেব? অতএব

দিনের কথা ভুলে গিয়ে ওই বাগানবাড়িতে যেতে হবে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে। বাড়িখানা আমিও দেখেছি। প্রকাণ্ড বাড়ি। চোরের মতন বাড়ির ভিতর ঢুকে, আনাচে-কানাচে বা কোনও একখানা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে বসে আমরা দুজনে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করব। তারপর পিশাচ যখন হবে জড় পদার্থের মতো, তখন আমরা তার দেহটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করব।'

—'কিন্তু যে সময় আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকব, রাজা যদি তখন সেইখানে উপস্থিত থাকে?'

—'রাত্রে সেখানে রাজার উপস্থিতির সম্ভাবনা খুবই অল্প। সাধারণত পিশাচরা সূর্যাস্ত হলেই শিকারের সন্ধানে যাত্রা করে। আমাদের বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তির গুণে রাজা বাদুড়ের আকার ধারণ করতে পারে। যে কালো বাদুড়টা আপনাকে জ্বালাতন করতে যেত, সেটা যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই সেই কাঁঠাল ডালে গিয়ে বসত, এরই মধ্যে এ কথা কি আপনি ভুলে গিয়েছেন?'

বিনয় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'না, ভুলিনি অবিনাশবাবু। আপনার মতোই অভ্রান্ত বলে বোধ হচ্ছে। যদিও সেই প্রেতপুরীর মধ্যে রাত্রি যাপন করবার কথা মনে করেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, তবুও মানুষের এই মহাশত্রুকে বধ করবার জন্যে সমস্ত বিপদকেই আমি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি।—তাহলে এই কথাই রইল অবিনাশবাবু। কখন আমরা ওই বাগানবাড়ির দিকে যাত্রা করব?'

—'রাত বারোটার পর।'

চার

যম থাকে যমালয়ে

রাত যখন একটা, প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা উপস্থিত হল সেই বাগানবাড়িখানার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে দীপ্ত জোনাকিদের দেখাচ্ছে অশরীরীদের ভুতুড়ে আলোফুলের মালার মতো। ঝিল্লিদের ঝঙ্কারও শোনাচ্ছে কেমন যেন অস্বাভাবিক, ইহলোকের কানে কানে যেন শোনাতে চায় পরলোকের কর্কশ সঙ্গীত। বাতাসে বাতাসে গাছে গাছে জাগছে যে পত্রমর্মর, তাও যেন অভিশপ্ত আত্মাদের করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। রাত্রে পৃথিবীর উপর অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলে সৃষ্টির প্রভাত থেকে মানুষের মনের ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে এক অবর্ণনীয় অপার্থিব ভাব। তখন সহজ বস্তুকেও আর সহজ বলে মনে হয় না, অন্ধদৃষ্টি আর কিছুই দেখতে না পেলেও কল্পনায় চারিদিকেই দেখে বা দেখছে বলে সন্দেহ করে রহস্যময় আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনি এমন বোবার মতন চুপ করে আছেন কেন? আপনার ভয় হচ্ছে নাকি?'

বিনয় বললে, 'ভয় যে হচ্ছে না, কেমন করে বলি? এখন আমি চারিদিকেই দেখছি সেই ভয়ানক রাজার মূর্তি! প্রত্যেক ঝোপঝাপ নড়ে নড়ে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে, রাজা বুঝি টের পেয়েছে

আমাদের অস্তিত্ব। আমরা হচ্ছি আলোর ভক্ত, আর রাজা হচ্ছে অন্ধকারের জীব। এই নিশাচর যে আমাদের অনুসরণ করছে না, কিছুতেই আমি মনে করতে পারছি না এই কথাটা।'

—'কিন্তু আপনাকে তো আমি বারবার বলছি যে ওই কবচ সঙ্গে থাকতে আপনার কোনওই আশঙ্কা নেই?'

—'জানি অবিনাশবাবু, জানি। দুর্বল মন তবু সহজে প্রবোধ মানতে চায় না।'

বিনয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার হাত ধরে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আগেও তো আপনি এই বাড়িখানা দেখেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ বাড়ির ভিতর-বাহির, সবই আমার দেখা।'

—'খুব সম্ভব বাড়ির সদর দরজাটা বাহির থেকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। এই বাড়িতে ঢোকবার আর কোনও উপায় আপনি জানেন?'

—'বাড়ির পিছনে দেখেছিলুম পাল্লাহীন একটা খিড়কির দরজা। সেখান দিয়ে অনায়াসেই ভিতরে প্রবেশ করা যায়।'

—'বেশ, তাহলে ওই পথই আমরা অবলম্বন করব। বেদেদের কোনওই সাড়া নেই। আর এত রাত্রে তাদের সাড়া থাকবার কথাও নয়। তারা জানে, তাদের রাজা বেরিয়েছে এখন নৈশ বিহারে, অতএব বাড়ির উপরে আর পাহারা দেবার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তারা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। আসুন বিনয়বাবু।'

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বার-কয়েক হোঁচট খেয়ে তারা উপস্থিত হল বাড়িখানার পিছন দিকে।

অন্ধকার যেখানে ঘন নয় এমন একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, 'ওইখানে আছে একটা পানায় সবুজ মস্ত বড়ো পুরোনো পুকুর। আর এইদিকে আছে খিড়কির সেই ভাঙা দরজাটা।'

দ্বারপথ আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ভিতরে ঢুকে অবিনাশবাবু বললেন, 'আর কোনও অযাচিত লোককে ভয় করবার কারণ নেই। এইবারে আমরা টর্চ জ্বেলে একটা গা-ঢাকা দেবার মতো জায়গা খুঁজে বার করতে পারি।'

টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে দুজনে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে প্রায় ধ্বংসস্তূপের মতো জীর্ণ বাড়ির আগাছাভরা উঠোন, দালানের ভেঙে-পড়া খিলানের পর খিলান, ধসে-পড়া সোপান ও হেলে-পড়া দেওয়ালের উপর ঝুলে-পড়া কড়ি ও বরগা। এক জায়গা থেকে তাদের পদশব্দ শুনে দুটো শেয়াল বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। একাধিক সর্পেরও সন্ধান পাওয়া গেল। একটি ঘরের ভিতর কী রকম ঝটপট ঝটপট শব্দ। উপর দিকে আলো ফেলে শুকনো গলায় বিনয় বলে উঠল, 'বাদুড়!'

সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আসছিল, কিন্তু অবিনাশবাবু তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'ও-রকম ছোটো বাদুড় দেখে আপনি আঁতকে উঠলেন কেন? ওটা তো সাধারণ বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আর একটা ঘরে ঢুকেই তারা শুনতে পেলে বিকট কণ্ঠের কয়েকটা অদ্ভুত চিৎকার। বিনয়ের সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল এবং যেন খাড়া হয়ে উঠল তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত।

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'ও তক্ষক, কোনও ভয় নেই।'

তারপর তারা প্রবেশ করলে খুব বড়ো একটা ঘরের ভিতরে। সে ঘরখানার অবস্থা অন্যান্য ঘরের মতন শোচনীয় ছিল না, যদিও তার মেঝের উপরে জমে আছে বহুকালের সঞ্চিত ধুলো এবং তার দেওয়ালের গা থেকেও খসে পড়েছে চুন-বালির প্রলেপ, তবু চেষ্টা করলে সে ঘরখানাকে এখনও মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া যায়।

সেই ঘরেরই এক কোণে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক।

সেটা দেখেই চমকিত চক্ষে বিনয় বলে উঠল, 'ওই সিন্দুকটাকেই আমি দেখেছি বিশালগড়ে! দিনের বেলায় রাজা মড়ার মতন শুয়ে থাকে ওরই ভিতরে!'

অবিনাশবাবু এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ভারী ডালাটা খুলে ফেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সিন্দুকের ভিতরে দেখছি বিছানার বদলে রয়েছে রাশীকৃত স্যাঁতসেঁতে মাটি। হ্যাঁ, পিশাচেরই উপযুক্ত শয্যা বটে! দিনের বেলায় পিশাচ শুয়ে থাকতে চায় কবরের ভিজে মাটির বিছানায়। এখানে পিশাচ কবরের বদলে ব্যবহার করেছে একটা সিন্দুককেই, কিন্তু নিজের স্বভাব ভুলতে না পেরে নগ্ন মাটির উপরেই শয্যা রচনা না করে পারেনি।'

বিনয় নিজের হাতের ঘড়ি দেখে বললে, 'রাত তিনটে বেজেছে। রাজার আসতে এখনও অনেক দেরি।'

কিন্তু তার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই প্রকাণ্ড ঘরটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল পৈশাচিক অট্টহাসির তরঙ্গে।

দুজনেই বিদ্যুতের মতো ফিরে দেখে, কখন নিঃশব্দপদে রাজা এসে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই ঘরের মাঝখানে।

রাজা হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে বজ্রের মতন কঠিন স্বরে চিৎকার করে বললে, 'ক্ষুদ্র মানুষ! তোরা যে আজ এইখানে আসবি, কালকেই আমি তা অনুমান করেছিলুম। তোরা হচ্ছিস নশ্বর, দুনিয়ায় এসেছিস দুদিনের পরমায়ু নিয়ে! কতটুকু তোদের বুদ্ধি? আমি হচ্ছি অমর, আজ তিন শতাব্দী ধরে এই পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে আমি বিচরণ করছি দিগ্বিদিকে—আমার মনের মধ্যে আছে তিন শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা! এত বড়ো দুঃসাহস তোদের, আমার সঙ্গে করতে চাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা? তোদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ লুপ্ত করে দেব আমি এই মুহূর্তেই!' দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে দুটো দপদপে শিখা জ্বালিয়ে রাজা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে—সামনে সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় বিনয়ের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো পাণ্ডুর। পায়ে পায়ে সে-ও পিছোতে লাগল, চমকে উঠতে উঠতে।

অবিনাশবাবু কিন্তু নিশ্চল। তাঁর নেই এতটুকু ভয়ের লক্ষণ। স্থির গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'নির্ভয় হোন বিনয়বাবু! আপনার অস্ত্রের কথা আবার ভুলে গেলেন? শিগগির বার করুন সেটা!'

বিনয় কাঁপতে কাঁপতে নিজের জামার তলা থেকে টেনে বার করে ফেললে গলায় ঝোলানো সেই কবচখানা।

বিকট আর্তনাদ করে রাজা তখনই ঘুরে মাটির উপরে পড়ে গেল বিদ্যুতাহতের মতো। তারপর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আবার উঠে ঝড়ের মতো বেগে ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়ের হাত ধরে টানতে টানতে অবিনাশবাবুও ছুটলেন ঘরের বাইরে।

উঠোনের উপর আবার দেখা গেল পলাতক রাজার ছুটন্ত মূর্তি।

অবিনাশবাবু দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ছুটে চলুন আমার সঙ্গে! পিশাচ এখন শক্তিহীন। আমাদেরই ভয়ে সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। ওই কবচ একবার যদি ওর গায়ে স্পর্শ করাতে পারি, তাহলে এখনই ও মূর্ছিত হয়ে আমাদের হস্তগত হবে। তারপর? তারপর যা করবার, আমিই করব।'

রাজার মূর্তি বৃদ্ধের মতো বটে, কিন্তু তার দেহে আছে যেন একাধিক যুবকের প্রবল শক্তি। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কখনও রাশীকৃত ইষ্টকস্তূপের উপর লাফ মেরে এবং কখনও বা মাটির উপর দিয়ে দ্রুতগামী হরিণের মতো ছুটতে ছুটতে ক্রমেই সে দূরে চলে যেতে লাগল। খিড়কির ভাঙা দরজা দিয়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয়ও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলে, সেই পানায়-ভরা পুকুরের জলের ভিতরে কে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর শোনা গেল সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ছপ্‌ছপ শব্দ তুলে কে ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবুও পুকুরের ডান পাড়ের উপর দিয়ে দৌড়ে ওদিকে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ পায়ে গাছের শুকনো শিকড়ের মতো কী-একটা জিনিসের বাধা পেয়ে মাটির উপরে সটান পড়ে গেলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে আবার বসিয়ে দিলে। তখন জলের উপরে সাঁতারের শব্দ থেমে গিয়েছে, এবং পরমুহূর্তেই জেগে উঠল আর একটা নূতন শব্দ।

শূন্যে বাদুড়ের ডানার ঝটপটানির শব্দ।

ক্রুদ্ধ মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'রাজা আবার আমাদের নাগালের বাইরে। ওই দেখুন।'

একটা অসম্ভব প্রকাণ্ড কালো বাদুড় দুইদিকে দুখানা ডানা বিস্তৃত করে আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে উপরে—আরও উপরে।

পরদিনের গভীর রাত্রি।

অবিনাশবাবু ও বিনয় আবার সেই বাগানবাড়িতে।

কিন্তু সেই বড়ো ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল, মস্ত সিন্দুকটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

বিনয় মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'অবিনাশবাবু, পাখি কি উড়েছে?'

—'পাখি যে উড়েছে, সেটা তো কাল স্বচক্ষেই আমরা দেখেছি। আপনার কবচ তার সহ্য হবে না।'

—'বেদেরা?'

—'পাখির বাসা আছে সেই সিন্দুকে। বেদেরা নিশ্চয়ই বাসা নিয়ে ফিরে গেছে বিশালগড়েই।'

—'এখন উপায়?'

—'আমাদেরও যেতে হবে বিশালগড়ে!'

—'বলেন কী, আবার সেই মারাত্মক জায়গায়?'

—'যমকে খুঁজতে গেলে যমালয়েই যেতে হয়।'

পাঁচ

আবার বিনয়ের ডায়েরি

বিশালগড়ের বিপুল অরণ্যের প্রান্তে আবার সেই সরাইখানায়। এবং আমাকে দেখে সচকিত বিস্ময়ে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা করতে এলেন আবার সেই প্রাচীনা নারী।

বললেন, 'বাছা, সেবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও আবার আপনি এখানে এসেছেন?'

আমি সহাস্যে বললুম, 'মায়ীজি, আপনার দেওয়া রক্ষাকবচ যখন আমার গলায় ঝুলছে, তখন যমকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু এবারে আমি একলা আসিনি, আমার সঙ্গে এসেছেন বন্ধুটিও।'

প্রাচীনা অবিনাশবাবুর মুখের দিকে এবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এঁরও গলায় কোনও রক্ষাকবচ আছে কি?'

—'না মা, এঁর কোনও কবচের দরকার নেই। এঁর কারবারই হচ্ছে ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা করা।'

—'ও, উনি বুঝি রোজা?'

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার কথাই সত্য। এক হিসাবে আমি রোজাই বটে, তবে, আমি হচ্ছি অতি-আধুনিক রোজা।'

প্রাচীনা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বাবুজি, আপনাদের জন্যে আমার আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আপনাদের আবার এখানে আসবার কারণ কী?'

আমি বললুম, 'আমরা এসেছি রাজা রুদ্রপ্রতাপের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে।'

প্রাচীনা বিস্মিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'কিন্তু বাবুজি, রাজা তো বিশালগড়ে নেই!'

আমি বললুম, 'রাজা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বিশালগড় ছাড়া তাঁর যাবার আর কোনওই জায়গা নেই। আমাদের মতন তাঁরও আজকে এখানে আসার কথা।'

প্রাচীনা বললেন, 'কিন্তু এখনও তিনি এখানে আসেননি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, বিশালগড়ে যেতে আর সেখান থেকে বাইরে আসতে হলে পথ আছে একটি মাত্র। সে পথ এসে পড়েছে ঠিক এই সরাইখানার সামনেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, রাজা বিশালগড়ে ফিরে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেতুম।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি যখন রাজার সব খবর রাখেন, তখন এটুকুও নিশ্চয় জানেন যে ইচ্ছা করলে তিনি রূপান্তর গ্রহণ করতে পারেন?'

ভয়ে ভয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে প্রাচীনা চুপি-চুপি বললেন, 'এত জোর গলায় রাজার কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না! এখানে বনের গাছ-পাতা আর বাতাসেরও বোধহয় কান আছে, রাজার কথা তারা সব শুনতে পায়। রাজা যদি একবার জানতে পারেন যে তাঁর কথা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে এইভাবে আলাপ করছি, তাহলে আমার জীবনের মূল্য হবে না একটিও

কানাকড়ি। হ্যাঁ বাবুজি, আমি শুনেছি যে মাঝে-মাঝে বন থেকে এমন সব নেকড়ে বেরোয়, আর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় এমন এক মস্ত বাদুড়, যাদের আত্মার সঙ্গে নাকি রাজার আত্মার কোনওই তফাত নেই। অবশ্য, এটা সত্যি কি মিথ্যা কথা আমি তা জানি না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'কাল কলকাতায় প্রায় শেষ রাতে আমরা রাজাকেই দেখেছি বোধহয় বাদুড়রূপে। রাজা যদি শূন্য পথে বিশালগড়ে গিয়ে হাজির হন?'

প্রাচীনা একটু ভেবে বললেন, 'কাল প্রায় শেষ রাতে রাজা যদি সত্য-সত্যই বাদুড়-মূর্তি ধারণ করে থাকেন, তাহলে শূন্যে উড়েও তিনি ভোরের আগে এতটা পথ পার হতে পারবেন না।'

—'আপনি কী বলতে চান?'

—'লোকে বলে, সূর্যোদয় হলেই রাজা হন মড়ার মতো। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বিশালগড়ে আসতে হবে অন্য লোকের সাহায্যে পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে।'

—'রাজাকে সাহায্য করতে পারে, এমন সব লোকও আছে নাকি?'

—'আছে বইকি বাবুজি! কিন্তু তারা এ অঞ্চলের কোনও ভালো লোক নয়। তারা হচ্ছে বিদেশি বেদে। রাজার কথায় তারা ওঠে-বসে। কিন্তু রাজার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিশালগড় থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে আমি দেখেছি, তারা একটা ভারী সিন্দুক মাথায় করে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে ইস্টিশানের দিকে চলে গেল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত আর তাদের দেখা পাইনি।'

বিনয় বললে, 'সেই সিন্দুকের রহস্য আপনি জানেন?'

প্রাচীনা কেমন শিউরে উঠে বললেন, 'লোকে নানান আজগুবি কথা বলে, আমি ঠিক জানি না।'

—'বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাজার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক-সুদ্ধ সেই বেদেদেরও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কোথায় যেতে পারে, আপনি বলতে পারবেন কি?'

—'রাজার মতো ওই বেদেরাও হচ্ছে বিশালগড়ের জীব। সিন্দুক নিয়ে তারা সেখানে ছাড়া আর কোথাও যাবে বলে মনে হয় না।'

অবিনাশবাবু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সিন্দুক নিয়ে বেদেরা এখনও বিশালগড়ে ফিরে যায়নি?'

—'হ্যাঁ বাবুজি, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।'

—'জয় গুরু! বেদেরা তাহলে এখনই বা একটু পরেই সিন্দুক নিয়ে এই পথে ফিরে আসবে।'

আমি বললুম, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন?'

—'কেন? আরে, আপনি কি এও বুঝতে পারছেন না যে, বেদেরা এই সিন্দুক নিয়ে আমাদেরই মতো রেলপথে এইখানে আসবে? কলকাতা থেকে বিশালগড়ে আসবার ট্রেন আছে মাত্র একখানা। যদিও আমরা তাদের দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারা বহন করে আনছে একটা মস্ত ভারী সিন্দুক, তাই আমাদের আগে এখানে এসে হাজির হতে পারেনি। কিন্তু তারা এল বলে। চলুন বিনয়বাবু, তাদের আগেই আমরা বিশালগড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, এতদূর থেকে আসছেন, আপনারা কি দয়া করে এখানে একটু বিশ্রামও করবেন না?'

আমি বললুম, 'প্রণাম মায়ীজি, আজ আর আমাদের বিশ্রামের সময় নেই। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি, আবার এখানে এসে বিশ্রাম করব। চলুন অবিনাশবাবু।'

ছয়

গোলাপি, বেগুনি, নীল আলো

সন্ধ্যা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা নয় চন্দ্রহীন। চারিদিক ছন্দোময় হয়ে আছে জ্যোৎস্নার মৌন আলোক-সঙ্গীতে।

আবার সেই বিশালগড়ের অসমোচ্চ পথের উপরে। দুইদিকে তার গহন অরণ্য, নৃত্যশীলা তটিনী, ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ের পর পাহাড়। সেদিন ছিল অন্ধকারের বিভীষিকা, কিন্তু আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গীতিকবিতার ঐশ্বর্য।

এইসব দেখতে দেখতে অবিনাশবাবুকে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম আগে আগে। আজ আমি নির্ভয়, কারণ কবচের মহিমা আমাকে করে তুলেছে পরম সাহসী। রুদ্রপ্রতাপ আজ যদি একেবার আমার সামনে এসেও দাঁড়ায় তাহলেও আমি পশ্চাৎপদ হব না এক ইঞ্চিও।

প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে রাখলে যে অনেকখানি পথ পার হয়েও আমরা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করবার অবসর পেলুম না। আমাদের হয়ে তখন কথাবার্তা কইতে লাগল উচ্ছ্বসিত সুগন্ধ বাতাস, মর্মরিত তরুলতা, কলরবমুখরা নদী ও নাম-না-জানা সব গানের পাখি। এই শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী মোহিনী রাত্রি খানিকক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে দিলে সেই বিভীষণ রাজা রুদ্রপ্রতাপের স্মৃতিও।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন অবিনাশবাবু। বললেন, 'বিনয়বাবু, একটা বিষয় আমি অনুমান করতে পারছি।'

—'কী?'

—'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে ফিরবে কেমন করে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

খানিক দূরে একটা পাহাড়ের বুকে নির্ঝর ঝরে পড়ছিল তরল রৌপ্যধারার মতো। সেইদিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'আমি এখন কোনও কথাই অনুমান করবার চেষ্টা করছি না অবিনাশবাবু। আমি বাস করছি এখন অন্য জগতে।'

—'মানে?'

—'রাজা রুদ্রপ্রতাপ নয়, আমার ঘাড়ে চেপেছে এখন কোনও কবির প্রেতাত্মা।'

—'কী রকম?'

—'কবিরা যা নিয়ে কারবার করেন, আমি হয়েছি তারই কারবারি।'

—'অর্থাৎ?'

—'আমার উপরে দেখছি চাঁদকে, নীলিমার গায়ে দেখছি জ্যোৎস্নাকে, পাহাড়ের উপরে দেখছি

নির্ঝরিণী আর বনে বনে দেখছি কত রূপ, কত রস, কত ছন্দ! ভুলে গিয়েছি অবিনাশবাবু, আপনার ওই রুদ্রপ্রতাপকে একেবারে ভুলে গিয়েছি।'

অবিনাশবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ যে আমাদের ভোলেনি, সেটাও আপনি ভুলে গিয়েছেন নাকি?'

তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে বললুম, 'এবারে আমার স্বর্গ থেকে হল পতন। এমন সুন্দর জগতে সেই মূর্তিমান অন্ধকারের কথা কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন?'

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'স্মরণ না করিয়ে দিয়ে উপায় নেই। আমাদের হাতে সময় খুব অল্পই, যে-কোনও মুহূর্তে রুদ্রপ্রতাপকে আবার আমরা চোখের সামনে দেখতে পারি।'

—'বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে কী অনুমান করতে বলছিলে

—'রুদ্রপ্রতাপ কেমন করে বিশালগড়ে ফিরে আসছে, সেকথা বলতে পারেন?'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন বলে ও-সব বিষয় নিয়ে আমি মস্তক ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করিনি। আপনি কিছু অনুমান করেছেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে আসবে সেই সিন্দুকেরই ভিতরে, যা বহন করে আনছে একদল বেদে।'

—'তাই নাকি?'

—'সেইরকম তো সন্দেহ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তে কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রুদ্রপ্রতাপ আশ্রয় নিয়েছে সেই সিন্দুকের ভিতরে। দিনের বেলায় যে হয় মৃতবৎ, নিশ্চয়ই সে বাইরের পৃথিবীর চোখের সামনে থাকবে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখন আবার রাত্রি হয়েছে। রাজা যে এখনও সজীব হয়ে ওঠেনি, একথা কি জোর করে বলা যায়?'

—'তা যায় না। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এর মধ্যেই নিশ্চয় আবার আমরা রাজার দেখা পেতুম। আমার মনে হয়, যে-কারণেই হোক রাজা এখনও তার নিরাপদ বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস করেনি।'

আচম্বিতে খুব কাছে বনের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে জেগে উঠল আবার সেই অতিপরিচিত ও ভয়াবহ অট্টহাসির পর অট্টহাসির উচ্ছ্বাস।

আমার চোখের সুমুখে এক মুহূর্তে যেন দপ করে নিবে গেল আকাশ ও পৃথিবী-ভরা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য।

এক লাফে পিছিয়ে এসে ও প্রায়-আবদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু!'

ব্যাপারটার আকস্মিকতা এতই অভাবিত যে অবিনাশবাবু পর্যন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ও স্বর যে কার তা বুঝতে কিছুই বিলম্ব হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র লোকেরই কণ্ঠ থেকে ওরকম পৈশাচিক হাস্যধ্বনি জাগ্রত হতে পারে।

আমরা পরস্পরের হাত ধরে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু অট্টহাসি আর শোনা গেল না। অট্টহাসি থেমে গেলেও তার প্রতিধ্বনি তখনও শোনা যেতে লাগল দূরে দূরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে এবং উপত্যকায় উপত্যকায়। আলোর উপরে নেমে এল যে অদৃশ্য অন্ধকারের ঘেরাটোপ, তা চোখে দেখা না গেলেও যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব

করা যায়। কম্পিত স্বরে বললুম, 'অবিনাশবাবু, আপনার ধারণা সত্য নয়। রাজার দেহ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কেবল জ্যান্ত হয়নি, বোধহয় সে আমাদের অনুসরণও করছে।'

ত্রস্ত চোখে পিছন দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ সে দেখা দিতে সাহস করছে না।'

—'সাহস করছে না?'

—'না। আপনার কবচের কথা আবার ভুলে যাচ্ছেন নাকি?'

—'এমন অবস্থায় ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়! কিন্তু রাজা যদি সত্য-সত্যই ভয় করে, তবে অকারণে এমনভাবে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলে কেন?'

—'সেইটেই আমি বুঝতে পারছি না। তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন সে করেনি তখন তার মনের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে। তার শয়তানি বুদ্ধি এখন কোন পথ ধরবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার জন্যে এখন আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।'

—'এই বনে কী করে আমরা আরও সাবধান হব?'

—'অপেক্ষা করুন, এখনই দেখতে পাবেন।'

আমরা তখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম তার একদিকে পাহাড় আর বন এবং আর একদিকে জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে সুদূর-বিস্তৃত একটা প্রান্তর। অনেক দূরে প্রান্তরের মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ রৌপ্যরেখা থেকে-থেকে চকচক করে উঠছিল—বোধহয় কোনও নদী।

আমাকে নিয়ে অবিনাশবাবু পথ ছেড়ে নেমে প্রান্তরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বিড়বিড় করে কি এক দুর্বোধ মন্ত্র বলতে বলতে মাটির উপরে মণ্ডলাকারে টেনে দিতে লাগলেন একটা রেখা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও কী করছেন অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নিজের কার্য শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মন্ত্রঃপূত গণ্ডী টেনে দিলুম।'

—'কেন?'

—'রুদ্রপ্রতাপ যখন আবার জেগেছে, তখন এই গণ্ডীর ভিতরে বসেই আজকের রাতটা আমাদের পুইয়ে দিতে হবে। সাবধান, এই গণ্ডীর ভিতর থেকে কিছুতেই বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এর বাইরে গেলেই বিপদ। কিন্তু ভিতরে থাকলে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব—কেউই আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। রুদ্রপ্রতাপের সমস্ত শয়তানি বুদ্ধিই এই গণ্ডীর বাইরে একেবারে মাঠে মারা যাবে। আসুন বিনয়বাবু, মাঝখানে এসে বসুন। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুন। ইচ্ছা করেন তো রীতিমতো নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করলেও কোনও ক্ষতি হবে না।'

আমি বললুম, 'আমার নাক আজ রাতে ডাকবার চেষ্টা করবে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?'

—'তবে আপনার নীরব নাসিকা দিয়ে লক্ষ্মীছেলেটির মতো এইখানে বসে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন।'

—'তাও অসম্ভব। আমার ঘাড় থেকে কবির প্রেতাত্মা এখন নেমে গিয়েছে। রুদ্রপ্রতাপের সাঙ্ঘাতিক মূর্তি ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

—'উত্তম। গণ্ডীর ভিতরে বসে তাও দেখলে ক্ষতি নেই; কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, গণ্ডীর বাইরে একবারও পা বাড়াবেন না।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, মুখে কিছু বললুম না।

অবিনাশবাবু একটা মস্ত হাই তুলে বললেন, 'ঘুম আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, আমি জেগে থাকতে পারব না। গণ্ডীর ভিতরে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রেতলোকের পল্টন এলেও এ ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না। তাই আবার বলি বিনয়বাবু, আমার সঙ্গে আপনিও করুন নিদ্রাদেবীকে সাধনা।'

—'ক্ষমা করবেন অবিনাশবাবু, আমার চোখ থেকে সব ঘুম ছুটে গিয়েছে।'

অবিনাশবাবু নাচারভাবে দূর্বাকোমল মাটির উপরে দেহকে লম্বমান করে কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে বললেন, 'কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা কথা বলে রাখি বিনয়বাবু। সর্বদাই মনে রাখবেন, দুষ্ট আত্মা—অর্থাৎ পিশাচ করেছে আপনার দেহকে স্পর্শ। রাজা কে, আপনি তা জানেন। যতই রক্ষাকবচ ধারণ করুন, আপনাকে সে সহজেই ভোলাতে পারবে। পিশাচের ছলনা কোন দিক থেকে যে আপনাকে আকর্ষণ করবে, আপনি জেনেও তা বুঝতে পারবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু সর্বক্ষণই স্মরণ রাখবেন, আপনার পক্ষে গণ্ডীর ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর গণ্ডীর বাহিরটা হচ্ছে একান্ত বিপজ্জনক।' তিনি পাশ ফিরে শুলেন। মিনিটকয়েক যেতে না-যেতেই তাঁর নাসিকার মধ্যে জাগ্রত হল দস্তুরমতো হুঙ্কারধ্বনি। সেই কোলাহল শ্রবণ করে দুটো শৃগাল চরম বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে একটা ঝোপের ভিতর হতে একবারমাত্র মুখ বাড়িয়ে মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করতে বিলম্ব করলে না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম মাঠের উপরে দূরের চাকচিক্যময় রুপোলি নদী-রেখার দিকে। ধীরে ধীরে আবার মনের ভিতরে হতে লাগল অসাময়িক কবিত্বের সঞ্চার। সে কবিত্বকে অসাময়িক ছাড়া আর কী বলব? যেখানে একটু আগেই শোনা গেছে অলৌকিক এবং পৈশাচিক অট্টহাস্য, সেখানে কোনও সত্যিকার মহাকবির মনও ধারণায় আনতে পারত না পেলব কবিত্বকে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল আমি তা জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার সন্দেহ হতে লাগল, সমুজ্জ্বল নদী-রেখার ঠিক উপরেই ক্রমে-ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দুগ্ধধবল চন্দ্রকরধারার কতক কতক অংশ।

ভুল দেখছি ভেবে আমি একবার দুই হাতে দুই চোখ কচলে আরও ভালো করে দেখলুম, সেই পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্না যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে আরও এগিয়ে আরও এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ধীরে আমারই দিকে। জ্যোৎস্নার এমন কল্পনাতীত ব্যবহার এর আগে আর কখনও আমি লক্ষ করিনি। এও কি সম্ভব?

আসছে, আসছে, আসছে—কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পুঞ্জীকৃত জ্যোৎস্না।

ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলুম না। আবার বোধশক্তি যেন ক্রমেই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। কেবল এইটুকুই অনুভব করলুম, আমার মনের মধ্যে যেন নূপুর বাজাচ্ছে কী এক অজানিত আনন্দের ছন্দ। যেন এই

আনন্দকে লাভ করতে পারলে আমি অনায়াসেই পরিত্যাগ করতে পারি যে-কোনও সাম্রাজ্যের সিংহাসন!

আরও কাছে—আরও, আরও, আরও কাছে একে একে একে এগিয়ে এল সেই আশ্চর্য চন্দ্রকিরণপুঞ্জ। যা ছিল প্রথমে ছায়া-ছায়া স্বচ্ছ, দেখতে দেখতে তা গ্রহণ করতে লাগল এক-একটা নির্দিষ্ট আকার।

ঘনীভূত হয়ে উঠছে, আকারগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পরে পরে, অবশেষে পাশে পাশে আত্মপ্রকাশ করলে তিন-তিনটে মূর্তি। মূর্তিগুলো যেন পরিচিত, এর আগে যেন দেখেছি তাদের কোনও স্বপ্নজড়িমায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়?......

কোথায়? তা ধারণাতেও আনতে পারলুম না। আমি তখন একেবারেই আত্মবিস্মৃত। আমার কাছ থেকে তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে যেন পৃথিবীর অস্তিত্ব।

পাশাপাশি তিনটি তরুণীর সঞ্চারিণী লতার মতন তনু। এমন সব পরমা সুন্দরী আমার চক্ষু জীবনে আর কখনও দেখেনি। রূপকথার রাজকন্যারাও তুচ্ছ তাদের কাছে। বকপক্ষশুভ্র তাদের দেহ এবং তাদের একজনের চক্ষে জ্বলছে গোলাপি আলো, আর-একজনের চক্ষে বেগুনি আলো এবং আর-একজনের চক্ষে নীল আলো। চোখে যে এতরকম রঙের আলো জ্বলতে পারে, একথা জানতুম না কোনওদিনই।

তিনটি তরুণী এগিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে পাশে পাশে।

যার চোখে জ্বলছিল গোলাপি আলো, সে বীণানিন্দিত স্বরে বললে, 'বন্ধু, আমায় কি চিনতে পারছ না?'

আমি তাকে চিনলুম, কিন্তু মুখ আমার হয়ে গেছে বোবা!

যার চোখে জ্বলছিল বেগুনি আলো, সে এগিয়ে এসে নির্ঝরিণীর ছন্দভরা কণ্ঠে বললে, 'এসো বন্ধু, এখানে এসো—আকাশের চাঁদ চায় পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে!'

যার চোখে জ্বলছিল নীল আলো, সানুনয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলভাষিণী নদীর মতন স্বরে সে বললে, 'বন্ধু, ও বন্ধু! আজ তুমি আমায় চিনতে পারছ না? সেদিন তোমায় দেখেছিলুম কী চমৎকার! কিন্তু আজ দেখছি তোমার গলায় ঝুলছে তামার তৈরি কী একটা বিশ্রী জিনিস! ওটা দিয়ে যাও আমার হাতে—আমি ছুড়ে ফেলে দি ওটাকে নদীর জলে। অমন সুন্দর দেহে অমন কুৎসিত জিনিস কি মানায়? দাও দাও, ওটা আমায় দাও, আর ওর ভার বহন কোরো না!' বলতে বলতে সে সামনে বাড়িয়ে দিলে দুইখানি ফুলের পাপড়ির মতন নরম হাত।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম মাতালের মতন টলতে টলতে—সমস্ত পৃথিবী যেন আমার ধারণার বাইরে। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি গলা থেকে কবচখানা টেনে বার করলুম, তারপর অবিনাশবাবুর টানা রেখা-মণ্ডলের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম—

কিন্তু পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক হাতের টানে আছাড় খেয়ে মাটির উপরে পড়লুম পিছন দিকে।

ক্রোধে বিচলিত কণ্ঠে অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ভাগ্যিস আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, নইলে আপনার কী হত বলুন দেখি? আপনি গণ্ডীর বাইরে গিয়ে কবচ দিতে যাচ্ছিলেন কার হাতে? আপনি মূর্খ, আপনাকে গালাগালি দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না! চুপ করে বসে থাকুন এইখানে!'

এবারে আর অট্টহাসি নয়—আচম্বিতে কোথা থেকে কার কণ্ঠে জেগে উঠল এমন আর্তস্বর, নরকেও যা কেউ কোনওদিন শ্রবণ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে অপূর্ব-সুন্দর—কিন্তু অপার্থিব নারীমূর্তি সরে সরে—ক্রমে দূরে, আরও দূরে সরে গেল। দেখতে দেখতে তাদের দেহ মিলিয়ে যেতে লাগল যেন কোনও বায়বীয় পদার্থের মতো বাতাসের সঙ্গে। কোথায় গোলাপি আলো, কোথায় বেগুনি আলো, কোথায় নীল আলো! কেমন একটা অদ্ভুত ক্রন্দন প্রথমে অস্পষ্ট আর অস্পষ্ট হয়ে শোনাতে লাগল বহু—বহু দূরের প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাও মিলিয়ে গেল—জাগ্রত হয়ে রইল কেবল স্বাভাবিক এবং পরিপূর্ণ চাঁদের আলো।

অবিনাশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'বিনয়বাবু! যা বারণ করেছিলুম, আপনি তাই করতে যাচ্ছিলেন!'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'সব এখন বুঝতে পেরেছি! আমি যাচ্ছিলুম নরকে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এখানে ক্ষমার কথা হচ্ছে না বিনয়বাবু। এখানে আছে কেবল যুক্তির কথা—যাক, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বিগতকে নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে চাই না। চেয়ে দেখুন, পূর্ব-চক্রবালে দেখা যাচ্ছে গোলাপি ঊষার মোহনীয় দৃষ্টি। এইবারে শেষ হবে যত ভৌতিক চক্রান্ত।'

একটু একটু করে ধবধবে নরম আলোর আভায় ভরে গেল সমস্ত আকাশ। দূরে, কাছে—গাছে গাছে গেয়ে উঠল জাগ্রত প্রভাতে গীতকারী বিহঙ্গের দল।

উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণকণ্ঠে বললুম, 'জয়, প্রভাত-সূর্যের জয়! চলুন অবিনাশবাবু, আর কোনওদিন আমি পদচ্যুত হব না!'

সাত

আমরা হত্যাকারী

আবার ধরেছি বিশালগড়ের পথ।

চিকন রোদে চারিদিক করছে ঝলমল, কোথাও নেই এতটুকু কালিমার আভাস। গাছপালার ছায়া পর্যন্ত যেন মাজাঘষা, সমুজ্জ্বল। সারা পথ ধরেই কানে জাগছে পাখিদের আনন্দগীতি, ঝরনার সুরও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিশালগড়ের অরণ্য থেকে এখন বিলুপ্ত হয়েছে সমস্ত বিভীষিকার ভাব।

আমার মনও নির্ভয়। এখন দিনের বেলা, শয়তানের রাজা অসহায় মড়ার মতন পড়ে আছে কোথায়, সে আর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আমাদের আরও তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।'

—'কেন অবিনাশবাবু, তাড়াতাড়ির দরকার কী?'

—'দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা যদি বিশালগড়ে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমাদের

চরম বিপদের সম্ভাবনা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পিশাচ হবে জীবন্ত; সঙ্গে সঙ্গে আবার জাগবে রক্তভক্ত নেকড়ের দল, আর সেই ভীষণ-সুন্দর নারীমূর্তিগুলো। তখন কোন দিক দিয়ে কেমন করে যে আসবে বিপদ-আপদ, আমরা তা ধারণাতেও আনতে পারব না।'

অবিনাশবাবুর সাবধান-বাণী শুনে পায়ের গতি করলুম দ্রুততর। বিশালগড়ে যখন পৌঁছলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

দিনের বেলায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানাকেও যেন দেখাচ্ছে মৃতবৎ। বিস্তৃত অঙ্গনের উপরে জাগতে লাগল কেবল আমাদের পায়ের জুতোর শব্দ, তা ছাড়া কোনওদিক থেকে কোনও শব্দই শুনতে পেলুম না। এখানে হয়েছে যেন নিখিল জীবনের সমাধি। এখানে যেন কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করতেও হয় আতঙ্ক।

সেই প্রকাণ্ড দরজা। পাল্লা দুখানা ছিল বন্ধ, হাত দিয়ে ঠেলতেই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ করতে করতে খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে সোজা গিয়ে হাজির হলুম সেই ঘরে, যেখানে কিছুদিন আগে বাস করেছিলুম বন্দির মতো।

ঘরের সাজসজ্জার কিছুই পরিবর্তন হয়নি, নূতনত্বের মধ্যে দেখলুম খালি, সর্বত্রই পড়েছে ধুলোর একটা আবরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখন আমরা কী করব অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমেই আমাদের যেতে হবে রাজার শয়নগৃহে।'

—'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি, দিনের বেলায় রাজা তার ঘরের ভিতর থাকে না।'

অবিনাশবাবু যেন অধীরভাবেই বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, ও-কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি যেতে চাই একতালার সেই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, যেখানে আপনি সিন্দুকের ভিতরে রাজাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।'

—'তাহলে আমার সঙ্গে এদিকে আসুন।'

তারপর ঠিক যেভাবে প্রথমে রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলুম, কার্নিশের উপর দিয়ে ঠিক সেইরকম করেই আবার ঢুকলুম সেই ঘরের ভিতরে। সে-ঘরেরও কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেকেলে টেবিলের উপরে ধুলো-মাখানো স্বর্ণমুদ্রাগুলো পর্যন্ত ঠিক সেইভাবেই পড়ে রয়েছে।

দেওয়ালের দরজাটা ঠেলে পেলুম আবার সেই সরু পথ ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সার।

এবারে আমাদের সঙ্গে ছিল দুটো টর্চ, তার দুটো তীক্ষ্ণ আলোকে অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে আবার নামতে লাগলুম নীচের দিকে। সেবারের মতো এবারও মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভাব। ইহলোক থেকে যেন এগিয়ে যাচ্ছি পরলোকের দিকে। জানি পিশাচ রাজা এখন উপদ্রব করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তবু এই অপার্থিব ভাবটা মনের ভিতর থেকে তাড়াতে পারলুম না। অবিনাশবাবু কী ভাবছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি একেবারেই চুপচাপ।

তারপর সেই ঘর। কিন্তু আজ আর সেখানে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধও নেই, আর সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটাও সেখান থেকে অদৃশ্য।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'আমাদের ভয়ে রুদ্রপ্রতাপ কি তার শোবার ঘর বদলেছে?'

—'হতেও পারে, অসম্ভব নয়।'

—'তাহলে আজ দেখছি বাড়ির সর্বত্রই তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে সেটা সম্ভব হবে কি? যাক, পরের কথা পরেই ভাবা যাবে, এখন আসুন, আমাদের অন্বেষণ আরম্ভ হবে একেবারে বাড়ির উপরতালা থেকে।'

উঠে গেলুম তিনতলার সেই সুদীর্ঘ দালানে। সেখানে সেই ঘরের পরে ঘর, আর প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই একটা করে তালা লাগানো। কিন্তু সেদিনকার মতো আজকেও দেখলুম সেই বড়ো হলঘরটির দরজায় কুলুপ লাগানো নেই, হাত দিয়ে ঠেলতেই ধীরে ধীরে পাল্লা দু-খানা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই বুকের ভিতরে লাগল একটা মহা-আতঙ্কের ধাক্কা। তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এলুম।

অবিনাশবাবুও এগিয়ে দেখলেন, তারপরে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থির মূর্তির মতো।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একখানা মস্ত বড়ো খাট এবং তার উপরে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে সেই ভীষণ-সুন্দর ও অপার্থিব তিন নারীমূর্তি।

খানিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু মুখ ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'আসুন!'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টভাবে এবং রীতিমতো ভয়ে-ভয়েই আমিও ঘরের ভিতর ঢুকে সেই ভয়াবহ খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সত্য, এদের দেখবার আগে এমন সৌন্দর্যের কল্পনাও করা যায় না। তাদের তিনজনের পরনে তিনখানি গোলাপি, বেগুনি আর নীল রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। তা ছাড়া দেহের অন্য কোথাও কোনওরকম অলঙ্কারই নেই। এই নিরলঙ্কার দেহের জন্যেই যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে তাদের আকৃতি। মাথার চিকন কালো চুলের রাশি এলিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোমের মতো নরম দেহের উপর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ভিতরকার রক্তের আভা। কী নিটোল বাহু, কী টানা টানা ভুরু, কী চমৎকার ডাগর ডাগর চোখ! ঠোঁটগুলি যেন ঠিক মিহিন ফুলের পাপড়ি এবং আধ-খোলা ঠোঁটের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে ধবধবে দাঁতগুলি মুক্তাসারির মতো। পাশাপাশি শুয়ে আছে যেন বড়ো শিল্পীর হাতে গড়া তিনটি চমৎকার পুতুল।

কিন্তু এই সুন্দর আকৃতির পিছনে আছে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, এখন তাদের দেখে কিছুতেই তা আন্দাজ করা সম্ভবপর নয়। তাদের চোখের পাতা খোলা থাকলেও তাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে না কোনও জাগ্রত দৃষ্টির আভাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের উত্থান-পতন নেই বটে, কিন্তু তাদের দেখলে মৃত বলেও সন্দেহ হয় না। এরা আশ্চর্য জ্যান্ত মড়া!

—'এদিকে সরে আসুন!' এমন গম্ভীর ও কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু এই কথাগুলো বললেন, যে আমি সচকিত দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম। তাঁর মুখের উপরে একটা নৃশংস দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব।

সরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'অবিনাশবাবু, এখন আপনি কী করবেন?'

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন না, হাতব্যাগ খুলে ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একখানা ধারালো চকচকে ভোজালি।

আমি বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'একী অবিনাশবাবু? আপনি ভোজালি বার করলেন কেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'মড়া যাতে আর না বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমি করব!'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। শিউরে উঠে বললুম, 'তার মানে? আপনি কি এদের হত্যা করতে চান?'

অবিনাশবাবু পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'মড়াকে আবার কেউ হত্যা করতে পারে নাকি?'

—'কিন্তু আপনি তো জানেন এরা কেউ মড়া নয়? এরা ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে?'

—'হ্যাঁ, আবার জেগে ওঠে, জীবন্ত মানুষের রক্তপান করবার জন্যে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, ওদের ঠোঁট অত বেশি রাঙা কেন? ওদের ঠোঁটে এখনও মাখানো রয়েছে মানুষের শুকনো রক্তের দাগ। আর খানিক পরেই ওরা আবার জেগে উঠবে, আর রাক্ষসীর মতো আক্রমণ করবে আমাদেরই। কিন্তু ওদের জাগার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর ওদের জাগতে দেব না—না, না, কখনওই না!'—বলতে বলতেই তিনি ভোজালিখানা তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

আমি বলে উঠলুম, 'করেন কী, করেন কী অবিনাশবাবু!'

বিষম রাগে চেঁচিয়ে উঠে অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি নির্বোধ! প্রেতিনীর উপরে দয়া?'

ভোজালিখানা তুলে অবিনাশবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

সে দৃশ্য সহ্য করতে পারব না বলে আমি বেগে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে এলুম। তারপরেই দালানে দাঁড়িয়ে আচ্ছন্নের মতো শুনলুম আঘাতের পর আঘাতের শব্দ, এবং তিনটে বিভিন্ন কণ্ঠে তিন-তিনবার কান-ফাটানো তীব্র চিৎকার।

অবিনাশবাবু দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখচোখ উদভ্রান্তের মতো এবং তাঁর জামাকাপড়ে টকটকে লাল টাটকা রক্তের দাগ। তাঁর হাতের ভোজালি থেকেও ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। প্রায় অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'চলে আসুন বিনয়বাবু, শিগগির এখান থেকে চলে আসুন! পৃথিবী থেকে তিনটে মহাপাপ চিরদিনের জন্যে বিদায় হয়েছে—ওদের মুণ্ড আর জোড়া লাগবে না।'

আট

নেকড়ে এবং রুদ্রপ্রতাপ

অবিনাশবাবুর সঙ্গে আমি আবার বিশালগড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বিশালগড়ের ভিত্তির তলায় আছে বোধহয় কোনও ছোটো পাহাড়। কারণ এখানটা চারিদিকের অন্য সব জায়গার চেয়ে অনেক উঁচু। এখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, আর খানিকক্ষণ পরেই হবে সূর্যাস্ত। মনে হতেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত পিশাচের নিদ্রাভঙ্গ হবে না। কিন্তু তারপর?

বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন অবিনাশবাবুও। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, বিশালগড়ের ভিতরে তো রুদ্রপ্রতাপের কোনওই পাত্তা পেলুম না। খুব সম্ভব এই অরণ্যেই কোনও গুপ্ত স্থানে সে দিবানিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হবে আবার তার জাগরণ, আর আমাদের পক্ষে সেটা হবে অত্যন্ত বিপদের কথা।'

আমি বললুম, 'রাতের বেলায় এই বিশাল অরণ্যের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। পিশাচ তার অপার্থিব শক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বার করবে। সূর্যাস্তের আগে আমরা কিছুতেই এই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না। তখন আমাদের কী উপায় হবে অবিনাশবাবু?'

—'আত্মরক্ষা করার জন্যে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কালকের মতো আবার মন্ত্রঃপূত গণ্ডীর মধ্যে রাত্রিযাপন করা।'

—'মানলুম, আপনার মন্ত্রঃপূত গণ্ডীর ভিতরে কোনও প্রেত কি পিশাচ আসতে পারবে না। কিন্তু আর একটা পার্থিব বিপদের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

—'আপনি কী বিপদের কথা বলছেন?'

—'আপনাকে কি সেই নেকড়ের দলের কথা আমি বলিনি? সেই দারুণ নেকড়ের দল রুদ্রপ্রতাপের বশীভূত। সে যদি নেকড়ের দলকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে ওই মন্ত্রঃপূত গণ্ডী কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?'

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'নেকড়ের দলের কথা সত্যিই আমার মনে ছিল না। গণ্ডী তো তাদের বাধা দিতে পারবে না! তবে, আমাদের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা নিরস্ত্র নই। আমাদের দুইজনেরই সঙ্গে আছে রিভলভার; অন্তত যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ তাদের বাধা দিতে পারব!'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ। কিন্তু তারপর?'

'তার পরের কথা এখন আর ভেবে কোনওই লাভ নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলুম, তা সম্পূর্ণরূপে সফল হল না। পিশাচীদের বধ করেছি বটে, কিন্তু পালের গোদা সেই পিশাচ এখনও বর্তমান। সে যে কী করবে আর না করবে, তাও আমরা অনুমান করতে পারছি না। আমাদের সম্বল কেবল ভগবানের দয়া। তাঁরই উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনওই উপায় নেই।'

আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

অস্ত যাবার আগে সূর্যের মুখ যতই রাঙা হয়ে উঠছে, তার কিরণ হয়ে আসছে ততই পরিম্লান। দিনের আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফেরবার জন্যে এখনই পাখিদের মধ্যে জেগেছে ব্যস্ততা। শূন্য পথ দিয়ে দলে দলে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁস, বক, কাক, শালিক ও চিল প্রভৃতি বিহঙ্গের দল। কখনও হাঁস ও বকের ঝটাপট শব্দে এবং কখনও বা টিয়া ও শালিকের কলরবে থেকে-থেকে ভেঙে যাচ্ছে অরণ্যের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বাতাসও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সঙ্গে

সঙ্গে জাগল যেন আসন্ন রাত্রির ভয়ে অরণ্যের মর্মর-কাতরতা। তার পরেই অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম একটা ভয়াবহ অস্পষ্ট ধ্বনি।

সচকিত কণ্ঠে বললুম, 'অবিনাশবাবু, শুনছেন?'

—'কী?'

—'আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ও কীসের শব্দ?'

—'নেকড়েরা আসছে!'

—'নেকড়েরা?'

—'হ্যাঁ। নেকড়েরা আসছে, আর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে। যে শব্দ শুনছেন, ও হচ্ছে নেকড়েদের গর্জন। ওই ভয়ানক শব্দ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পিশাচ রুদ্রপ্রতাপের সঙ্গে নেকড়েদের কী অলৌকিক যোগাযোগ আছে আমি তা জানি না কিন্তু এরই মধ্যে কোনও অদ্ভুত উপায়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে রুদ্রপ্রতাপের আদেশ। হয়তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নেকড়েরা আমাদের কাছে এসে পড়বে। অবিনাশবাবু, মাত্র দুটো রিভলভারের গুলিতে আমরা কি শতাধিক নেকড়েকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?'

অবিনাশবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। আমি উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম, নেকড়েদের চিৎকার ক্রমেই স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের আর কত দেরি? বোধহয় মিনিট পনেরোর বেশি নয়। নেকড়েদের এখানে আসতে আর কত দেরি? হয়তো মিনিট পনেরোরও কম।

হঠাৎ অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, 'ভয় নেই বিনয়বাবু, ভয় নেই। আত্মরক্ষার একটা উপায় আমি আবিষ্কার করেছি!'

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী উপায়, অবিনাশবাবু?'

—'ওই যে খুব উঁচু বড়ো গাছটা দেখছেন, ওরই উপরে উঠে আজ আমরা রাত্রিযাপন করব।'

—'ওই গাছের উপরে আমরা নেকড়েদের ফাঁকি দিতে পারব বটে, কিন্তু আপনি রুদ্রপ্রতাপের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? গাছে উঠলে তাকেও কি ফাঁকি দিতে পারব?'

—'রুদ্রপ্রতাপের কথা আমি ভুলিনি বিনয়বাবু। ওই গাছের চারিদিক ঘিরে আমি কেটে দেব মন্ত্রপড়া গণ্ডী। রুদ্রপ্রতাপ যদি গণ্ডীর ভিতরে ঢুকতে না পায়, তাহলে সে গাছের উপরে গিয়ে উঠবে কেমন করে?'

আমি শুকনো হাসি হেসে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপ যদি একটা বাদুড় হয়ে শূন্যপথে ওই গাছের উপরে গিয়ে আবির্ভূত হয়?'

—'না, তা সে পারবে না। ওই গণ্ডীর উপরকার শূন্যপথও তার কাছে বন্ধ।'

নেকড়ের চিৎকার এখন বেশ ভালো করেই শোনা যাচ্ছে। সে কী ক্ষুধিত চিৎকার! তার প্রভাবে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিও যেন হয়ে উঠল বিষাক্ত!

আমার সামনে পড়ে ছিল বিশালগড়ে আসবার সেই সুদীর্ঘ সোজা রাস্তাটি। হঠাৎ দেখলুম,

সেই রাস্তার উপর দিয়ে কারা এগিয়ে আসছে এইদিকেই। সচমকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলুম, কয়েকটা লোক মাথার উপর কী যেন একটা বহন করে আনছে।

অবিনাশবাবু সেই বড়ো গাছটার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ত্রস্তকণ্ঠে ডাকলুম, 'অবিনাশবাবু!'

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী?'

—'পথ দিয়ে কারা আসছে!'

অবিনাশবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে করলেন দৃষ্টিপাত। কয়েকটি মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'পথ দিয়ে কারা আসছে, বুঝতে পারছেন না?'

—'কারা আসছে?'

—'সেই বেদের দল। আর ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই বড়ো সিন্দুকটা, যার ভিতরে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে রুদ্রপ্রতাপ।'

আমি সভয়ে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপকে নিয়ে ওরা আমাদের সামনে আসতে সাহস করবে? সে তো এখনও মৃতবৎ!'

গম্ভীর স্বরে অবিনাশবাবু বললেন, 'সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সূর্য তখন একটা ঝিমন্ত লাল আলোর গোল ফানুসের মতো। আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে দিকচক্রবালরেখার ওপারে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি কি জানেন না বিনয়বাবু, ভোরের আলো ফোটবার আগেই রাতকানা পাখিদের ঘুম যায় ভেঙে? তেমনই বোধহয় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আসবার আগেই দিনকানা রুদ্রপ্রতাপের দেহে জাগে জীবনের চিহ্ন। বেদেরা আমাদের কাছে আসবার আগে সূর্যের মুখ আর আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব না। অতএব আমাদের এখন বেগে দৌড়ে এগিয়ে যেতে হবে ওই বেদেগুলোর দিকে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'কেন অবিনাশবাবু?'

—'সূর্যাস্তের পরমুহূর্তেই রুদ্রপ্রতাপ হবে সিন্দুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য।'

—'বেদেরা দেখছি দলে ভারী। ওরা আমাদের বন্ধু নয়।'

অবিনাশবাবু আমার হাত ধরে টানতে টানতে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, জানি। ওরা আমাদের শত্রু। আমরাও ওদের বন্ধু নই। আমরাই ওদের আক্রমণ করব। বার করুন রিভলভার. দৌড়ে চলুন—আর কথা কইবার সময় নেই!'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হলুম সবেগে ধাবমান। তিনিও রিভলভার বার করলেন, আমিও।

উত্তেজনায় আর একটা মস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তখন আমাদের খুব কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে নেকড়েদের ভীষণ চিৎকার। তাদের ঘন ঘন চিৎকারে থর-থর করে কাঁপছে যেন সারা বন। তারা এসে পড়ল বলে।

খানিকটা ছুটেই আকাশে শঙ্কিত চক্ষু তুলে দেখলুম, চোখের আড়ালে নেমে গিয়েছে তখন সূর্যের আধখানা।

আমাদের ওইভাবে দৌড়ে যেতে দেখে বেদের দল দাঁড়িয়ে পড়ল। বাহকরাও সিন্দুকটা নামিয়ে রাখলে মাটির উপরে। তারপর লক্ষ করলুম, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কী যেন চকচক করে উঠছে। অস্ত্র?

তাদের দলে লোক ছিল প্রায় পনেরো-যোলো। আমরা মোটে দুজন দেখে তাদের সাহস বেড়ে উঠল। তারাও বেগে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

যখন আমরা তাদের কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে এসে পড়েছি, অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'রিভলভার ছুড়ুন বিনয়বাবু, রিভলভার ছুড়ুন!' দৌড়তে দৌড়তেই রিভলভার তুলে তিনি ঘোড়া টিপতে লাগলেন। আমিও ছুড়তে লাগলুম রিভলভার।

তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্বের মতো। একটা বেদে গুলি খেয়ে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গেল এবং তারপরে আবার দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল ওপাশের গভীর বনের দিকে। আর একটা বেদেও গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর অন্য বেদেগুলোরও সাহস গেল একেবারে উবে। তারা সকলেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে সরে পড়ল। পরমুহূর্তে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সেই সিন্দুকটার পাশে।

রিভলভারটা বাম হাতে নিয়ে অবিনাশবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রে পিশাচ মরে না। পিশাচ বধ করতে গেলে তার মুণ্ডটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হবে দেহ থেকে!' ডান হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো ভোজালিখানা তিনি টেনে বার করে ফেললেন।

সেই সঙিন মুহূর্তেও আমার দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হল অন্য একদিকে। পথের ওপারে ছিল একটা মাঝারি আকারের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ এবং তারই প্রান্তে ছিল গভীর জঙ্গল। আড়ষ্ট নেত্রে দেখলুম, সেই জঙ্গলের ঝোপঝাপের ভিতর থেকে লাফ মেরে মাঠের উপরে এসে আবির্ভূত হচ্ছে নেকড়ের পর নেকড়ে। তারা প্রত্যেকেই ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'অবিনাশবাবু! নেকড়েরা এসে পড়েছে!'

অবিনাশবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আসুক নেকড়ের দল! পিশাচকে মেরে তবে আমরা মরব! ওই দেখুন, সূর্য ডুবে গিয়েছে, আর সময় নেই।'

তাঁর মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরুতেই সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল সশব্দে। তারপর স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম, সিন্দুকের ভিতরে সিধে হয়ে বসে আছে জাগ্রত রুদ্রপ্রতাপের ভয়াল মূর্তি। তার দুই চক্ষে জ্বলছে হিংস্র দৃষ্টি এবং ওষ্ঠাধরে মাখানো রয়েছে তীব্র বিদ্রূপের হাস্য।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে সিন্দুকের বাইরে এসে পড়ল। তারপর বিকট অট্টহাস্য করে সচিৎকারে বললে, 'ওরে আয় রে, আয় রে আয়, আমার বনের সন্তানেরা! তোদের সামনে এসেছে বলির পশু, দৌড়ে আয় রে, দৌড়ে আয়! তোদের উপবাস ভঙ্গ কর, নিবারণ কর তোদের উদরের ক্ষুধা!'

প্রায় সারা মাঠটাই তখন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি নেকড়ের পর নেকড়ে—চক্ষু তাদের রক্তবর্ণ, হাঁ-করা মুখ তাদের দন্ত-কণ্টকিত, কণ্ঠ তাদের ভৈরব গর্জনে পরিপূর্ণ।

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদ্রপ্রতাপের পিছন দিকে। প্রথমটা তিনিও থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন

রুদ্রপ্রতাপের উপরে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই দুই দুই বার চালনা করলেন তাঁর হাতের ভোজালিখানা।

একটা প্রচণ্ড আকাশ-ফাটানো বিকট চিৎকার, এবং তারপরই একদিকে ছিটকে পড়ল রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডটা এবং আর একদিকে ধরাশায়ী হল তার মুণ্ডহীন দেহটা।

চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। নেকড়েদেরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখি, নেকড়ের দল আবার ছুটে ফিরে যাচ্ছে মাঠের উপরকার নিবিড় অরণ্যের দিকে। রুদ্রপ্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি ফুরিয়ে গেল তার অপার্থিব মন্ত্রশক্তি? এতক্ষণ তারই ইচ্ছাশক্তি কি চালনা করছিল ওই নেকড়েগুলোকে?

হঠাৎ অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখুন বিনয়বাবু, এদিকে ফিরে দেখুন!'

ফিরে দেখলুম এক অভাবিত ব্যাপার। রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড আশ্চর্য রূপান্তর গ্রহণ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখানে পড়ে রইল কেবল একটা বড়ো ও একটা ছোটো জীর্ণ ধূলির পুঞ্জ। যে অভিশপ্ত দুর্দান্ত আত্মা এই রক্ত-মাংসে গড়া দেহটাকে অস্বাভাবিক রূপে জীবন্ত করে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আজ সেই আত্মার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নশ্বর দেহটা আবার ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক অবস্থা। ধুলায় গড়া নশ্বর দেহ আবার পরিণত হয়েছে ধূলিপুঞ্জে।

অবিনাশবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিন বিনয়বাবু! এতকাল পরে রুদ্রপ্রতাপের শাপমুক্ত দেহের আবার সদ্গতি হল। আর সে জাগবে না।'

খানিকক্ষণ আমরা দুইজনেই ভারাক্রান্ত মনে সেইখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম নীরবে। অরণ্যের উপরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকারের যবনিকা, কিন্তু সে অন্ধকারকে আজ যেন মনে হল স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর।

ভেনাস-ছোরার রহস্য

বৈঠকখানা। দুজনে চা পান করছিলেন। কমিশনার ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ধরণীধর রায়চৌধুরী। ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে আসছে বসন্তকালের বৈকালী রোদ।

হঠাৎ দ্বারপথে দুই মূর্তিকে দেখে সুন্দরবাবু উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হুম, জয়ন্ত আর মানিক যে! বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ!

মানিক বললে, অসময়ে মানে! চায়ের সময়ই তো ঠিক সময়। পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আচম্বিতে দ্বারপথ দিয়ে আপনার তৈলমার্জিত সমুজ্জ্বল টাক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আর অমনি আমাদের পদচালনা হল অবরুদ্ধ। তারপর—

পাছে সে ফস করে কোনও বে-তাল কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক, আর ব্যাখানা করে বলতে হবে না! এগিয়ে এসো, বসে পড়ো। (ভৃত্যের উদ্দেশে সচিৎকারে)—ওরে, আর দু পেয়ালা চা! (গলা নামিয়ে) জয়ন্ত, সুবিখ্যাত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ধরণীধর রায়চৌধুরীর সঙ্গে বোধহয় তোমাদের আলাপ-পরিচয় নেই! ইনিই তিনি। ধরণীবাবু, এরা হচ্ছে জয়ন্ত আর মানিক। আমার মুখে এদের নাম শুনেছেন বোধহয়।

ধরণী আগে দুই বন্ধুর আপাদমস্তকের উপরে চোরধরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর ভারিক্কি চালে বললেন, শুনেছি গোয়েন্দাগিরি নাকি এঁদের খেয়াল বা শখ!

জয়ন্ত জোড়হাতে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিলাসও বলতে পারেন। আপনার মতো নামজাদা পেশাদারের কাছে আমরা হচ্ছি—পর্বতের তুলনায় নুড়ির মতো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ!

ধরণী কিঞ্চিৎ খুশি হয়ে বললেন, দেখছি, আপনি কথার ম্যাজিকেও কম নন। বসুন, চা খান। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখা উচিত, আজ আমি এখানে সুন্দরবাবুর সঙ্গে একান্তে কিছু পরামর্শ করতে এসেছি।

—একান্তে! অর্থাৎ গোপনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানিক বললে, তাহলে সুন্দরবাবু, আজ এখানে আমরা চা না খেলেও পৃথিবী উল্টে যাবে না। তোমার কী মত জয়ন্ত?

—হ্যাঁ, আমাদের গাত্রোত্থান করাই উচিত।

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, আরে, আরে, তাও কি হয়! চা খেতে আর তোমাদের কতক্ষণ লাগবে! সেটুকু সময়ের মধ্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

মানিক মাথা নেড়ে বললে, না মশাই, ঘড়ি ধরে চা খাওয়া আমাদের ধাতস্থ হয় না। চা খাওয়ার মানে কি এক নিঃশ্বাসে চা গলাধঃকরণ করা। ধীরে-সুস্থে কিছু গালগল্প হবে না, দুটো ফষ্টিনষ্টি করবার ফুরসত পাওয়া যাবে না, তর্কাতর্কির চোটে চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ উঠবে না, তবে আর হল কী দাদা! না জেনে কোথায় এসে পড়েছি রে বাবা!

কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, না ভাই, তোমরা চা না খেয়ে চলে গেলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। বোসো। ওই দ্যাখো চা এসে পড়েছে।

ধরণীধর বিরক্তমুখে নির্বাক। সুন্দরবাবুর নির্বন্ধ এড়াতে না পেরে অগত্যা জয়ন্ত ও মানিক হাত বাড়িয়ে চায়ের পাত্র গ্রহণ করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, ব্যাপার কী জানো ভায়া! একটা অদ্ভুত মামলা হাতে নিয়ে আমরা মস্ত সমস্যায় পড়ে গিয়েছি।

—অদ্ভুত মামলা!

—রীতিমতো। আসামিকে আবিষ্কার করেছি, অকাট্য সব প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে পারছি না।

জয়ন্ত বললে, মামলাটার কিছু আঁচ পেলে আপনাদের সঙ্গে আমরাও না হয় মাথা ঘামাবার চেষ্টা করতুম।

দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট কণ্ঠে ধরণী বলে উঠলেন, কে মশাইদের মাথা ঘামাতে বলছে? পেশাদার পুলিশ শখের গোয়েন্দার সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে। আমরা যেখানে হাবুডুবু খাই, আপনারা সেখানে তলিয়ে যাবেন।

জয়ন্ত বললে, অবশ্য, অবশ্য!

মানিক মাথা নেড়ে বললে, উঁহু!

ধরণী কুপিত কণ্ঠে বললেন, উঁহু মানে?

—জয়ন্ত সাঁতার জানে, তলিয়ে না যেতেও পারে!

কবজি-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে ধরণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তাহলে আপনারা সমস্যা-সাগরে সাঁতার কাটুন, আপাতত আমার আর সময় নেই, অফিসে জরুরি কাজ আছে। সুন্দরবাবু, আধঘণ্টা পরেই যেন আপনার দেখা পাই।

—যে আজ্ঞে।

জয়ন্ত বললে, ভদ্রলোক রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেলেন।

হো হো করে হেসে উঠে সুন্দরবাবু বললেন, হুম! ধরণীবাবু শখের গোয়েন্দার নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। তাঁর মতে, পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজরাই শখের গোয়েন্দা বলে আত্মপরিচয় দেয়।

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, এখন আপনার অদ্ভুত মামলার কথা বলুন।

সুন্দরবাবু বললেন, ফলাও করে বলবার সময় নেই, ছুটি পেয়েছি আধঘণ্টা মাত্র। সংক্ষেপে বলব। সদানন্দবাবু মস্ত ধনী—মোটা ব্যাঙ্কের খাতা আর স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তার স্ত্রী স্বর্গে, পুত্রসন্তান নেই, মন্দ্রা তাঁর একমাত্র কন্যা। সে একাধারে রূপবতী আর গুণবতী—সসম্মানে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

হাতে অঢেল টাকা থাকলে অনেকের অনেক রকম শখ বা নেশা বা খেয়াল হয়। সদানন্দবাবুর শখ ছিল দেশভ্রমণ। তিনি ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কোথাও টহল দিতে বাকি রাখেননি। তারপর যান ইউরোপে। তারপর আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে তিনি এক নতুন বন্ধু লাভ করেন—যামিনীকান্ত। তাঁর সঙ্গে সে-ও দেশে ফিরে আসে আর প্রতিদিনই দুজনে মিলে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা তাস-দাবা-পাশা খেলা চলে। ধনী না হলেও বাপের দৌলতে তাকেও চাকরি করে খেতে হয় না।

সদানন্দবাবুর বয়স ষাট আর যামিনীর পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁদের বন্ধুত্বের ভিত এমন পাকা হয়ে উঠেছিল যে, যামিনীকে না পেলে সদানন্দবাবুর অবসর-মুহূর্তগুলো অচল হয়ে পড়ত চাকা-ভাঙা গাড়ির মতোই।

সদানন্দবাবুর প্রকৃতির উপরে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট পরিমাণেই। নিজের একমাত্র সন্তান মন্দ্রাকেও তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন সেইভাবেই। সে এম এ পাস দেবার পরেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে তিনি এক বৎসর কাল কাটিয়ে আসেন। তিনি জানতেন, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হবে মন্দ্রা। সুতরাং দুনিয়াদারির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলে তার চলবে না।

সুপটু শিল্পীর হাতে গড়া আলমারিতে সাজিয়ে রাখা মোমের পুতুলের মতো সুন্দরী নয় মন্দ্রা,—তার আশ্চর্য সৌন্দর্য যেন গতিচঞ্চল দেহের ভিতর থেকে উপচে পড়তে চায় প্রাণের প্রাচুর্যে আর জীবনের উচ্ছ্বাসে। তাকে দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়। যামিনীও মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। খালি মুগ্ধ নয়, তাকে পাবার জন্যে সে হয়ে উঠেছিল লুব্ধ। বারবার এড়িয়ে এসেছে যে উদ্বাহবন্ধন, চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে সে এখন ধরা দিতে চায় সেই কঠিন বাঁধনেই।

যামিনীর বয়স পঁয়তাল্লিশ বটে, কিন্তু অন্তরে বাহিরে সে বয়োধর্মকে নিকটবর্তী হতে দেয়নি। তার হাবভাব চালচলন ও কথাবার্তা সব তরুণের মতো, এমনকি চেহারা দেখলেও তার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের বেশি বলে সন্দেহ হয় না। তার এই তারুণ্যই আকৃষ্ট করেছিল সদানন্দবাবুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত মন্দ্রাকেও। অন্তত মন্দ্রা যে যামিনীকে পছন্দ করত এটুকু জানা গিয়েছে এবং তারই ফলে আশান্বিত ও উৎসাহিত হয়ে যামিনী সদানন্দবাবুর কাছে তার জামাতা হবার বাসনা প্রকাশ করে!

আগেই বলেছি, সদানন্দবাবুর মন ছিল অতি আধুনিক। স্ত্রী-স্বাধীনতায় তাঁর ছিল প্রবল প্রত্যয়। নিজে কোনও মত জাহির করার আগে তিনি কন্যার মত জানতে চাইলেন। অতি-আধুনিকা কেতাদুরস্ত মন্দ্রা কিন্তু নিতান্ত সেকেলে বঙ্গবালার মতোই বললে, তোমার মতই আমার মত।

এ-বিবাহে সদানন্দবাবুর মত হল না প্রথমত দুটি কারণে। প্রথমত পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান একুশ বৎসর। দ্বিতীয়ত, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে তিনি জামাতার সম্পর্ক স্থাপন করতে একান্ত নারাজ।

এই মতের অমিলে কিন্তু মনের অমিল হল না, বজায় রইল বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই। ব্যাপারটা যামিনী গ্রহণ করলে পয়লা নম্বরের দার্শনিকের মতো খুব সহজভাবেই। সদানন্দবাবু বাজারে মন্দ্রার যোগ্য পাত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাত্র আবিষ্কার করবার আগেই ইহলোক থেকে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

গেল হপ্তার আঠারো তারিখে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তিনি মারা পড়েছেন আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে।

অস্ত্র একখানা ছোরা। অদ্ভুত ছোরা! ধরণীবাবুর মুখে শুনলাম, এ রকম ছোরা এখনও বাজারে আসেনি। ছোরার একদিকে খুব ধারালো ফলা আর একদিকে গ্রিসের সৌন্দর্যের দেবী

ভেনাসের নগ্নমূর্তি। এই মূর্তিটাই হচ্ছে ছোরার হাতল। যা জার্মানির 'ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর ছোরা নামে খ্যাত। আমেরিকার বাজারেও এর চাহিদা যথেষ্ট। শিকারিরাই এই ছোরা ব্যবহার করে। সদানন্দবাবুর বুকের উপরে ছোরাখানা বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

হত্যাকাল হচ্ছে রাত্রি সাড়ে নয়টা। ঘটনাস্থল হচ্ছে সদানন্দবাবুর শয়নগৃহ। কেবল খুন নয়, সদানন্দবাবুর আলমারির ভিতর থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া আর পনেরো হাজার টাকার জড়োয়া গহনাও অদৃশ্য হয়েছে।

বাবার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে মন্দ্রা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে স্পষ্ট দেখতে পায়, সদানন্দবাবুর শয়নগৃহ থেকে বেরিয়ে যামিনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। মন্দ্রা বারবার 'যামিনীবাবু' বলে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পায়নি।

একতলায় নিজের ঘর থেকে সদানন্দবাবুর ম্যানেজার হরিবাবুও স্বচক্ষে যামিনীকে বেগে রাস্তার দিকে ছুটে যেতে দেখেছেন।

মন্দ্রার মুখ থেকে আরও জানা গেছে, 'ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর ওই ছোরাখানার অধিকারী হচ্ছে যামিনীই, আমেরিকায় মন্দ্রার সামনেই সে ছোরাখানা কিনেছিল।

সব শুনে আমাদের দৃঢ় ধারণা হল, খুনি যামিনী ছাড়া আর কেউ নয়। পাছে চম্পট দেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললুম। কিন্তু তারপরেই আমাদের চিত্তবিভ্রম হবার উপক্রম! হুম! এ কী উদ্ভট মামলা!

হা হা করে হেসে উঠে যামিনী ধরণীকে বললে, খুলে দিন মশাই, খুলে দিন—আমার নরম হাতে এই শক্ত লোহার বেড়ি সহ্য হবে না! আপনারাও হবেন অপদস্থ আর বিপদগ্রস্ত!

ধরণী চোখ রাঙিয়ে বললেন, চোপরাও ছুঁচো, শুয়োর! খুন করে আবার লম্বা লম্বা বুলি কপচানো হচ্ছে! ঘুসি মেরে মুখ ভেঙে দেব জানিস!

—আমি খুন করেছি! প্রমাণ?

—মন্দ্রা দেবী আর তাঁর ম্যানেজারবাবু স্বচক্ষে তোকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

—ওরা ভুল দেখেছে।

—ওই ভেনাস-ছোরাখানা কার?

—আমার বলেই তো মনে হচ্ছে। আমেরিকায় কিনেছিলুম। কিন্তু ওখানা আজ ছমাস আগে আমার ঘর থেকে চুরি গিয়েছে। খবর নিয়ে দেখবেন যথাসময়ে থানায় ডায়েরি লেখানো হয়েছে।

—বটে! কিন্তু জানিস কি এই ছোরার হাতলের উপরে আছে খুনির আঙুলের স্পষ্ট ছাপ? ঘটনাস্থলেও পাওয়া গিয়েছে তার রক্তাক্ত হাতের ছাপ! এক জায়গায় নয়, তিন জায়গায়।

—হাতের ছাপের নিকুচি করেছে! ফালতু হাতের ছাপ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না!

—এই হাতের আর আঙুলের ছাপই প্রমাণ করবে খুন করেছিস তুই। পৃথিবীতে দুজন মানুষের হাতের ছাপ একরকম হয় না।

—বহুত আচ্ছা, দেখা যাবে। আপাতত আমার 'অ্যালিবাই' নিয়ে মাথা ঘামান দেখি।

—কী অ্যালিবাই?

—খুন হয়েছে আঠারো তারিখে। কিন্তু সতেরো থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন আমি কলকাতাতেই হাজির ছিলুম না।

—কোথায় ছিলি?

—বর্ধমানে। আমার বিশেষ বন্ধু বিজয়গোপালের বাড়িতে।

—কে বিজয়গোপাল?

—তাকে আপনি খুব চেনেন,—সে হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির একমাত্র ভগ্নীপতি।

ধরণীবাবুর চোখ উঠল চমকে। একটু থতমত খেয়ে তিনি শুধোলেন, বিজয়বাবুর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

—বললুম তো, বিজয় আমার বিশেষ বন্ধু। তার একমাত্র পুত্রের বিবাহে সে আমাকে সাহায্য করতে ডেকেছিল। গোটা তিন দিন আমাকে কলকাতায় ফিরতে দেয়নি। বিজয়ের কাছে খবর নিলেই জানতে পারবেন। আপনাদের ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছেও খবর পেতে পারেন—কারণ তিনিও ওই তিন দিন ছুটি নিয়ে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন।

ধরণীবাবু আর আমি দুজনেই রীতিমতো মুষড়ে পড়লুম, যদিও মুখে কিছু ভাঙলুম না।

পরে খবরাখবর নিয়ে জানা গেল, যামিনীর কথা মিথ্যা নয়—এ যে ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে লোহা-বাঁধানো 'অ্যালিবাই', এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার উপায় নেই।

ঘটনাস্থলে পাওয়া আঙুল ও হাতের ছাপের সঙ্গেও যামিনীর আঙুল ও হাতের ছাপ একটুও মিলল না।

আমরা যামিনীর চোখা চোখা টিটকারি শুনতে শুনতে প্রায় অধোবদনে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

জয়ন্ত, মানিক, তোমরা এমন সৃষ্টিছাড়া মামলার কথা কখনও শুনেছ?

জয়ন্ত জবাব দিলে না, দুই চক্ষু মুদে কী ভাবতে লাগল!

মানিক বললে, হুঁ, প্রথম দৃষ্টিতে সবদিক দিয়েই সন্দেহ ধাবমান হয় বটে যামিনীরই দিকে। প্রায় প্রতিদিন যারা তাকে দেখে এমন দুইজন স্বচক্ষে দেখলে পলায়মান যামিনীকে, তার কেনা ভেনাস-ছোরা পাওয়া গেল হত ব্যক্তির বক্ষে বিদ্ধ অবস্থায়, তার উপরে জামাতারূপে তাকে গ্রহণ করতে নারাজ হওয়ার দরুন সদানন্দবাবু নিশ্চয়ই তার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি ঠিক জানেন, মন্দ্রা মনে মনে যামিনীকে পছন্দ করত?

—লোকের মুখে তাই তো শুনেছি।

—তাহলে তো সহজেই যামিনীর বিশ্বাস হতে পারে, সদানন্দবাবুকে মাঝখান থেকে সরিয়ে দিলেই মন্দ্রা আর তার বিপুল সম্পত্তি নিশ্চয়ই সে অধিকার করতে পারবে।

—এ সব আমরাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু খালি ভেবে-চিন্তে কী হবে ভায়া! পুলিশের চাই প্রমাণের মতো প্রমাণ।

—আর একটা কথা। আপনাদের জামাই-আদর থেকে ছাড়ান পাবার পর যামিনী কি আবার মন্দ্রার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেনি?

—করেনি আবার, খুব চেষ্টা করেছে! তাকে যে ভুল দেখা আর বোঝা হয়েছে, সেটা সবিস্তারে জানিয়ে যামিনী প্রথমে মন্দ্রাকে একখানা পত্র লেখে। কিন্তু মন্দ্রার তরফ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে সে সশরীরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মন্দ্রা দেখা না করে লোকমুখে বলে পাঠায়—নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। পিতৃহন্তার সঙ্গে আমি দেখা করব না। যামিনীকে তাই হাল ছাড়তে হয়েছে।

আচম্বিতে জয়ন্ত চোখ চেয়ে বললে, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ষড়যন্ত্র আছে।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, কেমন করে বুঝলে?

জয়ন্ত বললে, আমার বোঝাবুঝির মূল্য কতটুকু! ধরণীবাবু বলবেন, কড়াক্রান্তিও নয়!

সুন্দরবাবু হেসে বললেন, কিন্তু আমি তো ধরণীবাবু নই।

জয়ন্ত বললে, তাহলে আপনাকে আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে পারি?

—তুমি অগুন্তি প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করে ফেললেও আমি একটুও বিরক্ত হব না।

—আমার সর্বপ্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যামিনীর দেশ কোথায়?

—মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। কিন্তু আজ বিশ বৎসর আগে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যামিনী দেশের সঙ্গে যা-কিছু সম্পর্ক তুলে দিয়ে চলে আসে, তারপর নানাস্থানী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জিয়াগঞ্জের কোনও লোকই তার কথা বিশেষ কিছুই জানে না। ভাসা-ভাসা কেবল শোনা যায়, কামিনীকান্ত নামে যামিনীর আর এক ছোটোভাই ছিল, সে নাকি ক্রিমিন্যাল। ওয়ারেন্টে ধরা পড়বার ভয়ে আজ পনেরো বৎসর ধরে কোথায় কোন দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে, যামিনীও তার খোঁজখবর পায় না। সে বলে, তার ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।

—আমার পরের প্রশ্ন হচ্ছে সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যামিনী কোথায় বাসা বেঁধেছিল?

আপার সারকুলার রোডের একখানা ছোটো বাড়িতে। আর এক পুরোনো বন্ধু শ্যামাকান্তের সঙ্গে সেই বাড়িতেই বাস করত যামিনী।

—বন্ধুটিকে দেখেছেন?

—দৈবগতিকে দেখেছি। মাস পাঁচেক আগে ও-পাড়ার একটা বড়ো চুরির মামলায় পুলিশের পক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে আসে। মুখময় দাড়ি-গোঁফের ঝোপঝাড়, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলেপড়া এলোমেলো চুলের জঙ্গল, চোখে মোটা কাচের কালো চশমা—দস্তুরমতো বন্য চেহারা। পরনে গেরুয়া কাপড়-জামা, বিবাহ করেনি। সংসারের ধরাবাঁধার ধার ধারে না—ধর্মালোচনায় আর তীর্থভ্রমণেই তার দিন কাটে—হুম, দুনিয়ায় কতরকম জীবই যে আছে! আমরা যেদিন বোকা বনবার জন্যে যামিনীকে গ্রেপ্তার করতে যাই, সেদিনও সে বাড়িতে ছিল না, শুনলুম তীর্থভ্রমণে গিয়েছে।

হঠাৎ গাত্রোত্থান করে জয়ন্ত বললে, ভো সুন্দরবাবু! আমাদের পানে তাকিয়ে এইবার বলুন—জাগো এবং ভাগো!

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হুম! তোমার কথার অর্থ?

—আরে মশাই, আপনি ছুটি পেয়েছিলেন মাত্র আধঘণ্টা কাল। এতক্ষণে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। চলো মানিক, আমরা পালাই—নইলে সুন্দরবাবুর কর্তব্যপালনে ত্রুটি হবে। আবার যথাসময়ে দেখা করব। নমস্কার!

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এক হপ্তা পরে। টেবিলের দুই প্রান্তে বিমর্ষের মতো উপবিষ্ট ধরণীধর ও সুন্দরবাবু। মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় এক-একটা চুমুক দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেউ যেন চায়ের স্বাদ পাচ্ছিলেন না।

এমন সময়ে দ্বারপথে আবার জয়ন্ত-মানিকের আবির্ভাব।

ধরণী চোখ তুলে একবার তাদের দেখলেন, তারপরেই বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

সুন্দরবাবু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, সেদিন তোমরা অমন অসভ্যের মতো চলে গিয়েছিলে বলে আমি দুঃখিত হয়েছি।

মানিক বললে, দুঃখিত! কেন দুঃখিত হয়েছেন? আমরা কি মামলাটার আনুপূর্বিক বিবরণ অতিশয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিনি?

—হুম শুনেছ বটে! কিন্তু পরমুহূর্তেই হ্যাঁ কি না কিছুই না বলে বেগে স্থানত্যাগ করনি?

ধরণীর মুখের পানে একবার সকৌতুকে অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে মানিক বললে, তা ছাড়া আর কী করবার উপায় ছিল সুন্দরবাবু? শ্রদ্ধেয় ধরণীবাবু কি আমাদের স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেননি যে, পেশাদার পুলিশ শখের-গোয়েন্দার সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে?

ধরণী বললেন, হ্যাঁ, তখনও বলে দিয়েছি, আবার এখনও তাই বলছি—আমার এক কথা!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—ভদ্রলোকের এক কথা। তা আমরা তো মশায়ের কাছে গায়ে পড়ে সাহায্য করবার জন্যে আসিনি, আমরা এসেছি আমাদের প্রিয়বন্ধু সুন্দরবাবুকে একটা খবর দিতে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী খবর?

এইবার জয়ন্ত বললে, আমরা গতকল্য জিয়াগঞ্জ থেকে ফিরেছি।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললে, তোমরাও জিয়াগঞ্জে গিয়েছিলে? কেন হে? সেখানে তো যামিনীকে কেউ চোখেও দেখেনি।

জয়ন্ত বললে, আরও ভালো করে খুঁজলে আপনারাও দুই-তিনজন এমন বৃদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান পেতেন, যারা যামিনী আর কামিনীকে জন্মাতে দেখেছে?

ধরণী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন,—আরও ভালো করে খোঁজবার কোনওই দরকার ছিল না—আমাদের যেটুকু জানবার তা জেনেছি। যত সব বাজে কথা! পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে যারা জিয়াগঞ্জে যামিনীকে জন্মাতে দেখেছে সেইসব বুড়োর বুকনি শুনে কলকাতায় বসে কোনও খুনের মামলার ফয়সালা করা যায় না।

—বলতে বাধ্য হলুম আপনার ধারণা ভুল! বুড়োদের মুখে কী খবর পেয়েছি জানেন? যামিনী আর কামিনী যমজ ভাই। তাদের চেহারার মিল এতটা বেশি যে, দুজনকে একই

পোশাক পরালে কে যামিনী আর কে কামিনী কেউ ধরতে পারত না। সুন্দরবাবু, এ তথ্যটুকু আপনার কোনও কাজে লাগবে কি?

সুন্দরবাবু প্রথমটা গম্ভীর বদনে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর সহসা লম্ফত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মূল্যবান তথ্য, মূল্যবান তথ্য! খুন করলে কামিনী, লোহার বালা পরলে যামিনী! বুঝতে পেরেছি!

—না সুন্দরবাবু, এখনও বোধহয় ব্যাপারটা আপনি তলিয়ে বুঝতে পারেননি। যা কিছু ঘটেছে, তাবৎ ব্যাপারের মূলে আছে একমাত্র যামিনীরই মস্তিষ্ক। কামিনী করেছে তারই আদেশ পালন। যামিনী জানত, স্বাভাবিকভাবে পুলিশের সন্দেহ তারই উপরে পড়বে। তাই পুলিশকে সে রীতিমতো নাকাল করতে চেয়েছিল। উপরন্তু প্রায় তারই মতো দেখতে কামিনীকে তার দরকার হয়েছিল, সদানন্দবাবুর বাড়িতে অবাধে প্রবেশ করবার সুবিধা হবে বলে।

—কিন্তু কোথায় সেই কামিনী?

—তা আমি জানি না। তবে এ ক্ষেত্রেও একটা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি। ধর্মপরায়ণ, তীর্থপর্যটক শ্যামাকান্তকে আবিষ্কার করুন। তার মাথাটা দীর্ঘ কেশপাশ থেকে মুক্ত করুন, তার চোখের উপর থেকে চশমার কালো কাচের আবরণ সরিয়ে ফেলুন, তার মুখ থেকে লম্বা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিন, তার গা থেকে গেরুয়া কাপড়-জামা কেড়ে নিন, হয়তো স্বচক্ষে দেখতে পাবেন যামিনীকান্তের যমজ ভাই কামিনীকান্তকে। হয়তো এ হচ্ছে আমার ভ্রান্ত ধারণা, কিন্তু এখনই আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, কিন্তু শ্যামাকান্তও যে খাঁচার বাইরে কোথায় উড্ডীয়মান হয়েছে, কে তার সন্ধান দেবে?

ধরণী গোঁ-ভরে নীরবে সব কথা শুনছিলেন, এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন, সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমাদের যে-সব সুযোগ-সুবিধা আছে, শখের গোয়েন্দাদের তা নেই। আমি ডাকঘরের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করতে পারি যে, যামিনীর বাড়ির সমস্ত চিঠিপত্র যেন বিলি করবার আগে আমাদের কাছে পাঠানো হয়। জয়ন্তবাবুর সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে আজ বা কাল না হোক, দুই কি চার কি ছয় মাসের মধ্যে কোনও-না কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমাদের কী মত জয়ন্ত?

—আমাদের আর কোনও মতামত নেই। এখন তবে আসি। চলো মানিক।

তিন মাস পরের ঘটনা।

জয়ন্তর প্রভাতী চায়ের আসর। সুন্দরবাবুর প্রবেশ—পিছনে পিছনে ধরণীবাবু।

কেউ কিছু বলবার আগেই সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত আজ তোমাদের চায়ের আসরে ধরণীবাবু অনাহূত অতিথি হতে চান।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য—পরম সৌভাগ্য! আসুন, বসুন,—ওরে মধু, জলদি চা নিয়ে আয়—টোস্ট আর এগপোচ আনতেও ভুলিস না যেন।

ধরণীবাবু বললেন, আজ চা পান হচ্ছে গৌণ ব্যাপার, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের অনেক কটু কথা শুনিয়েছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মশাই, কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ আপনার ক্ষমা প্রার্থনার কথা মনে হল কেন?

—সঠিক আপনার অনুমান! যামিনী শ্যামাকান্ত ওরফে কামিনীকে চিঠি লিখেছিল বোম্বাই শহরে। সে গ্রেপ্তার হয়েছে। ছোরার আঙুলের ছাপ মিলে গেছে অবিকল। যামিনীর সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল—ছদ্মবেশের ভিতর থেকে লোকের চোখে যা ধরা পড়ত না। যামিনীও এখন হাজতে। আপনি গোয়েন্দা বটে, কিন্তু অসাধারণ আর অতুলনীয়! ধন্য, ধন্য!

ডবল মামলার হামলা

আজকের প্রাতরাশটা হয়েছিল পুরোদস্তুর পূর্ণভোজনের সামিল। চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে একটি আরামসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করে ফেললেন ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু।

দৈনিক প্রভাতী খানাপিনার অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের ভার ছিল মানিকের ওপরে। সে সামনের টেবিলের উপর থেকে টেনে নিল খবরের কাগজখানা।

জয়ন্ত বার করলে তার রুপোর শামুকের নস্যদানি। সে একটিপ নস্য নাসিকার সাহায্যে আকর্ষণ করতেই সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, 'হুম! তোমার ওই নোংরা সেকেলে নেশাটা তুমি কি কস্মিনকালেও ছাড়তে পারবে না হে!'

জয়ন্ত বললে, 'কে বলে নস্য সেকেলে নেশা! সব ব্যাপারেই উঠতি-পড়তি আছে, নস্যেরও রেওয়াজ মাঝে কিছু কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নস্যের চলন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আপনি কি জানেন, এক ইংল্যান্ডেই বৎসরে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার নস্য তৈরি হয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম বলো কী হে! খামোকা পঁয়ষট্টি লাখ টাকা নস্যাৎ! বড়োই বড়োই অন্যায়।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। নস্য নোংরা নয় মশাই, নস্য হচ্ছে রাজকীয় নেশা, তার আভিজাত্য অতুলনীয়। নস্যের উৎপত্তি আমেরিকায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে কলম্বাস তার ব্যবহার দেখে এসেছিলেন। ষোলো শতাব্দীতে নস্যের আমদানি হয় ইউরোপে। তারপর সেখানকার বড়ো বড়ো রাজা-রানি, সেনাপতি, আমির-ওমরাহ, কবি, শিল্পী, অভিনেতা—এমনকি সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত নস্যের সেবাইত হয়ে পড়েন। আমি তো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের মতন ব্যক্তিও ছিলেন নস্যগতপ্রাণ। তাঁর সোনার নস্যদানি ছিল অসংখ্য, সেগুলিরও মোট দাম হবে লক্ষাধিক টাকা। নস্যের এত কদর কেন শুনবেন?'

সুন্দরবাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, 'না ভাই, এখন আমার নস্য কাহিনি শোনবার মতো ফুরসত নেই।'

—'কেন ত্বরা কীসের?'

—'তদন্ত।'

—'কীসের তদন্ত?'

—'আত্মহত্যার। এক ভদ্রলোক পুত্রশোকে আত্মহত্যা করেছেন। বিশেষ হন্তদন্ত হতে হবে না, কারণ জোর তদন্ত নয়, একান্ত সহজ। তবু একবার যেতে হবে।'

—'আপনার হাতে ওই খামখানা কীসের?'

—'এর মধ্যে ঘটনাস্থলের আর লাশের খানকয় ফটো আছে।'

—'একবার দেখি না।'

ফোটোগুলো নিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে যেন নিজের মনেই বলল, 'মৃতদেহের ডান হাতে রয়েছে একটা রিভলভার। ওইটেই বোধহয় আত্মহত্যার অস্ত্র। ডান হাতের মণিবন্ধে দেখা যাচ্ছে একটা হাতঘড়িও।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কোনও কোনও খেয়ালি লোকের ডান হাতেই হাতঘড়ি থাকে।'

—'তা থাকে বটে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে একটু বেশিরকম খেয়ালি বলেই মনে হচ্ছে!'

—'এ কথা বলছ কেন?'

—'মৃতদেহের সামনে রয়েছে দাবা-বোড়ের ছক। কয়েকটা ঘুঁটি এখনও ছকের উপরে সাজানো আছে। তাহলে কি হত্যার আগে ভদ্রলোক দু-এক চাল দাবা খেলে শখ মিটিয়ে ছিলেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। কারণ, মামলাটার প্রাথমিক তদন্তে গিয়েছিলেন আমার এক সহকারী। তবে ভদ্রলোক যে রিভলভারের গুলিতে মারা পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। গুলিটা তাঁর বক্ষ ভেদ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটটাও পাওয়া গিয়েছে।'

—'রিভলভার আর বুলেটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে।'

—'এখনই দেখাতে পারি, আমার গাড়ির ভিতরেই আছে।'

সুন্দরবাবুর হুকুমে একজন পাহারাওয়ালা একটা ছোটো ব্যাগ এনে দিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া রিভলভার, বুলেট ও আরও কোনও কোনও জিনিস।

জয়ন্ত খুব মন দিয়ে রিভলভার ও বুলেটটা পরীক্ষা করলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, মামলাটা মোটেই সহজ নয়।'

সুন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'তার মানে! তোমার কথায় সোজা বাঁকা হবে নাকি?'

—'রিভলভারটার মালিক ছিলেন তো মৃত ব্যক্তিই?'

—'তাই তো শুনেছি।'

—'তাহলে এটা হচ্ছে বড়োই জটিল মামলা। এ সম্বন্ধে আপনি আরও যা জানেন, শুনতে পেলে খুশি হব।'

অতঃপর জয়ন্তের অন্বেষণের ফলে নূতন যে রহস্যনাট্যের যবনিকা উঠে গেল, তা সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। একটা একান্ত সাধারণ মামলা কেবল অসাধারণ হয়েই উঠল না, তার উপরে আরোপিত হল আর একটা নতুন ও রোমাঞ্চকর মামলা, যা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, মামলাটা নিয়ে এখনও আমি মাথা ঘামাবার সময় পাইনি। আজ দুদিন সর্দিজ্বরে পড়ে আমি বিছানা নিয়েছিলুম। প্রাথমিক তদন্তের পর আমার সহকারী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটুকু ছাড়া আর কিছুই জানি না। শোনো—

যিনি আত্মহত্যা করেছেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। বয়স পঞ্চান্ন। তিনি দক্ষিণ বাংলার এক জমিদার, দেশ ছেড়ে উত্তর কলকাতায় বাস করতেন। বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র সন্তান সত্যেন্দ্র গত মাসে কলেরা রোগে মারা গিয়েছেন। প্রকাশ, তারপর থেকেই রবীন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনমরা হয়ে থাকতেন এবং তাঁর আত্মহত্যার আসল কারণও নাকি ওই পুত্রশোক।

'রবীন্দ্রবাবুর এক সহোদর দেশেই থাকতেন, কিন্তু তিনিও এখন পরলোকে এবং তাঁরও একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণই এখন রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বনিবনাও ছিল না, সম্পত্তি-সংক্রান্ত মতানৈক্যই নাকি এই মনোমালিন্যের কারণ।

'রবীন্দ্রবাবুর বাড়ি ত্রিতল। একতলা ব্যবহার করে জমিদার সেরেস্তার কর্মচারীরা এবং পাচক, দারোয়ান, দাসদাসী ও অন্যান্য লোকজন। দোতলায় বৈঠকখানা এবং তাঁর মৃত পুত্রও সেখানে থাকতেন। ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নগৃহ ছাড়া আর কোনও ঘর নেই।

'পরশু গিয়েছে কালীপূজার রাত্রি। শরীর সুস্থ ছিল না বলে রবীন্দ্রবাবু সেদিন সন্ধ্যার পরেই ত্রিতলে উঠে যান এবং পরদিন সকালেই ঘরের ভিতরে পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। ঘরের দরজা খোলাই ছিল—যদিও তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রবাবুর দরজা খুলে শয়ন করার অভ্যাস ছিল না।

'বাড়ির লোকজনরা বলে, রবীন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল বলে সন্ধ্যার পর আর কোনও লোক সেদিন ত্রিতলের ঘরে যায়নি। অন্যান্য দিনেও সে ঘরে একজন ছাড়া আর কোনও বাইরের লোকের প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না। সেই একজন হচ্ছেন সত্যানন্দ বসু, রবীন্দ্রবাবুর প্রধান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অন্য পাড়ার বাসিন্দা, প্রায়ই রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। রবীন্দ্রবাবুর দাবাখেলার শখ ছিল অত্যন্ত প্রবল, সত্যানন্দবাবুর আবির্ভাব হলেই দুজনে দাবার ছক পেতে বসে যেতেন। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলেছে, ঘটনার দিন সত্যানন্দবাবু একবারও সেই বাড়িতে পদার্পণ করেননি।

'নিজের হাতে রিভলভার ছুড়ে রবীন্দ্রবাবু আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু বাড়ির কেউ রিভলভারের শব্দ শুনতে পায়নি; অন্তত শুনতে পেলেও বুঝতে পারেনি, কারণ সেদিন ছিল কালীপূজা,— বোমার ও বাজির দুমদাম শব্দে সারা শহর হয়ে উঠেছিল মুখরিত।

'রবীন্দ্রবাবুর ভাইপো দীনেন্দ্র খবর পেয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। সত্যানন্দবাবুকেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আজ তদন্তে গিয়ে প্রথমেই তাঁদের এজাহার গ্রহণ করব।'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও যদি সঙ্গে যাই, তাহলে আপনার কোনও আপত্তি আছে?'

—'মোটেই না, মোটেই না। মানিকও যেতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ তোমার এই আগ্রহের কারণ কী? কোনও সূত্র-টুত্র পেয়েছ নাকি?'

—'যথাসময়েই জানতে পারবেন।'

—'ওই রোগেই তো ঘোড়া মরছে! এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন বাবা!'

জয়ন্ত জবাব দিল না।

রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ি। সদর দরজায় পুলিশ পাহারা।

দোতলার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট দুই ভদ্রলোক। একজন প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা লম্বা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, চোখে কালো চশমা, দোহারা, পরনে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। একান্ত বিষণ্ণ ভাবভঙ্গি।

আর একজন যুবক, বয়স বাইশের বেশি নয়, সুশ্রী ফরসা, একহারা দেহ, জামাকাপড়ে বাবুয়ানার লক্ষণ। মুখ চোখ ভাবহীন।

যুবকের দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'আপনিই বোধহয় দীনেন্দ্রবাবু।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আর উনি?'

—'সত্যানন্দবাবু—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ বন্ধু।'

—'উত্তম। বাড়ির আর সবাইকে ডাকুন। আমি সকলের এজাহার নেব।'

সকলেরই আবির্ভাব। একে একে প্রত্যেকেই এজাহার দিল। বিশেষ কোনও নতুন তথ্য প্রকাশ পেল না।

এইবারে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দীনেন্দ্রবাবু, আপনার জ্যাঠা কি ন্যাটা ছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর বাঁ হাতই বেশি চলত।'

—'তাই তিনি ডান হাতেই কবজি-ঘড়ি ব্যবহার করতেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের মনোমালিন্যের কারণ কী?'

কিঞ্চিত ইতস্তত করে দীনেন্দ্র বললে, 'মনোমালিন্যের উৎপত্তি হয় তিনটি মুক্তোর জন্যে।'

—'তিনটি মুক্তো!'

—'হ্যাঁ, তিনটি মহামূল্যবান মুক্তো।'

—'ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।'

—'বুঝিয়ে বলছি। আমার প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্যেই আমাদের বংশের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সিপাহি বিপ্লবের সময়ে তিনি ইংরেজ ফৌজে রসদবিভাগের পদস্থ কর্মচারী হয়ে পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন। সেই দেশব্যাপী অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার যুগে কী উপায়ে জানি না, তিনি প্রচুর ধনদৌলতের মালিক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল তিনটি অপূর্ব ও অমূল্য মুক্তো—শুনেছি তিনি তা পেয়েছিলেন কোনও ভাগ্যহীন নবাবের কাছ থেকে। মুক্তো তিনটি আমিও দেখেছি। দুটির আকার পায়রার ডিমের মতো, একটি আরও বড়ো। তেমন বড়ো বড়ো মুক্তো আমি আগে কখনও দেখিনি, আজকের বাজারে তাদের দাম অন্তত দুই-আড়াই লক্ষ টাকাও হতে পারে। এই মুক্তো তিনটি আমার পিতামহের অধিকারে আসে উত্তরাধিকার সূত্রে। তারপর আমার জ্যাঠামশাই ও আমার পিতা দুজনেরই দাবি ছিল তাদের উপরে। কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার বাবার দাবি অগ্রাহ্য করে বলেন, তার বাবা ওই মুক্তো তিনটি কেবল তাঁকেই দিয়ে গিয়েছেন। এই নিয়েই প্রথমে মনোমালিন্য, তারপর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, 'বটে, এমন ব্যাপার! সে মুক্তো তিনটি এখন কোথায় আছে?'

—'শুনেছি জ্যাঠামশায়ের শোবার ঘরে লোহার সিন্দুকে। কিন্তু সে ঘর তো এখন পুলিশের জিম্মায়।'

সুন্দরবাবু করলেন একটি নিষ্ঠুর প্রশ্ন, 'তাহলে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর ফলে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন?'

দীনেন্দ্র বিরক্ত মুখে বললে, 'লাভ-লোকসানের হিসাব এখনও আমি খতিয়ে দেখিনি মশাই।'

—'কিন্তু পুলিশ তা দেখতে বাধ্য।'

—'দেখুক।'

জয়ন্ত এইবারে সত্যানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর জন্যে আপনি বড়োই কাতর হয়ে পড়েছেন।'

সত্যানন্দ করুণ স্বরে বললেন, 'কাতর হব না! তিনি আর আমি ছিলুম হরি-হর আত্মার মতো; বহু সুখ-দুঃখের দিন আমাদের একসঙ্গে কেটে গিয়েছে।'

—'তাহলে আপনারা ছিলেন পুরাতন বন্ধু?'

—'না, ঠিক তা বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছর চারেক আগেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে উঠেছিল পুরাতন বন্ধুদের মতো।'

—'রবীন্দ্রবাবু আপনার সঙ্গে দাবা খেলা ভালোবাসতেন!'

—'হ্যাঁ, আমি এলেই তিনি পাড়তেন দাবার ছক।'

—'রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর দিনেও তাঁর সঙ্গে আপনি দাবা খেলেছিলেন?'

—'আজ্ঞে না। সেদিন আমি নিজের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই পারিনি!'

—'কেন?'

—'অসুস্থতার জন্যে। উদারময়।'

—'কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে বা পরে রবীন্দ্রবাবু দাবা খেলেছিলেন।'

অত্যন্ত বিস্মিতের মতো সত্যানন্দ নিজের দীর্ঘ দাড়ির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করতে করতে বললে, 'কেমন করে জানলেন?'

—'তাঁর মৃতদেহের সামনে পাতা ছিল দাবার ছক, আর সেই ছকের উপরে সাজানো ছিল গোটা কয়েক ঘুঁটি।'

—'ও, তাই বলুন! তা হতে পারে। যারা দাবা খেলতে অভ্যস্ত, তারা মাঝে মাঝে নতুন চালের কৌশল আবিষ্কার করবার জন্যে একা একাই ছকে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে।'

—'ঠিক। সেটা আমিও জানি। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই!'

সুন্দরবাবু সদলবলে প্রথমে বাড়ির একতলার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

তারপর দ্বিতল। চারখানা বাস করবার ঘর, তারপর পায়খানা ও গোসলখানা। বাইরের দিকে একফালি বারান্দা থেকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, নীচের একটা শুঁড়িগলির ভিতরে নেমে গিয়েছে।

জয়ন্ত শুধাল, 'এই সিঁড়িটা বোধহয় মেথরের ব্যবহারের জন্য?'

দীনেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ!'

—'নীচের শুঁড়িগলিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

—'বাড়ির বাইরেকার রাস্তায়।'

—'কোনও লোক যদি সদর দরজার বদলে ওই শুঁড়িগলি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে, তাহলে বাড়ির লোক তাকে দেখতে পাবে না—তাই নয় কি?'

—'হ্যাঁ।'

তারপর ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নকক্ষ। তালাবন্ধ দরজার চাবি ছিল পুলিশের কাছে। দরজা খুলে সকলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে খাট, একদিকে ড্রেসিংটেবিল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড আলমারি এবং একদিকে একটা ভারী সেকেলে ডালা-দেওয়া লোহার সিন্দুক। খান দুই চেয়ার কার্পেট-মোড়া মেঝেয় ছোটো বিছানা পাতা। গুটি দুই তাকিয়া।

মৃতদেহ 'মর্গে' পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মেঝের বিছানার একাংশে ও একটা তাকিয়ার উপরে

রয়েছে শুকনো রক্তের ছোপ। বিছানার মাঝখানে দাবার ছক, তার উপরেও আশেপাশে কতকগুলি ঘুঁটি।

সুন্দরবাবু বললেন, 'দীনেন্দ্রবাবু, এইবারে আপনি সিন্দুক খুলে মুক্তো-টুক্তো কী আছে বার করুন। আমরা এখনও সিন্দুক পরীক্ষা করিনি! এই নিন রবীন্দ্রবাবুর চাবির গোছা, এটা লাশের পাশেই পাওয়া গিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'সাবধান দীনেন্দ্রবাবু, আপনি সিন্দুকের হাতলে হাত দেবেন না, চাবিটা আমাকে দিন, আমি সিন্দুক খুলছি।'

সুন্দরবাবু কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্তের চোখের ইশারা দেখেই তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

সিন্দুকের মধ্যে তথাকথিত একটিমাত্র মুক্তোও আবিষ্কৃত হল না। পরিবর্তে পাওয়া গেল একতাড়া দলিল-দস্তাবেজ, অন্যান্য কাগজপত্র, একশো টাকার বারোখানা নোট, কতকগুলো পুরাতন মোহর ও কিছু খুচরা টাকা প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র বললে, 'কী আশ্চর্য! মুক্তোগুলো কে নিলে?'

সত্যানন্দ বললেন, 'কে আবার নেবে বাবা! তোমার জ্যাঠা ছেলের শোকে আত্মঘাতী হয়েছেন, বাইরের কেউ এখানে আসেনি, চোর এলে কি অতগুলো টাকা আর মোহর সিন্দুকের ভেতরেই ফেলে রেখে যেত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক কথা। পায়রার ডিমের মতো ডাগর ডাগর মুক্তো যদি রূপকথার অশ্বডিম্ব না হয়, তাহলে সেগুলো অন্য কোথাও লুকানো আছে, খুঁজে দেখতে হবে।'

সুন্দরবাবুর গা টিপে দিয়ে জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পিছু-পিছু গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আবার গা টেপাটেপি কেন? তোমার আবার কী গুপ্তকথা?'

—'সিন্দুকের হাতলে কারুর আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করে দেখুন।'

—'মানে?'

—'পরে বুঝবেন।'

দিন দুই পরে 'দূরভাষে'র মধ্যস্থতায় শ্রুতিগোচর হল থানায় বিরাজমান সুন্দরবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর 'হ্যালো! জয়ন্ত শোনো, তুমি যা বলেছ তাই!'

—'আমি কী বলেছি?'

—'রবীন্দ্রনারায়ণ রায় আত্মহত্যা করেনি।'

—'নবীন সহকারীর ওপর নির্ভর না করে একটু মাথা ঘামালে আপনিও এটা বুঝতে পারতেন।'

—'আমি কিন্তু তোমারও চেয়ে বড়ো একটা আবিষ্কার করেছি।'

—'আপনাকে অভিনন্দন দিচ্ছি।'

—'তারপর থেকে আমার অবস্থা হয়েছে কী-রকম জানো; যাকে বলে একেবারে সসেমিরা।'

—'ভাবনার কথা।'

—'সব শুনলে তোমারও আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যাবে।'

—'ভয়ের কথা!'

—'ফোন ছেড়ে সবেগে থানায় ছুটে এসো।'

—'যথা আজ্ঞা।'

থানায় গিয়ে জয়ন্ত দেখলে, সুন্দরবাবু তখনও উত্তেজিতভাবে ঘরের ভিতর পদচালনা করছেন।

—'ভো সুন্দরবাবু, অতিথি হাজির। আপনার সন্দেহ পরিবেশন করুন।'

—'তিষ্ঠ ক্ষণকাল। রবীন্দ্রবাবু যে আত্মহত্যা করেননি, সেটা তুমি কেমন করে ধরতে পারলে আগে সেই কথাই বলো।'

—'দেখলুম মৃতের ডান হাতে রয়েছে হাতঘড়ি। কোনও কোনও খেয়ালি ব্যক্তি ডান হাতেও ঘড়ি ধারণ করে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। সাধারণত যারা ন্যাটা, অর্থাৎ ডান হাতের কাজ সারে বাম হাতে, তারাই হাতঘড়ি ব্যবহার করে ডান হাতে। অতএব ধরে নিলুম রবীন্দ্রবাবু ন্যাটা। সে ক্ষেত্রে বাম হাতে রিভলভার নিয়েই তাঁর আত্মহত্যা করবার কথা। কিন্তু রিভলভার ছিল তাঁর ডান হাতে। তাই দেখেই প্রথমে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়। কিন্তু তা হচ্ছে সামান্য সন্দেহ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।'

—'বেশ তারপর?'

—'তারপর দেখলুম মৃতের সামনে দাবার ছক। যে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, তার মনের অবস্থা হয় ভয়ানক অস্বাভাবিক, তার দাবা খেলবার বা নতুন চাল আবিষ্কার করবার শখ কিছুতেই হতে পারে না। রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয় সেদিন সহজ আর স্বাভাবিক মন নিয়েই আর কারুর সঙ্গে দাবা খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। আত্মহত্যার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। সুতরাং—'

—'সুতরাং তোমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল, কেমন এই তো!'

—'হ্যাঁ। তারপর রিভলভার আর বুলেট দেখেই নিঃসন্দেহে আমি বুঝতে পারলুম যে, এটা হচ্ছে আত্মহত্যার নয়, নরহত্যার মামলা। রবীন্দ্রবাবুর হাতের রিভলভারটা ছিল ২২-ক্যালিবারের ছোটো রিভলভার, তার ভিতর থেকে ৩৮-ক্যালিবারের বুলেট নির্গত হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যে বুলেটটা হয়েছে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা বেরিয়েছে কোনও ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার থেকে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাহলে হত্যার কারণ চুরি?'

—'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

—'তবে সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা আর মোহরগুলো চুরি যায়নি কেন?'

—'এই খুনে চোর হচ্ছে অতিশয় চতুর। সে পুলিশকে ভুল পথে চালাতে চায়। সে লাভ করতে চায় তিন-তিনটি মহামূল্যবান অতুলনীয় মুক্তো, তার কাছে কয়েক শত টাকা তুচ্ছ। সে দেখাতে চায় চুরি বা হত্যা করবার জন্য কেউ ঘটনাস্থলে আসেনি। তাই রবীন্দ্রবাবুর হাতে তাঁর নিজের রিভলভার গুঁজে দিয়ে আর টাকাগুলো ফেলে রেখে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে ভেবে দেখতে পারেনি যে, ন্যাটা রবীন্দ্রবাবুর ডান হাতে রিভলভার থাকতে পারে না—বিশেষত ২২-ক্যালিবারের রিভলভার। তার আরও একটা মস্ত ভ্রম হয়েছে। দাবার ছক আর ঘুঁটি সে তুলে রেখে যায়নি। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই এমনি সব ছোটোখাটো ত্রুটি থেকে যায় বলেই হত্যাকারী শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না।'

—'জয়ন্ত, অনেক কথাই তো তুমি ভেবে দেখেছ। কিন্তু তুমি কি বলতে পারো হত্যাকারী কে?'

—'বাড়ির লোকদের কথা মানলে বলতে হয়, বাহির থেকে কোনও ব্যক্তিই সেদিন বাড়ির ভিতরে আসেনি। অথচ সেদিন রবীন্দ্রবাবুর পরিচিত কোনও লোক তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, সেই খেলোয়াড় ব্যক্তি কে?'

—'আমি জানি সে কে!'

—জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি জানেন!'

—'নিশ্চয়! তোমার আগেই আমি তাকে আবিষ্কার করেছি।'

—'বাহাদুর! কিন্তু কে সে?'

—'বাড়ির কেউ নয়।'

—'দীনেন্দ্র?'

—'না।'

—'সদানন্দ?'

—'সেও নয়!'

—'তবে?'

—'তার নাম নফরচন্দ্র প্রামাণিক।'

স্তব্ধ ভাবে স্থির হয়ে বসে রইল জয়ন্ত—নির্বাণনিষ্কম্প দীপশিখার মতো। কিন্তু মস্তিষ্ক চালনা করতে লাগল তুরন্ত গতিতে, তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, 'বুঝেছি! আপনার এই আবিষ্কারের মূলে আছে আমারই অভিভাবন!'

—'অভিভাবন! সে আবার কী চিজ!'

—'সাজেশান'-এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে অভিভাবন।'

—'মাথায় থাক তোমার বাংলা পরিভাষা, এর চেয়ে ইংরেজিই ভালো! কিন্তু আমার আবিষ্কারের সঙ্গে তোমার সাজেশান-এর সম্পর্ক কী?'

—'আমি কি আপনার কাছে প্রস্তাব করিনি যে রবীন্দ্রবাবুর লোহার সিন্দুকের হাতলটা আঙুলের ছাপের জন্যে পরীক্ষা করা হোক।'

—'তা করেছিলে।'

—'তা করা হয়েছে কি?'

—'হুঁ।'

—'আর তারই ফলে বোধকরি তথাকথিত নফরচন্দ্র প্রামাণিক নামধেয় ব্যক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে?'

সুন্দরবাবু ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, 'ভায়া হে, তোমার উপরে টেক্কা মারা অসম্ভব দেখছি! হ্যাঁ, ঠিক তাই! সিন্দুকের হাতলে ছিল আঙুলের ছাপ। পুলিশের ফাইলে সেই আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া গেছে! সে ছাপ হচ্ছে নফরচন্দ্র প্রামাণিকের।'

—'ওই মহাপুরুষের পরিচয় কী?'

—'অতিশয় চিত্তোত্তেজক। পুলিশের কাছে রক্ষিত অপরাধীদের ইতিহাসে দেখি, সাত বৎসর

আগে নফরচন্দ্র একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তার পর-বৎসরেই দু-দুটো খুন আর অর্থলুণ্ঠন করে সে আবার অভিযুক্ত হয় রাহাজানির মামলায়। বিচারে তার প্রতি পনেরো বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে সে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই নফরচন্দ্র ফেরার। যে তাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে!'

—'আপনি তাকে দেখেছেন?'

—'না, তার কোনও মামলাই আমার হাতে আসেনি।'

—'নফরচন্দ্র যখন দাগি আসামি, পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই তার ফোটো আছে?'

—'আছে বইকি! এই নাও।'

শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সাধারণ চেহারার লোক—সুশ্রী বা কুশ্রী কিছুই বলা যায় না। কেবল জোড়া ভুরুর তলায় দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ক্রূরতার আভাস। বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

সুন্দরবাবু অভিযোগপূর্ণ স্বরে বললেন, 'আত্মহত্যার মামলা হয়ে দাঁড়াল নরহত্যার মামলা—তার সঙ্গে এল আবার তিন-তিনটে হত্যাকাণ্ডের নায়ক ফেরারি নফরচন্দ্রের মামলা! বাপরে, এখন এই ডবল মামলার হামলা একলা সামলাই কেমন করে? নফরের মতো ধড়িবাজের পাত্তা পাওয়া কি সোজা কথা? পুলিশের কেউ যা পারেনি, আমি তা পারব কেন?'

তীক্ষ্ণনেত্রে নফরচন্দ্রের ফোটোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে,—'সুন্দরবাবু আপনার বকবকানি থামান। এখানে স্বচ্ছ কাগজ আছে?'

—'স্বচ্ছ কাগজ?'

—'হ্যাঁ, ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রেসিং পেপার।'

—'মরছি নিজের জ্বালায়, এখন তোমার ওই সব ফাঁকা বাংলা বুলি ভালো লাগছে না! কেন সোজাসুজি বলতে পারো না কি—ট্রেসিং পেপার চাই? তা থাকবে না কেন? কিন্তু ও জিনিস নিয়ে তোমার আবার কী হবে?'

'একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।'

জয়ন্তের অল্প-স্বল্প ছবি আঁকার হাত ছিল। সুন্দরবাবুর দিকে পিছন ফিরে বসে ফাউন্টেন পেন ও ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সে ফটো থেকে নফরচন্দ্রের একখানা হুবহু প্রতিলিপি তুলে নিলে। তারপর সেই নকল-করা মুখের উপরে যথাস্থানে এঁকে ফেললে লম্বা চুল, কালো চশমা, ঘন গোঁফদাড়ি।

সুন্দরবাবু বিরক্তভাবে বললেন, 'আরে গেল, ও আবার কী ছেলেমানুষি হচ্ছে শুনি?'

—'সুন্দরবাবু এখন দেখুন দেখি, এই লোকটিকে কি চেনেন বলে মনে হচ্ছে?' জয়ন্ত প্রশ্ন করলে কৌতুকপূর্ণকণ্ঠে।

সুন্দরবাবু প্রথমে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই ছবিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর দেখতে দেখতে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চক্ষু। তিনি চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আরে আরে, এ যে রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু সত্যানন্দ বসুর মুখ।'

জয়ন্ত রুপোর শামুকদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে হাস্যমুখে বললে, 'ছবিতে আঁকা মুখে লম্বা চুল, কালো চশমা আর গোঁফদাড়ি বসিয়ে দিতেই নফরচন্দ্রের মূর্তির ভিতরে থেকে আত্মপ্রকাশ

করেছে সত্যানন্দ স্বয়ং! এমন যে হবে আমি তা আগেই অনুমান করেছিলুম। আমি নফরকে চিনতুম না, তার জীবনীও জানতুম না, কিন্তু এই মামলার সমস্ত দেখে শুনে আমি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিলুম সত্যানন্দকেই! চেহারার রকমফের করে নাম ভাঁড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নফরচন্দ্র বহাল তবিয়তে হতভাগ্য রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিতালি জমিয়ে ফেলেছিল—প্রথম থেকেই তার কুদৃষ্টি ছিল সেই মুক্তো তিনটির উপরে। সকলের অগোচরে শুঁড়িপথ দিয়ে ঢুকে মেথরের সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে পাপকার্য সেরে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু এইবার তাকে মুখোশ খুলতে হবেই। নফরচন্দ্র এখনও আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে—কারণ এখনও সে সন্দেহ করতে পারেনি যে, আমরা তাকে সন্দেহ করেছি। সুতরাং উঠুন, জাগুন! ছুটুন সবাই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের আস্তানার দিকে।'

—'হুম! তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু!'

নফর ওরফে সত্যানন্দের বাড়ি।

চারিদিকে পুলিশ পাহারা বসিয়ে সদরে কড়া নাড়তে নাড়তে সুন্দরবাবু ডাকলেন, 'সত্যানন্দবাবু!'

বারান্দা থেকে উঁকি মারলে সত্যানন্দের মুখ। পুলিশ দেখে তার ভাবান্তর হল না। সহজ সুরেই শুধোলে, 'অধীনের গোলামখানায় আপনারা যে!'

—'মামলা সংক্রান্ত একটা জরুরি কথা জানতে এসেছি।'

—'বেশ করেছেন। বেয়ারা গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে। সোজা উপরে চলে আসুন।'

দোতলার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে সুন্দরবাবু, তারপর জয়ন্ত, তারপর আরও দুজন পুলিশ কর্মচারী।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ হাসিমুখে বললে, 'অনুগ্রহ করে সকলে আসন গ্রহণ করুন।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'বসবার সময় নেই।'

—'কিন্তু আপনারা কী জরুরি কথা জানতে চান? যা বলবার সব তো আমি বলেছি!'

—'কিন্তু একটা কথা বলেননি।'

—'কী?'

—'আপনি নফরচন্দ্র নামটা ত্যাগ করলেন কেন?'

পর মুহূর্তে সুন্দরবাবুর বক্ষের উপরে নিক্ষিপ্ত হল যেন দুর্যোধনের মহাগদা! আচম্বিতে নফরচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সুন্দরবাবুর বুকের মাঝখানে করলে পদাঘাত এবং বপুষ্মান সুন্দরবাবুর দেহ ঠিকরে গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে একেবারে জয়ন্তের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও গুরুভার দেহপতনের শব্দ।

মেঝের উপরে অল্প ছটফট করেই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের মূর্তি নিশ্চেষ্ট ও একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার কপাল থেকে বেরুতে লাগল ঝলকে ঝলকে রক্ত।

সুন্দরবাবু আপশোশ করে বলে উঠলেন, 'হায় হায় হায়! নফরা আমাকে লাথি মেরেও ফাঁকি দিলে, ব্যাটাকে ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে পারলুম না! ছি জয়ন্ত! ওকে তোমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'উচিত তো ছিল, কিন্তু আপনি এমন কলমির মতন আমাকে জড়িয়ে

ধরেছিলেন যে আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ। তবে আপনার এ-কুল ও-কুল দু-কুল নষ্ট হয়নি, নফরচন্দ্রের লাশ দাখিল করতে পারলেও আপনার ভাগ্যে লাভ হবে পুরস্কারের পঞ্চসহস্র মুদ্রা।'

পুরস্কারের কথা মনে হতেই সুন্দরবাবু একমুখ হাস্য করলেন। তারপর বুকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'নফর তো পটল তুলল, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর মুক্তো তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখে গেল।'

জয়ন্ত বললে, 'আশা করি এখানে খানাতল্লাশ করলেই মুক্তো পাওয়া যাবে। আর নফরের হাতের ওই রিভলভারটা দেখুন! আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রবাবু মারা পড়েছেন ওই রিভলভারের বুলেটেই।'

কুবের পুরীর রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রধান পাত্রগণের পরিচয়

বিমল ও কুমার স্থির করেছে, এ-জীবনে তারা বিবাহ্ করবে না!

সকলেই জানেন, তাদের জীবন হচ্ছে মহা-ডানপিটের জীবন এবং সে জীবন হচ্ছে সত্যসত্যই পদ্মপাতায় জল বিন্দুর মতো,—যে-কোনও মুহূর্তে টুপ করে ঝরে পড়তে পারে! যে-সব ভয়াবহ বিপদ মানুষের কল্পনারও অতীত, তাদেরই সঙ্গে দিন-রাত তাদের কারবার। তারা কখনও পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে যায় এবং যখন পৃথিবীতেও থাকে তখন কখনও যায় ময়নামতীর মায়া-কাননে আদিম দানব-জীবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কখনও মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যকের ধনের সন্ধানে আসামের পরিত্যক্ত বৌদ্ধমঠে বা আফ্রিকার অসভ্য মানুষ ও সিংহ-হিপো-গরিলার দেশে এবং কখনও হিমালয়ের মেঘাবৃত শিখরে উঠে দেখা করে ভয়ঙ্কর নর-দৈত্যদের সঙ্গে।

এমন অসাধারণ জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতো বিবাহ্ করা চলে না। কোথায় থাকবে তারা, আর কোথায় থাকবে তাদের বউ? হয়তো কবে তারা উত্তর-মেরুর তুষার-মরুর মধ্যে পথ হারিয়ে শ্বেত-ভাল্লুকদের দেশে মাসের পর মাস প্রবাস-যাপন করতে বাধ্য হবে, আর এদিকে তাদের বউরা ঘরের কোণে বসে চোখের জলে বুক ভাসাতে থাকবে! হয়তো কবে তাদের খেয়াল হবে চন্দ্রলোকে যাবার জন্যে, আর খেয়ালমতো কাজ করে এ-জন্মে আর দেশে ফিরে আসা হবে না! তখন স্বামী থাকতেও তাদের বউদের হতে হবে অনাথা বিধবার মতো! এইসব বুঝে-সুঝেই তারা পণ করে বসেছে, এ-জীবনে কোনওদিন টোপরও পরবে না—গাঁটছড়াও বাঁধবে না!

কিন্তু তারা ধনী এবং বিখ্যাত! তাদের নাম জানে না দেশে এমন লোক নেই। এ-রকম দুটি সৎপাত্র যে চিরকুমার হয়ে পাওনাগণ্ডা থেকে তাদের ফাঁকি দেবে, ঘটকঠাকুররা মোটেই এমন অভাবিত ব্যাপার ভাবতে রাজি নন!

অতএব ঘটকের দল বিমল ও কুমারকে প্রায়ই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। কিন্তু তারা যে কী উপায়ে ঘটকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে, আজকের এই ঘটনা থেকেই সেটা বেশ জানা যাবে।

কুমার চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে ও বিমল দুই চক্ষু মুদে টেবিলের উপরে দুই পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে বসে শুনছে, এমন সময়ে আচম্বিতে হল এক ঘটকের আবির্ভাব।

কুমারের শিথিল হাত থেকে ফস করে খসে পড়ল খবরের কাগজ এবং বিমলের পা দুটো আবার টপ করে নেমে পড়ল টেবিলের তলায়! ঘটকঠাকুর তার সাড়ে-তেরোটা তালি-মারা বাঁটভাঙা বেরঙা ছাতাটা সযত্নে ক্রোড়দেশে রক্ষা করে একখান চেয়ারের উপরে এমন জাঁকিয়ে উপবেশন করলে যে বেশ বোঝা গেল, অতঃপর বহুক্ষণের মধ্যে সে আর ওঠবার নাম মুখেও

আনবে না! দুই বন্ধুর অবস্থা হল বিরাট হাউইটজার কামানের মুখে অসহায় দুই আসামির মতো!

বিমল ও কুমার অনেকক্ষণ ধরে আপত্তি জানিয়েও সেই নাছোড়বান্দা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঘটককে বিদায় করতে পারলে না।

বিমল তখন নাচার হয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি বিয়ে করতে রাজি! কিন্তু বউটি আমার মনের মতো হওয়া চাই।'

ঘটক খুব খুশি হয়ে আনন্দ-গদগদ স্বরে বললে, 'আমার হাতে সবচেয়ে ভালো যে পাত্রীটি আছে, তাকে নিশ্চয়ই আপনার পছন্দ হবে। সে তো যে সে বউ নয়, একেবারে ডানাকাটা পরী!'

বিমল গম্ভীর হয়ে বললে, 'পাত্রী এরোপ্লেন চালাতে জানে?'

ঘটক আকাশ থেকে পড়ে বললে, 'সে কী বাবু, বাঙালির মেয়ে এরোপ্লেন চালাবে কী?'

—'পাত্রী বন্দুক ছুড়তে পারে?'

ঘটক মাথা নেড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই পারে না। তবে আপনি শেখালে শিখতে পারে।'

—'সে ঘোড়ায় চড়তে, কুস্তি আর বক্সিং লড়তে পারে?'

ঘটক বিস্ময়ের চরমে উঠে বললে, 'ঘরের বউ কুস্তি লড়বে কী!'

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, 'তাহলে আপনি পথ দেখতে পারেন। যে-মেয়ে ও-সব বিদ্যে জানে না, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব।'

ঘটক কুমারের দিকে ফিরে বললে, 'মশায়েরও কি ওই মত?'

কুমার বললে, 'আমরা দুজনে একসঙ্গে খাই, একসঙ্গে বেড়াই, একসঙ্গে ঘুমোই—মরবারও সাধ আছে একসঙ্গে। কাজেই আমাদের মতামতও একরকম।'

ঘটক তবু হাল ছাড়তে রাজি না হয়ে বললে, 'কিন্তু—'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'আর কিন্তু-টিন্তু নয়! আপনার বিদায় নিতে দেরি হচ্ছে বলে ওই দেখুন বাঘা নিজেই খবরদারি করতে এসেছে!'

ঘটক ফিরে দেখলে ঠিক তার চেয়ারের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড একটা কুকুর, মস্ত মস্ত ধারালো দাঁত বার করে! সে দাঁতগুলো দেখবার পরেও আর কোনও যুক্তি দেখানো চলে না! অতএব ঘটক হতাশ ভাবে উঠে ঘর থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

কুমার হাসতে হাসতে আবার খবরের কাগজখানা তুলে নিলে এবং বিমল আবার দুই চক্ষু মুদে টেবিলের উপরে দুইপা তুলে দিলে। কিন্তু কুমার পড়া শুরু করবার আগেই পুরাতন ভৃত্য রামহরি ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'খোকাবাবু, একটি বাবু দেখা করতে চান।' বিমল আজ আর খোকা নয়, কিন্তু রামহরি তার পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে নারাজ।

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, 'আবার কোন মহাপ্রভু জ্বালাতে এলেন? ঘটক-টটক নয় তো?'

কুমার বললে, 'তাহলে হয়তো কোনও কনের বাপ এসেছে! ঘটকের কাছে পার আছে কিন্তু কনের বাপের হাত ছাড়ানো সোজা নয়! হয়তো এসেই দু পা জড়িয়ে ধরবে!'

শুনেই বিমল চমকে উঠে টেবিলের উপর থেকে নিজের পা দুটো নামিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি আবার চেয়ারের তলায় ঢুকিয়ে দিলে!

রামহরি হেসে ফেলে বললে, 'না, যে-বাবুটি এসেছেন, সে-বাবুটি তোমাদেরই বয়সি হবেন। এত কম-বয়সে কেউ কনের বাপ হতে পারে না!'

রামহরি বললে, 'না, বাবুটিকে ঘটক বলে তো মনে হচ্ছে না!'

বিমল আশ্বস্ত স্বরে বললে, 'আচ্ছা, লোকটিকে নিয়ে এসো।'

ঘরের ভিতরে যে-লোকটি এসে ঢুকল তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। জোয়ান চেহারা, ফরসা রং।

আগন্তুক ঘরে ঢুকেই বললে, 'আপনি বিমলবাবু, আর আপনি কুমারবাবু তো? কাগজে আপনাদের ফটো আমি দেখেছি।'

কুমার হেসে বললে, 'দেখছি আমরা বড়োই বিখ্যাত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আপনার নাম আর এখানে আসবার কারণ তো আমরা জানি না।'

আগন্তুক বললে, 'আমার নাম হচ্ছে দিলীপকুমার চৌধুরী, দেশ রাধানগর। বিশেষ এক বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।'

বিপদের নাম শুনেই বিমল সাগ্রহে উঠে সোজা হয়ে বসল।

কুমার বললে, 'বিপদে পড়ে আমাদের মতো অচেনা লোকের কাছে এসেছেন কেন?'

দিলীপ বললে, 'আপনাদের সঙ্গে চোখোচোখি দেখা না হলেও বাংলা দেশের কারুর কাছেই আপনারা বোধ হয় অচেনা নন। আপনাদের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ কে না জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই বিপদে আপনারা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

কুমার বললে, 'তাহলে আর বাজে কথা না বলে, গোড়া থেকে আপনার বিপদের সব কথা খুলে বলুন। কিছু লুকোবেন না, কারণ সমস্ত না জানলে আমরা আপনার কোনও উপকারেই লাগব না।'

দিলীপ বললে, 'মশাই, এসে পর্যন্ত দেখছি, একটা মস্ত-বড়ো বিশ্রী কুকুর দরজার ফাঁক দিয়ে কটমট করে আমার পানে তাকিয়ে আছে! ওটাকে তাড়িয়ে দিন, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কোনও কথা বলতে পারব না।'

কুমার ফিরে দেখলে, তাদের প্রিয় কুকুর বাঘা দরজার ওপাশে মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দিলীপকে নিরীক্ষণ করছে। সে হেসে উঠে বললে, 'আপনি আমাদের চেনেন, ওকে চেনেন না! ও যে আমাদের বাঘা!'

—'বাঘা! কিন্তু ও যে দেখছি নেড়ি কুত্তা!'

কুমার গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, বাঘা আমাদেরই মতো নেটিভ বটে! আমরা স্বদেশের ধুলোকেও ভালোবাসি, তাই বিলিতি কুকুর পুষি না। আমরা হচ্ছি কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত। আমরা—তাঁর ভাষায়

'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!'

কোনও বিলিতি কুকুরই বাঘার চেয়ে বুদ্ধিমান আর জোয়ান নয়। আপনি চেয়ারে বসে নির্ভয়ে

সব কথা বলুন, বাঘাকে কোনও ভয় নেই, ও খালি আপনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে—আপনি ভালো, না মন্দ লোক!'

দিলীপ আর কিছু না বলে একখানা চেয়ারের উপরে বসে নিজের কাহিনি শুরু করলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিলীপের কাহিনি

আমাদের রাধানগর হচ্ছে বেশ একখানা বড়ো গ্রাম। যদিও সেখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির চেয়ে নিম্নজাতির দলই বেশি ভারী।

গাঁয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাউরী নদী। তার সঙ্গে গঙ্গার যোগ আছে। সেইজন্যে রাধানগরের ঘাটে অনেক দূর-দেশের নৌকো আর ইস্টিমার এসে লাগে। এই বাউরী নদীর তীরেই আমাদের বাড়ি।

ছেলেবেলাতেই আমার মা মারা যান—তাঁর মুখও আমার মনে পড়ে না। মাস-ছয়েক আগে আমার ঠাকুরদাদাও ইহলোক ত্যাগ করেন—ঠাকুরমা অনেক আগেই স্বর্গে গিয়েছিলেন। ঠাকুরদাদা মারা যাবার সময়ে বাবাকে কী বলে যান তা জানি না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বাবা সর্বদাই যেন কী চিন্তা করতেন। তারপর মাস-তিনেক আগে হঠাৎ তিনি তীর্থযাত্রা করেন।

আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আগে আমাদের খুব বড়ো জমিদারি ছিল, কিন্তু ঠাকুরদাদা বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট করে ফেলেন। এখন সামান্য কিছু জমিজমা আছে, আর আমার কোনও ভাগীদারও নেই, তাই কোনওরকমে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। আমাদের অবস্থার এই পরিবর্তনে বাবা বড়ো কাতর হয়ে পড়েছিলেন, এর জন্যে সর্বদাই দুঃখিত মুখে থাকতেন। আমার বাবার নাম তারিণীচরণ চৌধুরী, আর ঠাকুরদাদার নাম ছিল শ্যামাপদ চৌধুরী।

বাবা তীর্থযাত্রা করবার দিন-পনেরো পরেই কিষণ সিং নামে এক ভদ্রলোকের চিঠিতে হঠাৎ এক দুঃসংবাদ এল। আলমোড়ার কাছে এক জঙ্গলে বাবাকে নাকি ডাকাতের দল আক্রমণ ও আহত করে এবং কিষণ সিং তাঁকে পথ থেকে তুলে এনে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি।

হঠাৎ পিতৃহীন হয়ে আমার মনের অবস্থা কী রকম হল এখানে সেটা আর বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। এমনই হতভাগ্য আমি যে, পিতার দেহের সৎকার পর্যন্ত করতে পারিনি। কারণ সেই পত্রেই জানা গেল যে, তাঁর নশ্বর দেহ দাহ করে ফেলা হয়েছে।

এইবারে আমার আসল বিপদের কথা শুনুন।

বাবার শ্রাদ্ধাদি কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন একটি লোক আমাদের গ্রামে এসে হাজির হলেন। লোকটি আমাদের বাড়িতে এসে এই বলে আত্মপরিচয় দিলেন 'আমার নাম ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস। আমি কলকাতায় থাকি। তোমার বাবা তারিণীবাবু যখন আলমোড়ায় কিষণ সিংয়েব বাসায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

তোমার বাবা অন্তিমকালে আমাকে যে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, সেই অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যেই আজ আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

তিনি বাবার অন্তিমকালের বন্ধু শুনে আমি তাড়াতাড়ি সসম্মানে তাঁকে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসে বসালুম।

ভৈরববাবু দেখতে অত্যন্ত লম্বা ও দোহারা। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তিনি নিয়মিত কুস্তি লড়েন ও অন্যান্য ব্যায়াম করেন। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, কিন্তু এই বয়সেই মাথার আধখানা টাকে ভরা। শ্যামবর্ণ, গোঁফ-দাড়ি কামানো। কিন্তু তাঁর ছোটো ছোটো অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দুটির সঙ্গে মুখের মিষ্ট ও ছেলেমানুষি-মাখা সরল হাসি কেমন যেন খাপ খাচ্ছিল না।

আমি তাঁকে বাবার শেষ-অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি করুণ ভাবে বললেন, 'আহা, সে কথা আর শুনতে চেয়ো না, শুনলে তোমার কষ্ট হবে!'

আমি বললুম, 'তাহলে বাবা কেন যে আপনাকে আমার কাছে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই কথাই বলুন!'

ভৈরববাবু বললেন, 'বেশি কথা তিনি কিছুই বলেননি—বলতে পারেননি। তবে মারা যাবার মিনিট-দুয়েক আগে তিনি আমার দুই হাত চেপে ধরে আকুল স্বরে বলেছিলেন—'রাধানগরে আমার ছেলে দিলীপ আছে, তার মাথার ওপরে কেউ নেই। আমার যে-সব দলিল আর কাগজপত্তর আছে সেগুলো দেখে যদি আপনি সুব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।' এই তাঁর শেষ কথা। আমি স্বীকার করলুম। তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।'

সেই ঘরেই বাবার লোহার সিন্দুক ছিল। আমি সিন্দুক খুলে ভিতরকার সমস্ত কাগজপত্তর ভৈরববাবুর সামনে বার করে দিলুম। তিনি খুব মন দিয়ে সমস্ত কাগজপত্তর পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছোট্ট একটা ক্যাশবাক্সে একখানা খামের ভিতরে একটুকরো কাগজ ছিল, সেইটেই তিনি প্রায় দশমিনিট ধরে দেখলেন। তারপর কাগজখানা আবার বাক্সের ভিতরে রেখে দিয়ে বললেন, 'দিলীপ, তোমার কাগজপত্রের ভিতরে কোনও গোলমাল নেই, তবে তোমার বাবা এত ব্যস্ত আর চিন্তিত হয়েছিলেন কেন, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! আর কোনওখানে কি তোমার বাবার আর-কোনও কাগজপত্তর আছে?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে না।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে তিনি বিদায়গ্রহণ করলেন। যাবার সময়ে লক্ষ করলুম, ভৈরববাবুর ডান হাতে আঙুল আছে ছয়টা!

ভৈরববাবু অতক্ষণ ধরে একটুকরো কাগজ নিয়ে কী লক্ষ করছিলেন তা জানবার জন্যে মনে কেমন কৌতূহল হল। ক্যাশবাক্সটা আবার খুললুম। খামের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে ভাঁজ খুলে দেখলুম, তার ভিতরে খালি একটা ম্যাপ আঁকা আছে! কোথাকার ম্যাপ সে-সব কিছুই জানবার উপায় নেই, খুব পুরোনো কালি দিয়ে টানা গুটিকয় লাইন এবং হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'পাহাড়', 'গুহা', ও 'সরোবর' প্রভৃতি।

এই তুচ্ছ ম্যাপখানা ভৈরববাবু এতক্ষণ ধরে দেখোছিলেন কেন? অনেকক্ষণ ভেবেও কিছুই বুঝতে না পেরে, বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কাগজপত্তর সব আবার সিন্দুকের ভিতরে পুরে রাখলুম।

এইবার থেকে আপনারা বিশেষ মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। কারণ এর পরের ঘটনাগুলির কারণ জানবার জন্যেই আমি আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।

ভৈরববাবুর আগমনের দিন-তিনেক পরে আমি একটা দরকারি কাজে পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরে এসে উপরে উঠে দেখি, আমার উপরকার বসবার ঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে! অথচ যাবার সময়ে এ-ঘরের দরজায় আমি যে নিজের হাতে তালা বন্ধ করে গিয়েছিলুম, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল, লোহার সিন্দুকটা খোলা! তাড়াতাড়ি তার ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখলুম, দামি কিছুই চুরি যায়নি!

ঘরের মেঝেতে সেই ছোটো ক্যাশবাক্সটা কাত হয়ে পড়েছিল। সেটা খুলে অবাক হয়ে দেখি, তার ভিতর থেকে সেই ম্যাপ-সুদ্ধ খামখানা অদৃশ্য হয়েছে!

বাড়ির সমস্ত ঘর পরীক্ষা করে আর কিছু হারিয়েছে বলে মনে হল না। হারিয়েছে শুধু সেই তুচ্ছ ম্যাপখানা—যে বাজে কাগজখানা হয়তো আমি নিজেই কোনওদিন বাক্স থেকে বার করে ছুড়ে ফেলে দিতুম!

হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়িতে চোর এল, দরজার তালা ভাঙলে, লোহার সিন্দুক খুললে, কিন্তু নিয়ে গেল কেবল এক টুকরো কাগজে হাতে-আঁকা একখানা ম্যাপ! এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনও শুনেছে?

কেন জানি না, কেবলই সন্দেহ হতে লাগল, এই অদ্ভুত রহস্যের সঙ্গে সেই ভৈরববাবুর একটা কোনও সম্পর্ক আছেই! এই ম্যাপ দেখবার জন্যে ভৈরববাবুর অতিরিক্ত আগ্রহ তো তাঁর মুখে-চোখে স্পষ্টই ফুটে উঠতে দেখেছি! আর সেই আগ্রহেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ম্যাপখানা অন্তত তাঁর চক্ষে কম মূল্যবান নয়!

এই ঘটনার হপ্তাখানেক পরে আমার বাড়িতে আর এক মূর্তি এসে হাজির! পশ্চিমের লোক, বয়সে প্রৌঢ়, আধময়লা জামাকাপড়। নাম বললে, কিষণ সিং। নিবাস আলমোড়ায়!

তাঁকে আদর করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলুম, কারণ এই কিষণ সিংই আমাকে বাবার মৃত্যু-সংবাদ জানিয়েছিলেন এবং অন্তিমকালে বাবার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন।

তাঁর মুখে বাবার মৃত্যুর যে শোচনীয় কাহিনি শুনলুম এখানে সে কথাও বলে সময় নষ্ট করতে চাই না! নিজের দুঃখ আমার নিজের বুকের ভিতরেই লুকানো থাক।

সমস্ত শোনবার পরে কিষণ সিংকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কেন এত দূরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

কিষণ সিং ভাঙা ভাঙা বাংলায় যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে এই 'বাবুজি, তারিণীবাবু যখন মারা যান, তার একটু আগেই আমাকে ডেকে বললেন, 'কিষণ সিং, তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে

অন্তিমকালে আমার যে সেবা করলে, তার পুরস্কার ভগবানই তোমাকে দেবেন। কিন্তু তুমি যদি আমার আর একটি উপকার করো, তাহলে তোমাকে আমি কিছু পুরস্কার দিতে পারি।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী উপকার?' তারিণীবাবু বললেন, 'আমার পকেটে আটশো টাকার নোট আছে। তোমরা সদলবলে এসে পড়াতে ডাকাতরা সেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি। ওই পকেটেই একটি বড়ো ফাউন্টেন পেনও আছে। পাঁচশো টাকা আর ওই ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে তুমি যদি দেশে গিয়ে আমার ছেলেকে দিয়ে আসতে পারো, তাহলে বাকি তিনশো টাকা তোমাকে আমি পুরস্কার দিয়ে যাব।'—আমি বললুম, 'বাবুজি, পুরস্কার পাবার আশায় আমি অসময়ে আপনার উপকার করতে চাই না। ও টাকা আর কলম আমি ডাকে আপনার ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেব।' কিন্তু তারিণীবাবু বললেন, 'না কিষণ সিং, ও তিনশো টাকা তুমি না নিলে আমি মরেও শান্তি পাব না। আর ডাকে নয়, কলম আর টাকা তোমাকে নিজে গিয়ে আমার ছেলের হাতে দিয়ে আসতে হবে। তাকে বলবে, সে যেন তার বাপের এই শেষ দান কলমটিকে ভালো করে রেখে দেয়!' তখন আমি বাধ্য হয়ে তাঁর কথামতোই কাজ করব বলে স্বীকার করলুম। তারপর তারিণীবাবু আর বেশিক্ষণ বেঁচে ছিলেন না।......এই নিন বাবুজি, আপনার বাপের শেষ-দান পাঁচশো টাকা আর ফাউন্টেন পেন!'

কিষণ সিং তাঁর পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট আর একটি ফাউন্টেন পেন বার করে আমার হাতে দিলেন এবং আবার বললে, 'বাবুজি, বাকি তিনশো টাকাও আমি সঙ্গে করে এনেছি। আমি গরিব মানুষ, তিনশো টাকা আমার কাছে অনেক টাকা। কিন্তু উপকারের দামের মতন ও-টাকা নিতে আমার মন সরচে না।'

সেই দরিদ্র সাধু কিষণ সিংয়ের হাত ধরে আমি অভিভূত স্বরে বললুম, 'কিষণ সিং, তুমি দেবতা! ও-সমস্ত টাকাই তুমি যদি নিজে যেচে না দিতে, তাহলে তো আমি কিছুই জানতে পারতুম না! কিন্তু আমার বাবা তোমাকে যা দিয়ে গেছেন, আমি কিছুতেই তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

কিষণ সিং সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই বিদায়গ্রহণ করলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'বাবুজি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তারিণীবাবু মারা যাবার আগে আর-একবার বলেছিলেন, ও-কলমটা আপনি খুব সাবধানে রাখবেন—যেন ওটা হারিয়ে না যায়!'

আমারও আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা কিষণবাবু, একটা কথা বলতে পারেন? আমার বাবা যখন মারা যান, তখন সেখানে ভৈরববাবু বলে কোনও বাঙালি ভদ্রলোক হাজির ছিলেন?'

কিষণ সিং বললেন, 'বাঙালি ভদ্রলোক? আপনার বাবা মারা যান আমার বাসায়। তিনি ছাড়া আর কোনও বাঙালিই সেখানে ছিলেন না!' শুনে বিস্মিত হলুম। কিষণ সিং চলে যাবার পরেও মনের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে বারংবার এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কে এই ভৈরববাবু, কী তাঁর উদ্দেশ্য?

সেদিন সারাদিন আকাশে মেঘ জমেছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল।

একে পল্লিগ্রাম, তায় দুর্যোগের রাত। চারিদিক খুব শীঘ্রই নিসাড় হয়ে পড়ল—একটা কুকুরেরও চিৎকার পর্যন্ত শোনা যায় না।

বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্ন সেই কলমটি নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, বাবার সঙ্গে তো আরও অনেক জিনিস ছিল, কিন্তু তিনি এই কলমটি বিশেষ করে আমাকে দিয়ে গেলেন কেন? আর এই কলমটিকে খুব সাবধানে রাখতেই বা বলে গেলেন কেন?

এই-সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ বাহির থেকে তীব্র ও উচ্চ এক আর্তনাদে চতুর্দিকের স্তব্ধতা যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল!

বলেছি, আমাদের বাড়ি নদীর ঠিক উপরেই। আর্তনাদটা এল নদীর দিক থেকেই।

ধড়মড় করে উঠে বসে জানলা খুলে দিলুম। হু-হু করে জোলো বাতাস ঘরের ভিতরে ছুটে এল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সেই নিরেট অন্ধকার ভেদ করে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না!

আবার সেই ভয়ানক আর্তনাদ!

বেশ শুনলুম, কে যেন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলছে—'দিলীপবাবু! বাবুজি! রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

এ যে সেই কিষণ সিংয়ের গলা!

এক লাফে খাট থেকে নীচে নেমে পড়ে একগাছা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে তখনই আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলুম। বেগে ছুটতে ছুটতে যখন নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম, তখন চারিদিক আবার নীরব হয়ে পড়েছে—কারুর কোনও আর্তনাদই শোনা যাচ্ছে না! নদীর কল-কল শব্দ আর বৃষ্টির টিপ-টিপ ধ্বনি ও থেকে থেকে বাতাসের হাহাকার ছাড়া এই অন্ধ পৃথিবীর কোথাও আর কেউ যেন জেগে নেই!

এখন এখানে বিদেশি কিষণ সিং কী করতে পারে? এবং অমন বিপদগ্রস্তের মতো আমারই বা নাম ধরে ডাকবে কেন? সে কি জলপথে এখান থেকে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝড়ে নৌকো ডুবে গেছে?

লাঠির উপরে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতা আর কেউ ভাঙলে না। তখন আমারই শুনতে ভুল হয়েছে ভেবে ধীরে ধীরে আবার বাড়ির দিকে ফিরে এলুম।

হঠাৎ খানিক তফাত থেকে আমার বাড়ির দোতলার ঘরের দিকে চোখ গেল। আমার শয়নগৃহের খোলা জানলা দিয়ে দেখা গেল, ঘরের ভিতরে একটা আলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে! যেন কেউ ল্যাম্পটা নিয়ে ঘরের ভিতরে এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করছে!

সেদিন আমার চাকরটা পর্যন্ত ছুটি নিয়ে কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল—বাড়িতে ছিলুম আমি কেবল একা! তবে এ কী কাণ্ড? আমার শোবার ঘরে কে ঢুকেছে? আলো জ্বেলে ঘুরে-ফিরে কী খুঁজছে?

দ্রুতপদে আবার বাড়ির দিকে ছুটলুম—অমনি অন্ধকারের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে বাইরের কোথায় একটা বাঁশি বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আলোটা দপ করে নিবে গেল!

আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম—'চোর, চোর, চোর!'

সেই অন্ধকারের ভিতরেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনলুম—যেন কারা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! তাহলে চোরেদের দলে অনেক লোক আছে?

তাদের ধরবার চেষ্টা করা বৃথা বুঝে আমি আবার নিজের বাড়িতেই ফিরে এলুম। উপরে উঠে দেখলুম, আমার শয়নঘরে আর আলো জ্বলছে না!

ফের আলো জ্বেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো কাদামাখা পায়ের দাগ! নিশ্চয় এখানে কারা এসে ঢুকেছিল!

কিন্তু, কেন? আমার মতন গরিব মানুষের বাড়ি হঠাৎ যত চোরের তীর্থের মতো হয়ে উঠল কেন?

যারা এসেছিল তারা যে ঘরের জিনিসপত্তর ঘেঁটে গেছে, তাও বেশ দেখা যাচ্ছে! কিন্তু কিছুই তো হারায়নি!

তবে?

হঠাৎ টেবিলের উপরে নজর পড়ল। সেখানে আমার তিনটে ফাউন্টেন পেন ছিল, কিন্তু এখন একটাও দেখা যাচ্ছে না! ...তবে কি অতগুলো চোর এসেছিল শুধু ওই তিনটে ফাউন্টেন পেন চুরি করতে? না, আমি এসে পড়াতে তারা আর কিছু নিয়ে পালাতে পারেনি? ...সেদিনের চোরেরা চুরি করলে একটুকরো কাগজ, আর আজকের চোরেরা নিয়ে গেল কেবল তিনটে কলম! চোরেদের ঘরে কি কাগজ-কলমের এতই অভাব?

বাবার সেই কলমটির কথা মনে পড়ে গেল। বাইরে আর্তনাদ শুনে কলমটা আমি তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় গুঁজে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। ছুটে গিয়ে বালিশ তুলে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—নাঃ, বাবার শেষ-স্মৃতিচিহ্ন যথাস্থানেই আছে, চোরেরা তার সন্ধান পায়নি!

পরের দিন নদীর ধারে বিষম একটা হট্টগোল শুনে গিয়ে যা দেখলুম তা আবার বর্ণনা করতে—বা মনে আনতেও দুঃখ-কষ্টে বুক যেন ভেঙে যায়!

ঘাটের তলায় একটা মৃতদেহ ভাসছে, তার সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন! আর, সে মৃতদেহ হচ্ছে পরোপকারী, ধার্মিক ও নিরীহ কিষণ সিংয়ের! নিজের বাক্যরক্ষা ও আমার উপকার করতে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে হতভাগ্যের আজ প্রাণ গেল! বেচারা এখানকার আর কারুকেই চেনেন না, তাই মৃত্যুকালেও তিনি আমারই নাম ধরে ডেকে সাহায্যভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সে আর্ত-প্রার্থনা শুনেও আমি তাঁর কোনও উপকারই করতে পারিনি। এ-অনুতাপ আমার জীবনেও যাবে না! আমি মহাপাপী!

বিমলবাবু, কুমারবাবু! এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি দেশ ছেড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি? কিষণ সিংয়ের হত্যাকাণ্ডের পরেও দেশে থাকতে আর আমার ভরসা হয়নি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোনও সাংঘাতিক শত্রুর শনিদৃষ্টি পড়েছে আমার উপরে! এ শত্রু যেমন সহজে চুরি করে, তেমন সহজেই করে মানুষ খুন! অষ্টপ্রহর মনে হচ্ছে, এরা যেন আমার চারপাশে ওত পেতে বসে আছে, আমার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ করছে এবং যে-কোনও মুহূর্তে রক্তপিপাসু পিশাচের মতো আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়তে পারে!

কারণ কিষণ সিংয়ের হত্যাকাণ্ডের পরেও দেখেছি, সন্ধ্যা হলেই কারা যেন আমার বাড়ির কাছে আনাচে-কানাচে ঝোপে-ঝাপে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়! রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়, ছাদে যেন কাদের পায়ের শব্দ শুনি, 'কে, কে?' বলে চেঁচিয়ে উঠি, আবার পায়ের শব্দ শুনি, কারা যেন তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়!

কে ওই ভৈরববাবু? জীবনে কখনও তাঁকে দেখিনি, বাবার মুখেও তাঁর নাম শুনিনি! কিন্তু তিনি কেমন করে বাবার মৃত্যুর কথা, কিষণ সিংয়ের কথা আর আমার কথা জানলেন? আমার কাগজপত্র ও বিশেষ করে সেই হাতে-আঁকা ম্যাপ দেখবার জন্যে তাঁর অত আগ্রহ কেন? আর সেই ম্যাপখানা তারপরেই চুরি গেল কেন? কোথাকার ম্যাপ সে-খানা? লোহার সিন্দুকের মধ্যে সেখানাকে অত যত্ন করে রাখাই বা হয়েছিল কেন?

আমার বাবার শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে কি কোনও রহস্যময় কারণ আছে? এত জিনিস থাকতে তিনি মৃত্যুর সময়ে আমায় একটা ফাউন্টেন পেন পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন কেন? আর কলমটা অতি-সাবধানে রক্ষা করতেই বা বললেন কেন? এ-রকম ফাউন্টেন পেন তো পৃথিবীর সর্বত্রই প্রত্যহ হাজার হাজার বিক্রি হচ্ছে!

কিষণ সিংকে কে হত্যা করলে—কেন হত্যা করলে?

আর সেই হত্যাকাণ্ডের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমার বাড়িতে একদল চোর ঢুকে কেবল তিনটে ফাউন্টেন পেন নিয়েই সরে পড়ল কেন? তারা কি বাবার সেই কলমটাই খুঁজতে এসেছিল?

কিন্তু, কেন?

এই-সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তরই পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনেছি, আপনারা এইরকম রহস্যময় অনেক ঘটনার কিনারা করেছেন। এখন আপনারাই বলুন, আমার কর্তব্য কী?

আমি একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি। হয়তো আমার জীবনও নিরাপদ নয়! নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি এ কোন অপূর্ব ও বিপজ্জনক নাটকের নায়ক হয়ে পড়েছি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাউন্টেন পেনের গুপ্তকথা

এতক্ষণ পর্যন্ত বিমল একটাও কথা কয়নি। দিলীপের সমস্ত কাহিনি শুনেও সে প্রথমে কিছু বললে না, চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'দিলীপবাবু, এমন কোনও লোককে আপনি জানেন কি, আপনার সঙ্গে বা আপনাদের পরিবারের সঙ্গে যার শত্রুতা আছে?'

দিলীপ বললে, 'না, এমন কারুকেই আমি জানি না।'

—'আপনাদের সম্পত্তির আর কোনও উত্তরাধিকারী যে নেই, সে-বিষয়েও আপনি নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ। আর সম্পত্তি তো ভারী! বছরে বারো-তেরোশো টাকা আয়!'

—'হয়তো আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনি নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্য কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। যাদের স্বার্থ আছে, হয়তো তারা আপনার স্বপক্ষের প্রমাণগুলো সরিয়ে ফেলতে চায়।'

—'স্বপক্ষের প্রমাণ বলতে আপনি কী বোঝেন কুমারবাবু? চোরেরা একখানা হাতে-আঁকা ম্যাপ আর তিনটে ফাউন্টেন পেন সরিয়ে ফেলেছে। এগুলো কি আবার প্রমাণ?'

বিমল এইবারে কথা কইলে। বললে, 'কুমার, যদিও তুমি ভুল যুক্তি অনুসরণ করছ, তবু একটা বিষয় বোধহয় কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছ। ওই হাতে-আঁকা ম্যাপখানা খুব বড়ো প্রমাণও হতে পারে! চোরেরা যে তিনটে ফাউন্টেন পেন নিয়ে গেছে, তাও হয়তো অকারণে নয়! ভৈরব খুব সম্ভব নিজের কোনও গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ওই ম্যাপখানা চুরি করেছে। কিন্তু ম্যাপ ছাড়াও নিশ্চয় সে আরও কিছু চায়। সেই 'আরও কিছু' বলতে কী বোঝাতে পারে? সেই 'আরও কিছু'র লোভেই কিষণ সিংকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে বধ করবার আগে হয়তো যন্ত্রণা দিয়ে কিষণ সিংয়ের মুখ থেকে জেনে নেওয়া হয়েছে যে, তারিণীবাবু তাঁর হাতে যা দিয়েছিলেন, তিনি সে-সব দিলীপবাবুর হাতে সমর্পণ করে এসেছেন। দিলীপবাবুর হাতে তিনি দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা আর একটা ফাউন্টেন পেন। চোরেরা যখন টাকার বদলে ভুল ফাউন্টেন পেনই চুরি করেছে, তখন বুঝতে হবে যে, ঠিক ওই জিনিসটিই তাদের দরকার! কিন্তু আসল ফাউন্টেন পেনটি এখনও দিলীপবাবুর কাছেই আছে। সেটি যদি এখানে থাকত তাহলে হয়তো এখনই আমি সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারতুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলমটি আমাদের হাতে নেই!'

দিলীপ বললে, 'কলম আছে বিমলবাবু, কলম আমার সঙ্গেই আছে! চোরেদের অদ্ভুত প্রবৃত্তি দেখে বাবার সেই শেষ-স্মৃতিচিহ্নটিকে আমি বাড়িতে ফেলে আসতে ভরসা করিনি!'—এই বলে সে জামার ভিতর থেকে একটি ফাউন্টেন পেন বার করে সামনের টেবিলের উপরে রাখলে।

বিমল আগ্রহ-ভরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর কলমটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, 'এটি দেখোছি ওয়াটারম্যানের সবচেয়ে বড়ো সাইজের রেগুলার ফাউন্টেন পেন। এতে কালি ঢালতে হলে প্যাঁচ খুলে ড্রপারের সাহায্যে ফাঁপা ব্যারেলটিকে ভরতি করতে হয়। কলমটির আকারে কোনও নতুনত্ব বা অসাধারণতা দেখছি না বটে, কিন্তু'—সে মুখের কথা শেষ না করেই কলমটি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে এবং প্যাঁচ ঘুরিয়ে তার মুখের দিকটা খুলে ফেলে ব্যারেলের ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহাস্যে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি তাই! সব রহস্যই এইবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে! কুমার! একটা ছোটো সন্না নিয়ে এসো তো!'

কুমার তখনই উঠে গিয়ে একটি ছোটো সন্না এনে দিলে।

বিমল সন্নাটা ব্যারেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খুব সরু করে পাকানো একখানা কাগজ টেনে বার করে ফেললে!

দিলীপ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'ও কী বিমলবাবু, ও কী! ব্যারেলের ভেতরে কাগজ!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব দরকারি কাগজ! এইজন্যেই আপনার বাবা আপনাকে কলমটি খুব সাবধানে রাখতে বলেছিলেন! আর ভৈরবও বোধহয় এইরকম কিছু সন্দেহ করেই ফাউন্টেন পেন চুরি করতে নিজে এসেছিল বা লোক পাঠিয়েছিল! এখন দেখা যাক, কাগজে কী লেখা আছে!'

বিমল আস্তে আস্তে পাকানো কাগজখানি খুলতে লাগল। খুব পাতলা একখানা কাগজ ভালো করে পাকিয়ে ব্যারেলের ভিতরে পুরে রাখা হয়েছিল। তাতে খুদে খুদে হরফে লেখা আছে

'কল্যাণীয়েষু দিলীপ, আমার স্থান অতি অল্প, একেবারে কাজের কথা বলি।

আমার বাবা, অর্থাৎ তোমার ঠাকুরদাদা তিব্বত বেড়াতে গিয়ে পথে গুপ্তধনের সন্ধান পান। কিন্তু কোনও দুর্ঘটনায় তাঁকে খালি হাতে কেবল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে সে-জায়গাটির ম্যাপ তিনি এঁকে এনেছিলেন, সেখানি আমাদের লোহার সিন্দুকে আছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে আমিও ওই গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছি। কিন্তু পথে বেরিয়ে এখন বুঝতে পারছি যে, ওই গুপ্তধনের ঠিকানা না জানলেও তার অস্তিত্ব আমি ছাড়া বাংলা দেশের অন্য লোকেও জানে। সেই শত্রুও আমার অনুসরণ করেছে—হয়তো আমাকে কোনও বিপদে ফেলবে। যদি আমি কোনও মারাত্মক বিপদে পড়ি, তাহলে তুমি যাতে সব জানতে পারো আমি সেইজন্যেই এই পত্র লিখছি।

হিমালয়ের মানস সরোবরের কাছে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল। গুপ্তধন সেইখানেই আছে। ম্যাপ দেখলেই সব জানতে পারবে। সাবধানতার জন্যে ম্যাপে রাক্ষস তালের নাম লেখা নেই। কারণ যদি ম্যাপখানা চুরি যায়, তাহলেও কেউ বুঝতে পারবে না যে, কোথাকার ম্যাপ! আমিও সাবধানতার মার নেই বলে ম্যাপখানা সঙ্গে নিলুম না—কিন্তু তার সবটাই আমার মনের ভিতরে এমন ভাবে গাঁথা আছে যে, বিনা ম্যাপেই আমি কাজ চালাতে পারব।

গুপ্তধনের সমস্ত ইতিহাস আমি জানি না। তবে শুনেছি, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময়ে যখন বৌদ্ধদের উপরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন একদল সন্ন্যাসী একটি পরাজিত রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিব্বতে পালাবার পথে রাক্ষস তালের কাছে লুকিয়ে রাখে। সে ঐশ্বর্যের নাকি অন্ত নেই।

কিন্তু ঐশ্বর্যলাভে দুটি বাধা আছে বলে শুনেছি। প্রথমত, গুপ্তধন রক্ষা করে নাকি একদল প্রেতাত্মা! তিব্বতের লামারা এই ঐশ্বর্যের কথা জানে। এতদিনে তারা হয়তো গুপ্তধন সব সরিয়ে ফেলত, কিন্তু তারা কুসংস্কারে অন্ধ, ভূতের ভয়ে রত্নগুহার সন্ধান করে না! আর সন্ধান না করার অন্য কারণ বোধ হয়, রত্নগুহার ঠিক ঠিকানা তাদের জানা নেই। কিন্তু ঠিকানা না জানলেও লামারা সর্বদাই সাবধান হয়ে থাকে, এ-অঞ্চলে কারুকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সন্দেহ করে যে, সে বুঝি সন্ধান পেয়ে রত্নগুহা খালি করতে এসেছে! ওই লামারা অত্যন্ত হিংস্র, কারুর উপরে সন্দেহ করলেই তাকে হত্যা করতে ইতস্তত করে না! দ্বিতীয়ত, এখানে অত্যন্ত ডাকাতের উপদ্রব, বিদেশি পথিক দেখলে সর্বদাই আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

তবু আমি ওখানেই যাচ্ছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস আছে যে, লামাদের চোখে আমি ধুলো দিতে পারব! আর ভূত-প্রেত আমি মানি না। আমার মতে, ওই প্রেতাত্মাদের কথা রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। খুব সম্ভব, এই ভূতের ভয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু লোভী লোকদের তফাতে রাখবার জন্যে! আর ডাকাতের ভয়? বুদ্ধি থাকলে তাদের চোখেও ধুলো দেওয়া অসম্ভব নয়।

আমি যদি অকৃতকার্য হই, তাহলে তুমি বা তোমার বংশধর আমার পরে এই পথে আসতে পারো—অবশ্য সাহস ও যোগ্যতা থাকলে। ইতি

আশীর্বাদক তোমার পিতা।'

পত্রপাঠ শেষ হলে পর তিনজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সর্বপ্রথমে মুখ খুলে দিলীপ অভিভূত স্বরে বললে, 'এতক্ষণে সব বোঝা গেল! ভৈরব এই জন্যেই কলম চুরি করতে চায়! গুপ্তধন!'

কুমার বললে, 'কিন্তু আসল কলমটা না পেলেও ভৈরব ম্যাপখানা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে! সে ম্যাপের অভাবে আপনার পক্ষে গুপ্তধন থাকা আর না থাকা দুইই এক কথা!'

দিলীপ বললে, 'কিন্তু জায়গাটির সন্ধান যখন পেয়েছি তখন আমরা সবাই মিলে খুঁজলে আবার কি গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারব না?'

কুমার হেসে বললে, 'কাজটা যদি এতই সোজা হত, তাহলে গুপ্তধন আজ আর সেখানে থাকত না—কেউ না কেউ তা খুঁজে বার করতই! তাকে ও-ভাবে খুঁজে বার করা অসম্ভব বলেই ম্যাপের দরকার হয়েছে। সে ম্যাপ যখন নেই, গুপ্তধন পাবার আশা তখন আর না করাই উচিত!'

বিমল ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, 'কুমার, বোধ করি অতটা হতাশ হবার দরকার নেই। ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়েছে এইরকম গুপ্তধন কোন দেশে আছে আমরা তা জানি, কিন্তু ঠিক ঠিকানাটি আমাদের জানা নেই। ভৈরবের কাছে ম্যাপ আছে, কিন্তু কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, সেটা তার জানা নেই। একজন দরজার সামনে যেতে পারে, কিন্তু চাবির অভাবে দরজা খুলতে পারবে না। আর একজনের কাছে চাবি আছে, কিন্তু সে-চাবিতে কোন দরজা খুলতে হবে সেটা তার অজানা। বুঝতেই পারছ, দুই পক্ষেরই সমান অসুবিধা!'

কুমার বললে, 'কাজেই ও-ব্যাপার নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ভালো!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এখন দুই পক্ষে যদি একটা বোঝাপড়া হয়?'

কুমার বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'ওই দুরাত্মা ভৈরবের সঙ্গে? মাপ করো ভাই, আমি ওর মধ্যে নেই!'

বিমল বললে, 'তুমি বোধহয় ভৈরবের শয়তানি এখনও ভালো করে আন্দাজ করতে পারোনি! তারিণীবাবু যে শত্রুর জন্যে বিপদের ভয় করেছিলেন, কে সে? তিনি তাকে বাংলা দেশের লোকও বলেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ওই ভৈরব ছাড়া আর কেউ নয়! তাঁরও মৃত্যুর কারণ ওই ভৈরবই!'

দিলীপ মহাক্রোধে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উঠে দাঁড়াল এবং তীব্র স্বরে বললে, 'আমি আমার

পিতৃহন্তার সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করতে রাজি নই! আমি গুপ্তধন চাই না—কেবল তাকে আর একবার দেখোতে চাই! তাকে খুন করে আমি ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত!'

কুমার বললে, 'ওই ভৈরবকে পেলে আমিও কিছু শিক্ষা দিতে চাই! তার সঙ্গে বোঝাপড়া অসম্ভব!'

বিমল ধীর স্বরে বললে, 'কুমার, আমি কীরকম বোঝাপড়ার কথা বলছি আগে সেইটেই ভালো করে শোনো! আমি বন্ধুভাবে বোঝাপড়ার কথা বলছি না! আমার সন্দেহ হচ্ছে, দিলীপবাবুর উপরে ভৈরব তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলেনি। কারণ তারও সন্দেহ হয়েছে যে, গুপ্তধন কোন দেশে আছে দিলীপবাবু সে কথা জানেন। সুতরাং দিলীপবাবু এখন যদি হঠাৎ প্রকাশ্যেই হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেন, তাহলে ভৈরবও তাঁর পিছু না নিয়ে পারবে না!'

কুমার বললে, 'তারপর?'

—তারপর আমরা আপাতত যখন অলস হয়ে বসে আছি তখন দিলীপবাবুর সঙ্গী হলে নিতান্ত মন্দ হবে কি? তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা! হয়তো ভৈরবকে কোনও ফাঁদে ফেলে আবার সেই ম্যাপখানা কেড়ে নেবারও সুযোগ পাওয়া যাবে!'

কুমার মস্ত এক লাফ মেরে বলে উঠল, 'সাধু, সাধু, চমৎকার ফন্দি! বিমল, তুমি একটি জিনিয়াস!'

বিমল বললে, 'কিন্তু অত বিপদ-আপদের মধ্যে দিলীপবাবু যেতে রাজি হবেন কি?'

দিলীপ মহা-উৎসাহে বললে, 'রাজি হব কী, রাজি হয়েছি! এক—গুপ্তধনের লোভ; দুই—নরপিশাচ ভৈরবকে আর একবার দেখবার লোভ; তিন—আপনাদের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের বন্ধুরূপে পাবার লোভ! এই তিন-তিনটে লোভ সামলানো কি বড়ো সহজ কথা! কবে যাবেন বলুন—আমি প্রস্তুত!'

বিমল চিৎকার করে বললে, 'রামহরি, রামহরি!'

রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, 'অত চ্যাঁচানো হচ্ছে কেন, আমি কি কালা?'

—'রামহরি, মোটঘাট বাঁধতে শুরু করো—আমরা গুপ্তধন আনতে যাব!'

রামহরি চমকে উঠে বললে, 'কী! আবার গুপ্তধন? তোমাদের সঙ্গে এবারে আমি নেই জেনো!'

—'রামহরি, অনেকগুলো ভূত নাকি সেই গুপ্তধনের ওপরে পাহারা দেয়!'

রামহরি শিউরে উঠে বললে, 'কী! আবার ভূত? তোমাদের সঙ্গে এবারে আমি নেই জেনো!'

কিন্তু হপ্তাখানেক পরে বিমল, কুমার ও দিলীপ যেদিন হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলে সেদিন দেখা গেল, তাদের পিছনে পিছনে চলেছে বেজায় বিরক্তমুখে শ্রীরামহরি এবং সর্বশেষে যাচ্ছে বেজায় খুশিভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাংলার কুকুর বাঘা!

(রত্নগুহার সন্ধানে যাত্রা করে যে-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল দিলীপের **ডায়েরি থেকে এখানে**

তা উদ্ধার করে দেওয়া হল। অর্থাৎ অতঃপর দিলীপই প্রধান বক্তা হয়ে নিজের ভাষায় সমস্ত বর্ণনা করবে।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিলীপের ডায়েরি শুরু হল

কলকাতা থেকে বেরিলি, বেরিলি থেকে আলমোড়া, আলমোড়া থেকে আসকোট। আমরা এখন একেবারে হিমালয়ের বুকের ভিতরে, সমতল ক্ষেত্র থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উপরে উঠেছি!

পাহাড়ের পিছন থেকে চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্ত দেখছি, গিরি-নির্ঝরিণীর গান-ভরা নাচ দেখছি, পাইন গাছের নতুন বাহার দেখছি।

কিন্তু বাংলা দেশে যে জন্মেছে, কিংবা বাংলা দেশকে যে একবার ভালোবেসেছে, বাংলার বাইরেকার আর কোনও জায়গাই বোধহয় তার মনে ধরবে না! সেই ছয় ঋতুর বিচিত্র সমারোহ; সেই নানা ফুলের আতরমাখা বাতাস; সেই সিন্ধ সোনালি রোদের মিষ্ট পরশ; সেই কলাপাতার পতাকা ওড়ানো, তাল-নারিকেলের চামর ঢোলানো, অশথ-বটের ছায়া বিছানো কাচা-সবুজ স্বপ্ন দেখানো রঙিন বনভূমি, সেই শত নদীর তীরে তীরে দূর্বাশ্যামল সরস শয্যা, সেই পল্লিকুটিরে চারিদিক থেকে ভেসে আসা দোয়েল কোয়েল শ্যামা পাপিয়া ও বনকপোতের অশ্রান্ত সঙ্গীত-তরঙ্গ, এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে? চলেছি কোন নির্জন নিস্তব্ধ নীরস তৃষিত কঠিন পাষাণপুরে রত্নগুহার অন্বেষণে, কিন্তু বাংলা দেশের রসালো মাটিতে নিত্য যে সোনা ফলে, তার তুলনা কোথায়?

এইজন্যেই তো বাঙালি 'কুনো' নাম কিনেছে, সে তার সুখময় শোভাময় আনন্দময় গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয় এবং এইজন্যেই তো যে-বিদেশি একবার বাংলার স্বাদ পায়, সে আর বাংলাকে ভুলে স্বদেশে ফিরতে রাজি হয় না। কুয়াশার দেশ থেকে ছুটে আসে ইংরেজরা, মরু-বালুর দেশ থেকে ছুটে আসে মারোয়াড়িরা, পাথরের দেশ থেকে ছুটে আসে কাবুলি আর নেপালিরা! বাংলার সোনা লুটছে যত বিদেশি এ-অঞ্চলের পাজামা পরা স্নান-ভীত নোংরা লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ হয় না এবং নাছোড়বান্দা মশা-মাছি-পিশুর উৎকট বন্ধুত্বও ভালো লাগে না। এখানকার ডাল আর চালের সঙ্গে কাঁকরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, মুখে দিলে মনে হয় একটা দাঁতও নিয়ে আর দেশে ফিরতে পারব না! এখানে দিনে রোদ আর শুকনো হাওয়া গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয় এবং রাতের ঠান্ডা দেয় বুকের রক্ত কনকনিয়ে জমিয়ে!

কিন্তু এতদূর এসেও আমার মনে একটুও শান্তি নেই! বাংলা দেশের সবুজ বুক ছেড়ে যারা এই শুকনো পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথে হোঁচট খেতে আসে, তারা হচ্ছে মানস সরোবরের

তীর্থযাত্রী, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনওই সহানুভূতি নেই—পরকালের ভাবনা ভাববার বয়স আমাদের হয়নি! আপাতত আমরা কোনও দেবতা দর্শন করতে চাই না—আমাদের ধ্যানধারণা চায় এখন এক দানবকে! যার আশায় এতদূর আসা—সেই ভৈরব কোথায়?

ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে পাঞ্জাবি, মারোয়াড়ি, গুজরাটি, মারাঠি, মাদ্রাজি—নানা জাতের তীর্থযাত্রী আমাদের আশপাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, দু-একজন বাঙালিকেও দেখলুম, কিন্তু তাদের দলে ভৈরবকে আবিষ্কার করতে পারলুম না।

তাহলে কি আমাদের অনুমান একেবারেই মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল? ভৈরব কি জানতে পারেনি যে, রত্নগুহার সন্ধানে আমরা এই পথে এসেছি? কিংবা জানতে পেরেও আমাদের পিছু নেওয়া দরকার মনে করেনি?

ইতিমধ্যে বিমল ও কুমারের সঙ্গে আমার এমন বন্ধুত্ব হয়েছে যে, আমরা কেউ কারুকে আর 'বাবু' বা 'আপনি' বলে ডাকি না। বিমল ও কুমার চমৎকার লোক! এই দুটি দুঃসাহসী লোক বার বার কল্পনাতীত বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে এবং মৃত্যুর সঙ্গে বারংবার যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশ-বিদেশে এমন অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে কিন্তু তবু তাদের হাবভাবে ব্যবহারে এতটুকু গর্ব প্রকাশ পায় না!

আসকোট পাহাড়ের শিখরে আছে একটি কালীমন্দির এবং তার পদতলে এসে মিশেছে কালী ও গৌরী নামে দুটি নদী। এই নদী-সঙ্গমে আমাদের তাঁবু খাটানো হল—আজকের ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাতটা আমরা এইখানেই পুইয়ে যাব।

আমরা একটা বড়ো ও একটা ছোটো তাঁবু এনেছিলুম। ছোটো তাঁবুতে রামহরি থাকত ও রান্নাবান্না করত এবং বড়ো তাঁবুতে বাঘাকে নিয়ে আমরা তিনজনে বাস করতুম।

এই আসকোটে অমাবস্যার রাতে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। একে সারাদিন পাহাড়ে-পথ হাঁটা, তায় রাত্রে কনকনে পাহাড়ে-ঠান্ডা! ঘুম আসতে দেরি হল না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, আচম্বিতে বাঘার ভীষণ গর্জনে জেগে উঠলুম এবং সেই-সঙ্গে শুনলুম বিষম এক ঝটাপটির শব্দ!

প্রথমে অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ল না। একবার ভাবলুম, তাঁবুর ভিতরে বাঘ কি ভাল্লুক ঢুকেছে! উঠে পড়ে ভয়ে সিঁটিয়ে বিছানার এক কোণে সরে গিয়ে বসলুম,—কিন্তু তারপরেই শুনলুম কে আর্তস্বরে বলে উঠল—'উঃ!' তারপরেই ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ এবং শব্দটা যেন তাঁবুর ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল! বুঝলুম তাঁবুর মধ্যে কোনও জন্তু আসেনি, এসেছে মানুষই! কিন্তু কে সে? চোর?

ইতিমধ্যে বিমল ও কুমারও জেগে উঠে তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে ফেললে।

কিন্তু তাঁবুর ভিতরে আর কেউ নেই। কেবল বাঘা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লাফালাফি করে শিকল প্রায় ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করছে!

বিমল একবার বাইরে গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, 'বাইরে তো কারুকে দেখতে পেলুম না! বাঘা, তোর হল কী?'

বাঘা সমানে চ্যাঁচাতে ও লাফাতে লাগল!

কুমার লণ্ঠন জ্বেলে বাঘার কাছে গিয়ে তাকে ভালো করে দেখে বললে, 'বিমল, তাঁবুর ভিতরে নিশ্চয় কেউ এসেছিল! এই দ্যাখো, বাঘার মুখে রক্তের দাগ! যে এসেছিল, সে বাঘার কামড় খেয়ে চম্পট দিয়েছে! বাঘা যদি বাঁধা না থাকত, তাহলে সে আজ পালিয়েও বাঁচতে পারত না!'

তাঁবুর দরজার কাপড়ে বিমল আর একটা নতুন আবিষ্কার করলে। একখানা রক্তাক্ত হাতের স্পষ্ট ছাপ!

বিমল বললে, 'দ্যাখো দিলীপ, যে এসেছিল তার হাতে আঙুল আছে ছয়টা!'

আমি হতভম্বের মতো বললুম, 'ভৈরবেরও ডান হাতে যে ছয়টা আঙুল দেখেছি!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'তাহলে ভৈরবই আজ আমাদের আদর করতে এসেছিল! কিন্তু এখানে যে বাঘার মতন সজাগ প্রহরী আছে, অতটা সে খেয়ালে আনেনি! ওরে বাঘা, ভৈরবের মাংস খেতে কেমন রে? খানিকটা কামড়ে তুলে নিতে পেরেছিস কী?'

বাঘা তার পলাতক শত্রুর উদ্দেশে ক্রমাগত ধমক দিতে লাগল।

কুমার বললে, 'বাঘা বোধহয় ভৈরবকে ভীরু কাপুরুষ বলে গালাগাল দিচ্ছে!'

বিমল আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'আঃ, বাঁচলুম! তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়! ভৈরব লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে। নিশ্চয় সে কোনও ছদ্মবেশ পরেছে! কিন্তু সে তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল কেন? সে একা, না দল বেঁধে এসেছে?' মিনিট-দুয়েক পরেই বিচিত্র সুরে তার নাক ডেকে উঠল! অদ্ভুত মানুষ! বিপদ তার কাছে এত সহজ যে, ঘুম আসতে একটুও বিলম্ব হয় না!

অল্পক্ষণ পরে কুমারও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কিন্তু প্রায় শেষরাত পর্যন্ত জেগে রইলুম। তন্দ্রা আসে, আর ভেঙে যায়। খালি মনে হয়, কারা যেন ধারালো ছুরি নিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে আমার গলা কাটতে আসছে।

সকালে উঠে দেখি, তাঁবুর ভিতরে বিমল ও কুমার নেই।

পাশের তাঁবুতে গিয়ে দেখলুম, রামহরি মাংস রান্না করছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁ রামহরি, তোমার বাবুরা কোথায়?'

রামহরি বললে, 'কোথায় যাচ্ছে, তারা কি বলে যাবার ছেলে? ফরসা হবার আগেই দুই স্যাঙাতে বেরিয়ে গেল, কোথায় যাচ্চো শুধোতে দুজনেই মুখ টিপে একটুখানি হাসলে, আর কিছু বললে না!'

—'তাই তো রামহরি, এখনই পাহাড়ে-রোদে চারিদিক যেন ফেটে যাচ্ছে, তাহলে আজ আর দেখছি তাঁবু তুলে বেরুনো হবে না!'

ঘণ্টা-তিনেক বাইরে কোথায় কাটিয়ে বিমল ও কুমার ফিরে এল।

আমি বললুম, 'তোমরা কোথায় ছিলে? আজ কি এখানেই থাকা হবে?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, আজ এখানেই বিশ্রাম। এই যে, রামহরির রান্নায় যে খাসা খোসবায় বেরুচ্ছে! আজ কী হচ্ছে, কারি না কোর্মা?'

রামহরি বললে, 'স্টু।'

—'স্টু? আরে কেয়াবাত! তার সঙ্গে?'

—'জয়পুরি ঘিয়ে-ভাজা রুটি আর আলুর লপসি।'

—'রামহরি, তোমার মতন মূর্তিমান রত্ন সঙ্গে থাকতে আমাদের আর রত্নগুহা খুঁজতে যাওয়া কেন?'

রামহরি বললে, 'জানো সব, কিন্তু বোঝো কই? তোমরা যে জ্ঞানপাপী—রত্নগুহার ভূতকে কোনওদিন ঘাড় থেকে নামতে দেবে না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে সে কথা তো বললে না?'

কুমার বললে, 'কালকের রাতের অতিথিকে খুঁজছিলুম।'

আমি সাগ্রহে বললুম, 'তার কোনও খোঁজ পেলে নাকি?'

বিমল বললে, 'কে জানে! তবে ডাকঘরের কাছে দেখলুম আট-দশজন মারোয়াড়ি জটলা করছে। তারা আমাদের দেখেই চলে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেজায় ষণ্ডা—যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। তার বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা আর ডান হাতে ছটা আঙুল। তার মুখে ছেলেমানুষি হাসি, কিন্তু চোখদুটো যেন আগুনের মতো জ্বলছে!'

আমি বলে উঠলুম, 'নিশ্চয়ই সে ভৈরব বিশ্বাস! তার বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কারণ বাঘা তাকে কামড়েছে। লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখে শিশুর হাসি, জ্বলজ্বলে চোখ আর ডান হাতে ছটা আঙুল! এ সেই শয়তান না হয়ে যায় না, এখানে এসে মারোয়াড়ি সেজেছে!'

বিমল শুধু বললে, 'অসম্ভব নয়।'

দুপুরে রামহরির হাতের অমৃতের মতো রান্না খেয়ে বেশ একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা দেওয়া গেল। বৈকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, রামহরি চায়ের পিয়ালা আর ওমলেটের ডিশ নিয়ে হাসতে হাসতে আসছে! সেগুলি সদ্ব্যবহারের পর দু-চারটে গল্প করতে করতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল—এই পাহাড়ে-দেশে সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর সঙ্গে দেখা করতে আসে!

বিমল বললে, 'দিলীপ, একটা কাজ করতে পারবে?'

—'কী কাজ?'

—'কাল আমরা বেরুব। তুমি একবার ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে পারবে, পথে কোনও ডাকবাংলো আছে কি না?'

—'তা পারব, কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেল যে?'

—'বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে অন্ধকারের কোনও ভয় নেই। পেট্রলের বড়ো লণ্ঠনটা নিয়ে যাও।'

লণ্ঠনটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকার আকাশ, আবছায়ার মতো পাহাড় এবং মাঝে মাঝে অস্পষ্ট বাড়ি, ঘর ও গাছপালা দেখতে দেখতে আমি ডাকঘরের দিকে যাত্রা করলুম। দূর থেকে দু-একটা গোরু, কুকুরের ডাক বা ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কোনও কোনও

বাড়ির ভিতর থেকে গৃহস্থালির নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পথে জনপ্রাণী নেই।

ফেরবার সময়ে কারুর আর কোনও সাড়া পেলুম না—নিশুত রাতের আগেই এ-সব দেশ যেন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চতুর্দিককে মনে হয় জীবনহীনতার রাজ্য! সে-সময়ে পথেঘাটে দু-চারটে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাও থাকে।

সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম। যেখান দিয়ে যাই, লণ্ঠনের তীব্র আলোকে অন্ধকার যেন সভয়ে পিছিয়ে যায়।

হঠাৎ চোখে পড়ল, পাহাড়ের একটি পাথরে-বাঁধানো ঝরনার কাছে তিনজন লোক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও একটু এগিয়ে দেখলুম, লোকগুলোর পোশাক মারোয়াড়ির মতো।

আমাকে দেখে তারাও এগিয়ে আসতে লাগল।

আমার বুকের কাছটা কেমন গুড়-গুড় করে উঠল। তাদের দিকে না তাকিয়েই আমি হন-হন করে এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কে বললে, 'শোনো দিলীপ, দাঁড়াও!'

আমি সবিস্ময়ে ফিরে দেখলুম, মারোয়াড়ির পোশাক পরে ভৈরব বিশ্বাস একেবারে আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!

আমি বললুম, 'ভৈরববাবু? আপনি এখানে কেন? আর, এ কী বেশ!'

ভৈরব হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'তাহলে আমার মুখ এখনও তুমি ভোলোনি? কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

—'আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।'

—'বেড়াতে এসেছ! এইটেই বেড়াতে আসবার দেশ বটে! কোন কোন দেশে তোমরা বেড়াতে যাবে?'

ভৈরবের এই প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম। সে জানতে চায়, কোন দেশে যাবার জন্যে আমরা যাত্রা করেছি। সেটা না জানতে পারলে তার চুরি-করা ম্যাপ কোনও কাজেই লাগবে না!

তার আশায় ছাই দেবার জন্যে আমি বললুম, 'আমরা আসকোট থেকে কালী নদী পার হয়ে নেপালে বেড়াতে যাব।'

—'নেপালে!'—বলেই সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'নেপালের কোথায় তোমরা যাবে?'

—'কাটমাণ্ডুতে।'

—'কাটমাণ্ডুতে? মিথ্যাকথা! বাংলা দেশ থেকে কাটমাণ্ডুতে যেতে হলে কেউ এ পথ দিয়ে যায় না!'

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, 'আমার কথা যখন বিশ্বাস করবেন না, তখন আপনার সঙ্গে আমিও আর কথা কইতে চাই না!'

আমি দু পা অগ্রসর হলুম।

তৎক্ষণাৎ ভৈরবের সঙ্গী দুজন দুই লাফে আমার সামনে গিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়াল।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, 'ভৈরববাবু, এর অর্থ কী?'

ভৈরব এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে আমার কোটের কলার চেপে ধরলে। তারপর আমাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'দিলীপ, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না! দেখছ, রাত কী অন্ধকার, আর পথ কী নির্জন? এই বিদেশের পথে কাল সকালে যদি কোনও বাঙালির মৃতদেহ পড়ে থাকে, তাহলে কেউ তাকে চিনতে পারবে না!'

সামনের অন্ধকারেরও চেয়ে গাঢ় আর একটা অন্ধকার আমার চোখের উপরে ঘনিয়ে এল। এরা কি আমাকে খুন করতে চায়?

কিন্তু মুখে যতটা সম্ভব সাহস দেখিয়ে আমি বললুম, 'ভৈরববাবু, আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না।'

ভৈরব আমাকে আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'এখন শোনো! অচেনা বিদেশ, রাত অন্ধকার আর পথ নির্জন। দ্যাখো, আমার হাতে এটা কী?'

আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখলুম, সে গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে ফস করে প্রকাণ্ড একখানা চকচকে ছোরা বার করে ফেললে!

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, 'আপনি কী জানতে চান?'

—'সত্যি করে বলো, তুমি কোন দেশে যাবে?'

কী করব? বলব, কি বলব না? কোথায় কোন অতলে গুপ্তধন লুকানো আছে কিংবা নেই, তার লোভে নিজের প্রাণ নষ্ট করব?

ভৈরব দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করে বললে, 'চুপ করে রইলে যে বড়ো? বলো, তুমি কোথায় যাবে?'

হঠাৎ কাছ থেকেই পরিচিত স্বরে শুনলুম, 'ভৈরববাবু, দিলীপ যদি না বলে তাহলে আমি বলতে পারি—আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

বিদ্যুৎবেগে ফিরে দেখি, পাশের একটা পাথরের আড়াল থেকে বিমল ও কুমার বেরিয়ে আসছে, তাদের দুজনেরই হাতে রিভলভার!

যে দুটো লোক আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিল তারা তিরের মতো ছুটে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল এবং ভৈরবও পালাবার উপক্রম করলে।

কিন্তু কুমার খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরলে!

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'দেখছেন ভৈরববাবু, রাত খুব অন্ধকার হলেও পথ খুব নির্জন নয়?'

কুমারের হাত থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ভৈরব বললে, 'কে তোমরা?'

বিমল অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললে, 'ভৈরববাবু, স্থির হোন। বেশি ছটফট করলে আমরাও রিভলভার ছুড়তে ইতস্তত করব না! আপনি তো নিজেই বলেছেন, এই বিদেশের পথে কোনও বাঙালির মৃতদেহ পড়ে থাকলে কাল সকালে কেউ তাকে চিনতে পারবে না!'

ভৈরব তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে বললে, 'তোমরা কী চাও?'

—'মাত্র একখানা ম্যাপ।'

—'ম্যাপ? কীসের ম্যাপ?'

—'কীসের ম্যাপ তা তুমিও জানো, আমরাও জানি। যে ম্যাপখানা তুমি দিলীপের বাড়ি থেকে চুরি করেছিলে, আমরা সেইখানাই চাই।'

—'ম্যাপ-ট্যাপ আমি কিছু জানি না। আমার হাত ছাড়ো, নইলে আমি চিৎকার করে লোক ডাকব।'

—'তুমি চিৎকার করলে এখানে খালি প্রতিধ্বনিই উত্তর দেবে। কিন্তু তার আগেই আমি তোমাকে গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলব।'

—'আমার কাছে কোনও ম্যাপ নেই।'

—'তোমার কাছেই ম্যাপ আছে। অমন মূল্যবান জিনিস তুমি যে কাছছাড়া করেছ, কি অন্য কারুর কাছে রেখেছ, এ কথা আমি আমি বিশ্বাস করি না। নির্বোধ! এখনও কি বুঝতে পারছ না যে, তোমাকে ধরবার জন্যেই আজ আমরা ফাঁদ পেতেছি? আমরা জানি, তুমি আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছ? আমরা জানি, রাত্রে নির্জন পথে দিলীপকে একলা পেলেই তোমরা ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে আমাদের গন্তব্য স্থানের কথা জানবার চেষ্টা করবে! আমরা জানি, গুপ্তধনের ঠিকানা পাওনি বলে তোমার আপশোশের সীমা নেই! মূর্খের মতো ফাঁদে যখন পা দিয়েছ, তখন ম্যাপখানা ফিরিয়ে না দিলে আর তোমার মুক্তি নেই!'

ভৈরব তার ছেলেমানুষি হাসি হেসে বললে, 'ম্যাপের কথা আমি কিছুই জানি না।'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'কুমার, তুমি ভৈরবের হাত দুখানা ওর গায়ের কাপড় দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যালো তো! ও যদি পালাবার চেষ্টা করে আমি তাহলে এখনই গুলি করে ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!'

বিমল রিভলভার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কুমার আর আমি ভৈরবকে খুব কষে বেঁধে ফেললুম—দারুণ ক্রোধে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ফুলে উঠল, কিন্তু সে কোনও বাধা দিলে না।

বিমল বললে, 'এইবারে ওর জামাকাপড় ভালো করে খুঁজে দ্যাখো। ম্যাপ নিশ্চয়ই ওর কাছে আছে।'

প্রথমে তার কোটের পকেট, তারপর ফ্লানেলের শার্ট, তারপর ভিতরকার মেরজাই খুঁজে পাওয়া গেল একটা মানিব্যাগ। সেই মানিব্যাগের মধ্যে পেলুম আমাদের হারামণি—অর্থাৎ রত্নগুহার সেই হাতে-আঁকা ম্যাপখানা!

বিমল বললে, 'ভৈরব, তুমি যে বেচারা কিষণ সিংকে খুন করেছ, তাও আমরা জানি। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নেই বলে তোমাকে আমরা পুলিশের হাতে সঁপে দিতে পারলুম না। তুমি মহাপাপিষ্ঠ, যাও—আমাদের সুমুখ থেকে দূর হও!'

সেই হাতবাঁধা অবস্থায় ভৈরব ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফেরবার মুখে আমি বললুম, 'বিমল, শিকারিরা যেমন গোরু-ছাগলের লোভ দেখিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলে, তোমরা আমাকে ঠিক সেই ভাবেই আজ ব্যবহার করেছ!'

বিমল উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক সেই ভাবেই!'

আমি আহত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু অনেক সময়ে বাঘ সেই গোরু-ছাগলকে বধ করে, সেটাও জানো তো?'

বিমল হেসে বললে, 'অভিমান কোরো না বন্ধু, অভিমান কোরো না! যদিও তুমি আমাদের দেখতে পাওনি, তবু এটা জেনো যে, আমাদের দৃষ্টি বরাবরই তোমার উপরে ছিল!'

—'কিন্তু আগে থাকতে এই কৌশলের কথা আমাকে জানালে কি ক্ষতি হত?'

—'এ-সব বিপদে-আপদে তুমি এখনও আমাদের মতো অভ্যস্ত হওনি। হয়তো তুমি ভয় পেতে।'

কুমার বলে উঠল, 'আরে, কেল্লা যখন এত সহজে ফতে হয়েছে, তখন এত কথা-কাটাকাটি আর মান-অভিমান কেন? এখন আনন্দ করো ভাই, আনন্দ করো! গুপ্তধনের ঠিকানা আমরা জানি, হারা ম্যাপ আবার ফিরে এসেছে, দুরাত্মার দুরাশায় ছাই পড়েছে,—এখন কেবল আনন্দ করো!'

বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু বিনামেঘের বজ্র হয়তো এখন আমাদের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিনামেঘের বজ্র

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, আমাদের জন্যে সামনে খাবার সাজিয়ে রামহরি বসে বসে ঢুলছে এবং তার পাশে বসে আছে বাঘা, ঘুমের ঘোরে তারও দুই চক্ষু মুদ্রিত।

বিমল চিৎকার করে বললে, 'ওঠো রামহরি, কুলিদের ডাকো! মালপত্তর বাঁধতে থাকো, ততক্ষণে আমরা চটপট খেয়ে নি।'

রামহরি মুখ ব্যাজার করে বললে, 'কেন, এত তাড়াতাড়ি কীসের শুনি?'

—'আমরা এখনই যাত্রা করব!'

—'এই অন্ধকার রাতে?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই অন্ধকার রাতে! সবাই একটা করে পেট্রলের লণ্ঠন নাও, কলিকালের বিজ্ঞান অন্ধকারকে জয় করেছে, তা কি তুমি জানো না রামহরি? ওঠো ওঠো, রামহরি! আমাদের পিছনে শত্রু!'

শত্রুর নাম শুনেই রামহরির সমস্ত জড়তার ভাব কেটে গেল,—সে তখনই উঠে মালপত্তরের ব্যবস্থা করতে ছুটল।

প্রবল বিক্রমে খাবারের থালা আক্রমণ করে বিমল বললে, 'এসো কুমার, এসো দিলীপ, আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করো! ভৈরবের শিবিরে এতক্ষণে হয়তো পরামর্শ-সভা বসেছে। শত্রুকে

পরাজিত করবার প্রধান উপায় কী জানো? তারা যা ভাবেনি, তাই করা! আজ রাত্রেই আমরা যে আসকোট ছেড়ে লম্বা দেব, এটা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তারা এখন কালকের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু কাল আমরা অনেক দূরে থাকব। তারপর আমাদের নাগাল ধরা তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এখন আমাদের চাই খালি স্পিড—স্পিড—গতি! আমরা যত গতি বাড়াতে পারব, শত্রুরা তত পিছনে পড়ে থাকবে! স্পিড-স্পিড, আধুনিক সভ্যতার প্রাণ! এই স্পিডের লোভেই একালের মানুষ রেলগাড়ি, ইস্টিমার, উড়োজাহাজ, মোটর সৃষ্টি করেছে! এই স্পিডের জোরেই জীবনের যাত্রাপথে ইউরোপ আজ অগ্রসর, আর তার অভাবেই গোরুর গাড়িতে চড়ে ভারতবর্ষ আজও সেকালের গর্ভের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি!'

আমরা আবার উপরে উঠছি আর উঠছি আর উঠছি! উতরাইয়ের পর চড়াই আর চড়াইয়ের পর উতরাই! যখন উতরাই দিয়ে নীচের দিকে নামছি, তখনও নামছি আরও বেশি উপরে ওঠবারই জন্যে! রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে রাত আসে,—কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বগতির বিরাম নেই!

তবু বিমল বার বার বলছে, 'স্পিড—আরও স্পিড! দ্রুতগতিতেই এখন আমাদের শত্রুদের হারাতে হবে—দ্রুতগতির মহিমাতেই নেপোলিয়ন শত্রুদের হারিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন! স্পিড—আরও স্পিড!'

কুমার বললে, 'নেপোলিয়ন আল্পস পর্বত পার হয়েছিলেন, ভৈরবকে হারাবার জন্যে যদি দরকার হয় আমরাও হিমালয় পর্বত পার হব!'

গাঢ়-নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি! আকাশের নীলিমা যে এমন নির্মল হয়, বাংলা দেশে বসে কখনও তা কল্পনা করতে পারিনি! সেই পবিত্র নীলের তলায় হিমালয়ের শিখরের পর শিখরের ভিড়! চতুর্দিকে যেন শিখরের মহাসভা! উপত্যকার পর উপত্যকা এবং শত শত শিশু-শৈল,—তারা যেদিন মেঘ-ছোঁয়া মাথা তুলবে, সেদিন হয়তো সেকালের অতিকায় জীবজন্তুদের মতো একালের মানবজাতিও ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়ে অন্য কোনও উচ্চতর জীবের জন্যে স্থান ছেড়ে দেবে! এই পর্বত-বিশ্বের ভিতরে মাঝে মাঝে ভুটিয়া স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আর মনে হচ্ছে, মানুষ এখানে কী নিকৃষ্ট, অকিঞ্চিৎকর জীব! দেবতার এই বিরাট লীলা-জগতে মানুষের তুচ্ছ দেহ যেন মোটেই মানায় না!

কোথাও রক্ষক মানুষ ও কুকুরের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ে-রাস্তা দিয়ে ভেড়ার পর ভেড়ার পাল চলেছে, কোথাও পাহাড়ের বুকে সাজানো সিঁড়ির সারের মতো সবুজ শস্যক্ষেতে কপনি-পরা পুরুষ ও বুকে ন্যাকড়া-বাঁধা স্ত্রী-চাষিরা কাজ করছে, কোথাও শুকনো পাথরকে ভিজিয়ে ঝরনার লহর মিষ্ট নাচে-গানে মেতে নেমে আসছে!

নীচে বয়ে যাচ্ছে কালী নদী। উপর থেকে দেখা গেল, ছোটো-বড়ো কয়েকটি ঝরনার ধারার সঙ্গে কালী নদীর মিলন হয়ে এক অপূর্বসুন্দর আনন্দ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। চিরস্তব্ধ হিমালয়ের অসাড় প্রাণে চিরঝঙ্কৃত কলসঙ্গীতের সাড়া! যেন এইখানেই আর্য ঋষিরা প্রথম বেদগানের আভাস অনুভব করেছিলেন! এই পবিত্র সঙ্গমের সঙ্গীতে শহুরে মনের সমস্ত ধুলো-মাটি ধুয়ে-মুছে যায়!

এই এক পরম বিস্ময়! নদ-নদী সমতল পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে এবং নদীর নাম করলেই আমাদের মনে হয় মাটির পৃথিবীর কথা! অথচ নদী নরম মাটির সম্পদ হলেও, সমতল জগতে সে বিদেশিনী! তার জন্ম এই কঠিন, অসমোচ্চ, নিষ্করুণ, শুকনো পাথরের কোলে! যে-জল পাথর ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে পারে না, সেই জলই পাথর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে, মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। হিমালয় না থাকলে ভারত আজ জীবশূন্য মরুভূমি হয়ে যেত এবং সেইজন্যেই হয়তো কৃতজ্ঞ ভারতবাসী হিমালয়কে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে!

গারবেয়াং নামক স্থান থেকে কিছু এগিয়ে হঠাৎ এক বিপদ! একটা উঁচু জায়গা থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়ে রামহরি বিষম চোট খেলে। তার পক্ষে দু-চারদিনের মধ্যে আর পথ-চলা অসম্ভব।

বিমল হতাশ ভাবে বললে, 'আমাদের সমস্ত স্পিড ব্যর্থ হল—এখন এইখানেই বসে থাকতে হবে! রামহরি, তুমিই আমাদের বিপদে ফেললে দেখছি!'

রামহরি অত্যন্ত অপরাধীর মতো দুঃখিত স্বরে বললে, 'কী করব খোকাবাবু, আমি তো সাধ করে আছাড় খেয়ে তোমাদের বিপদে ফেলিনি! তোমরা বরং এক কাজ করো। আমাকে এখানে কোনও লোকের বাড়িতে রেখে তোমরা এগিয়ে যাও—আমার জন্যে কেন তোমরা সব পণ্ড করবে?'

কুমার বললে, 'সে হয় না রামহরি! যত বিপদই আসুক, আমাদের তোমার কাছেই থাকতে হবে!'

বিমল বললে, 'এখানে আর তাঁবু খাটিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাজ নেই। যতদিন না রামহরি সেরে ওঠে, ততদিন কারুর বাড়িতে অতিথি হয়ে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে।'

হিমালয়ের এ-অঞ্চলের লোক অতিথি-সৎকারের জন্যে বিখ্যাত! এখানে অনেক জায়গাতেই বাজার-হাটের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, পয়সা খরচ করেও সময়ে সময়ে জিনিস পাওয়া সম্ভব নয়, তাই মানস সরোবরের তীর্থযাত্রীরা গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করেই পথখরচের টাকা বাঁচাতে পারে। সুতরাং আমাদেরও আশ্রয়ের অভাব হল না।

দুদিন এখানেই কাটল—রামহরির আরও দিন-কয়েক বিশ্রাম দরকার।

তৃতীয় দিন বৈকালে বিমল বললে, 'শুনছি এখানে এক মস্ত উতরাই আছে, প্রায় দু-মাইল ধরে। চলো তো, আমরা তিনজনে সেই উতরাইটা একবার দেখে আসি, রামহরি সে পথে চলতে পারবে কি না, সেটা আগে জানা দরকার।'

আমরা এখন মালপা নামক স্থানের কাছে আছি। এখানে বনজঙ্গল শেষ হয়ে হিমালয়ের বৃক্ষশূন্য রুক্ষ ঊর্ধ্বস্তর আরম্ভ হয়েছে। আর্যসুলভ দীর্ঘ নাক, আয়ত চক্ষু ও সুগোল কপোলের দেশ ছেড়ে তিব্বতের খুব কাছে এসে পড়েছি। এ-জায়গাটায় তিনটি রাজ্যের মিলন হয়েছে—ভারত, নেপাল ও তিব্বত।

কালী নদীর ওপার থেকে দেখা যাচ্ছে নেপালের ঝাউ ও দেবদারু গাছের বন। আশে-পাশে পাখিদের গানের সভা বসেছে, দূরে দূরে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা ঝরছে—যেন চকচকে জলের ফিতা ঝুলছে! নির্জনতা এখানে যেন ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে।

তারপর সেই উতরাই দেখলুম—এটি এখানকার প্রসিদ্ধ উতরাই! পাহাড়ের ঢালু গা প্রায় সোজা হয়ে নীচে—নীচে—আরও কত নীচে যে নেমে গেছে তা জানি না, মানুষের পক্ষে এ-পথে দু-পায়ে খাড়া হয়ে নামা একেবারেই অসম্ভব, লাঠির সাহায্যে প্রায় বসে বসেই নামা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষলতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই—আছে কেবল ধসে পড়া ছোটো-বড়ো শৈলখণ্ড, একবার পা ফসকালেই দেহের সঙ্গে আত্মার সকল সম্পর্ক ঘুচে গিয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে!

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'রামহরিকে নিয়ে তিন-চারদিন পরেও হয়তো এ-পথ দিয়ে নামা চলবে না! স্পিড বাড়িয়ে এতটা এগিয়েও কোনও লাভ হল না, ভৈরব হয়তো শীঘ্রই আমাদের নাগাল ধরবে। অদৃষ্টের মার, উপায় কী?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিমান অদৃষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল—মনে করলে এখনও বুকের কাছটা ধক-ধক করে ওঠে!

সেই মূর্তিমান অদৃষ্ট আমাদের পিছন থেকে কঠিন কৌতুকের স্বরে বললে, 'এই যে বন্ধুর দল! নমস্কার!'

আমরা তিনজনেই চমকে ফিরে দাঁড়ালুম!

আমাদের কাছ থেকে চার-পাঁচ হাত তফাতে একদল লোক ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছে! সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে ভৈরব বিশ্বাস, তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ দুটো যেন আগুনের ফিনিক ছড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ ওষ্ঠাধরে ঝরছে শিশুর মতো সরল ও মিষ্ট হাসি! এবং তার হাতে রয়েছে একটা দোনলা বন্দুক।

ভয়ে-ভয়ে লক্ষ করলুম, তার সঙ্গীদেরও কারুর হাতে মোটা লাঠি, কারুর হাতে বর্শা, কারুর হাতে তরোয়াল, কারুর হাতে ছোরা!

আর, আমরা একেবারেই নিরস্ত্র!

শুনেছি বিমলের গায়ে অসুরের মতো শক্তি এবং কুমার ও আমিও দুর্বল নই। কিন্তু দশ-বারোজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে আমরা তিনজনে খালি হাতে কী করতে পারি?

পিছনে খাড়া উতরাই—পালাবারও পথ নেই!

বিমল কিন্তু একটুও দমল না। দু পা এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বললে, 'ভৈরববাবু যে! এত শীঘ্র আপনার চন্দ্রবদন দেখতে পাব বলে আশা করিনি।'

ভৈরব বললে, 'কিন্তু আমার মনে বরাবরই আশা ছিল যে, শীঘ্রই তোমাদের দেখতে পাব।'

বিমল বললে, 'আপনার আশা সফল হয়েছে, আপনি ভাগ্যবান। এখন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান, আমরা বাসায় ফিরব।'

ভৈরব একগাল হেসে দু-পাটি বড়ো বড়ো হলদে দাঁত বার করে বললে, 'এত ব্যস্ত কেন? এসো না, খানিকক্ষণ গল্প করি।'

—'আমাদের এখন গল্প করবার সময় নেই বলে বড়ো দুঃখিত হচ্ছি। পথ ছাড়লে বাধিত হব।'

—'কিন্তু গল্পে যখন তোমার আপত্তি, তখন দয়া করে আমার দুটো উপকার করে যাও।'

—'কী উপকার, আজ্ঞা করুন।'

—'তোমরা কোন দেশে যেতে চাও বলো, আর সেই ম্যাপখানা আমাকে দিয়ে যাও। তারপর তোমরা স্বর্গে বা নরকে যেখানেই যাও, আমি আর কোনও আপত্তি করব না।'

বিমল বললে, 'মাপ করবেন ভৈরববাবু, আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব না।'

—'পারবে না?'

—'না। প্রাণ গেলেও নয়।'

—'দিলীপ, তোমারও কি ওই মত?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। ও ম্যাপ আমার সম্পত্তি, আপনাকে দেব কেন?'

ঘুমন্ত বাঘ যেন জেগে উঠল! ভৈরব ভীষণ গর্জন করে বললে, 'মিথ্যা কথা! ও ম্যাপে তোমার কোনও অধিকার নেই। তোমার ঠাকুরদা আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করে ওই ম্যাপ চুরি করেছিল,—তুমি হত্যাকারীর বংশধর! আজ আমি ওই ম্যাপ আবার আদায় করে তোমাকেও প্রাণে মেরে প্রতিশোধ নেব। আমি দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার পিতৃহত্যাকারীর বংশ রাখব না! তোমার বাবাকে নরকে পাঠিয়েছি, আজ তোমার পালা!'

এই অদ্ভুত কথা শুনে আমি বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

বিমল ধীর স্বরে বললে, 'ভৈরববাবু, আপনার মতো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না।'

ভৈরব মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'ছোকরা, তোমার বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ম্যাপ চাই!'

—'ম্যাপ আপনি পাবেন না।'

—'এখনও ভেবে দ্যাখো! নইলে যে-শাস্তি আমি দেব, তোমরা তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'ভৈরববাবু, আমাদের আপনি চেনেন না, তাই শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন! আমরা হাসতে হাসতে মরতে পারি।'

—'মৃত্যু? সে তো খুব সহজ ব্যাপার! কিন্তু বেঁচে বেঁচে তোমরা কি কখনও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছ? ম্যাপ না পেলে আজ আমি তোমাদের সেই শিক্ষাই দেব!'

বিমলের মুখে হাসি তখনও মেলাল না। সে স্থির ভাবেই বললে, 'আমরা তিনজন, আপনারা দশ-বারো জন। আমরা নিরস্ত্র, আপনারা সশস্ত্র। কাজেই সমস্ত শাস্তি আজ আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে। কিন্তু প্রাণ থাকতে ম্যাপ আমরা দেব না।'

ভৈরব হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'বেশ, দেখা যাক! শ্যামা! সিধু! তোরা সবাই মিলে ওদের হাতগুলো দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যাল তো! তারপর ওদের জামাকাপড় হাতড়ে দেখ, ম্যাপখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!'

তারা পিছমোড়া করে আমাদের হাতগুলো বেঁধে ফেললে—আমরা কোনওই বাধা দিলুম

না।—অকারণে বাধা দিয়ে লাভ কী? তারপর আমাদের জামাকাপড় তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু ম্যাপ কোথাও পাওয়া গেল না!

বিমল যে ম্যাপখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, আমিও তা জানতুম না। সে-সময়ে আমার মন এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে, ম্যাপের সন্ধান জানলে সকলের প্রাণরক্ষার জন্যে আমি হয়তো বলে ফেলতুম!

ভৈরব গজরাতে গজরাতে বললে, 'হুঁ, ম্যাপখানা তাহলে দেবে না?'

বিমল বললে, 'না বন্ধু, না! খুঁজে পাও তো দ্যাখো না!'

ভৈরব বললে, 'ম্যাপখানা তাহলে কী করে আদায় করি, এইবারে সেইটেই দ্যাখো!... ওরে, ওদের প্রত্যেকের পাদুটো আলাদা আলাদা দড়িতে বেঁধে ফ্যাল তো!'

আমাদের ধাক্কা মেরে মাটিতে পেড়ে ফেলে, এক-একটা দড়িতে এক-একজনের পা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। আচ্ছন্নের মতন হয়েও ভাবতে লাগলুম, এই নরপিশাচ আমাদের নিয়ে কী করতে চায়?

ভৈরব আবার হুকুমজারি করলে, 'এইবারে একগাছা মোটা দড়িতে ওদের পায়ে-বাঁধা দড়ি-তিনগাছা শক্ত গেরো দিয়ে বাঁধ দেখি!'

তৎক্ষণাৎ তার আদেশ পালিত হল।

—'আচ্ছা, এখন পাহাড়ের ধার দিয়ে ওদের নামিয়ে দিয়ে মোটা দড়িগাছা উপরে কোথাও বেঁধে রাখ। অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাতে এ-পথে কোনও লোক আসবে না। সারা-রাত ওরা লাউ-কুমড়োর মতো শূন্যে ঝুলতে থাক!'

সেই ভয়ানক প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে দেরি হল না!

এখন আমরা শূন্যে দোদুল্যমান! নীচের দিকে তাকিয়েই শিউরে চোখ মুদে ফেললুম—দড়ি যদি ছিঁড়ে যায়, একেবারে দুইশো কি আড়াইশো ফুট তলায় গিয়ে পড়ে আমাদের দেহগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না!

উপর থেকে চেঁচিয়ে ভৈরব বললে, 'এখনও ম্যাপ কোথায় রেখেছ, বলো!'

বিমল সহজ স্বরেই বললে, 'বন্ধু, বলব না!'

ভৈরব বললে, 'বেশ, তাহলে সারারাত দোল খাও। কাল সকালে আমি আর একবার আসব। তখনও যদি ম্যাপ না দাও তো, তোমাদের ওই-ভাবে ঝুলিয়ে রেখেই বিদায় হব!' তারপর হাহাহাহা করে একটা শয়তানি হাসির শব্দ, তারপর সব চুপচাপ!

নিম্নমুণ্ডে এমন করে শূন্যে ঝুলে আমরা কি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব? এখনই আমার দেহের রক্ত মুখে নেমে এসেছে এবং পা দুটো ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে!

দিনের আলো নিবে গেছে বটে, কিন্তু আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে—চারিদিকে আলো-আঁধারির লীলা। এবং দূর থেকে স্তব্ধতা ভেঙে একটা বাঘ ডেকে উঠল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাচের টুকরো

নরকের পাপীরা কী রকম যন্ত্রণাভোগ করে জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই তা আমাদের এখনকার যন্ত্রণার চেয়ে বেশি নয়। দেহের কষ্ট যে এত বেশি হতে পারে এটা ছিল আমার কল্পনাতীত।

নিচু দিকে মুখ করে ঝুলতে ঝুলতে আকাশের চাঁদ, পাহাড়ের ঝরনা, দূর সমতল ক্ষেত্রের আঁকাবাঁকা নদীর গলানো রুপোর রেখা সব স্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু সে-সমস্তই আজ যেন বিকৃত আকার ধারণ করেছে! মানুষ তো চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে, মন যখন অসহ্য কষ্টে ছটফট করে, বাইরের সুন্দর জগতে চোখ তখন ব্যর্থ!

মনের ও দেহের ভিতরে যা হচ্ছে, ভাষায় তা বর্ণনা করবার অসম্ভব চেষ্টা আর করব না। বাঘের ডাক শুনে মনে হচ্ছে, সে যদি এখন এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারত, তাহলে সুখময় মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমি এখনই আনন্দে হেসে উঠতুম! ভৈরব ঠিকই বলেছে, বেঁচে বেঁচে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা ভয়ানকই বটে!

আর্তস্বরে আমি বলে উঠলুম, 'বিমল, বিমল! কেন তুমি ম্যাপখানা দিলে না! আমরা যদি মরি, গুপ্তধন ভোগ করবে কে?'

বিমল প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'আজ ম্যাপ দিইনি, কাল সকালেও দেব না!'

আমি বললুম, 'বলো কী! তোমার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে না?'

বিমল হেসে উঠে বললে, 'কষ্ট হচ্ছে না! হচ্ছে বইকি! কিন্তু দেহের কষ্ট আমার মনকে অধীর করতে পারে না! জানো দিলীপ, ইউরোপে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকদের রাজত্বে কয়েদিদের অমানুষিক ভাবে শাস্তি দেবার জন্যে ভীষণ সব যন্ত্র ছিল। সে-সব যন্ত্র যে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিত, তার তুলনায় আমাদের যাতনা যথেষ্ট মোলায়েম। কোনও কোনও যন্ত্র মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে তার দেহের সমস্ত হাড় মড়মড়িয়ে ভেঙে দিত! কিন্তু তেমন যন্ত্রণাও মুখ বুজে সহ্য করে সেকালের অনেক বন্দি অপরাধ স্বীকার করেনি। বিশেষে আমরা যখন স্বেচ্ছায় এই যাতনা বরণ করে নিয়েছি, তখন কাতর হওয়া কাপুরুষতা মাত্র।'

—'তাহলে মরণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এই যাতনা সহ্য করতে চাও?'

—'সহ্য করতে চাই না, কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? কুমার, তোমার অবস্থা কেমন?'

কুমার কেমন জড়িত, অস্বাভাবিক স্বরে বললে, 'তোমারই মতন।'

—'কুমার, তোমার কি বড়ো বেশি কষ্ট হচ্ছে? তোমার কথা অমন অস্পষ্ট কেন?'

—'আমার মুখে একখানা ধারালো কাচের টুকরো আছে।'

—'কাচের টুকরো?'

—'হুঁ। ওরা যেখানে ফেলে আমার পা বাঁধছিল, সেইখানে পাথর-কুচির সঙ্গে এই ভাঙা কাচের ফালি পড়েছিল। আমি সকলের অগোচরে সেটা মুখে পুরে ফেলেছি!'

বিমল ঝুলতে ঝুলতে মহা আনন্দে একটা দোল খেয়ে বললে, 'কুমার, তুমি বাহাদুর! জয় কুমার বাহাদুরের জয়!'

তার আনন্দ-ধ্বনি আমার কানে এমন বেসুরো শোনাল! পাগলের মতো ভাঙা কাচের টুকরো মুখে পুরে এমন কী বাহাদুরের কাজ করেছে আমি তো কিছুতেই সেটা বুঝতে পারলুম না!

বিমল আবার সহর্ষে বলে উঠল, 'এতবড়ো আবিষ্কারের কথা এতক্ষণ তুমি আমাকে বলোনি!'

—'ভয়ে বলিনি। কী জানি শত্রুরা যদি কেউ উপরে লুকিয়ে থাকে।'

—'না, তারা আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গিয়েছে। জীবনে অনেকবার অনেক বিপদে পড়েছি, সে-সব হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ এই ভৈরব আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, ভেবেছিলুম আমাদের লীলাখেলা এইবারে বুঝি সত্যি-সত্যিই ফুরুল—মুক্তির আর কোনও উপায় নেই! কিন্তু ধন্য কুমার, ধন্য তোমার উপস্থিত বুদ্ধি! হয়তো আমাদের মুক্তির উপায় তোমার মুখেই আছে! একবার যদি হাত দুটো খোলা পাই! তুমি তো অনেক রকম 'বারে'র এক্সারসাইজ করেছ, দেহটা দুমড়ে মুখ তুলে কাচ দিয়ে আমার হাতের দড়ি কাটতে পারো কি না দ্যাখো না!'

এই অদ্ভুত লোক দুটির আশ্চর্য কথাবার্তা আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম! এরা বিপদকে ডরায় না, সাক্ষাৎ-মৃত্যু নিয়ে খেলা করে, শত কষ্টে অটল থাকে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও কখনও হারায় না। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারলুম না যে, কুমার কী করে বিমলের কথামতো অসাধ্যসাধন করবে!

আমরা তিনজনে প্রায় পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে ঝুলছিলুম। কুমার সেই অবস্থাতেই নিজের দেহের ঊর্ধ্বদিকটা দুমড়ে উঁচু হয়ে উঠল এবং বিমলও একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজের দেহটা ঘুরিয়ে কুমারের দিকে পিছন ফিরলে এবং তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুখানা যথাসম্ভব নামিয়ে কুমারের মুখ-বরাবর আনলে। কুমার তখন কাচের টুকরোটা দাঁতে চেপে ধরে বিমলের হাতের দড়ি কাটবার চেষ্টা করতে লাগল!

বিস্ময়ে, আগ্রহে ও কৌতূহলে নিজের অমন বিষম যন্ত্রণাও ভুলে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে চাঁদের আলোতে আমি তাদের কাণ্ড দেখতে লাগলুম।

একখণ্ড ভাঙা কাচ,—অকেজো বলে কবে কে এখানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে! শত্রুদের হস্তগত হয়ে আমি যখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে উঠেছিলুম, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কোনও কথাই ভাবতে পারিনি, কুমারের স্থিরবুদ্ধি তখনই বুঝে নিয়েছিল, এই কাচের ফালিই একটু পরে আমাদের কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে উঠবে! আজ এই মস্ত শিক্ষা পেলুম—আজ থেকে ধুলোকণাকেও অবহেলা করব না;—মস্তিষ্ক থাকলে, কাজে লাগাতে জানলে পৃথিবীতে কিছুই অকেজো নয়!

কিন্তু কুমারের কাজটা খুব সহজসাধ্য হল না। একে কুমার বদ্ধপদে শূন্যে ঝুলছে, তায় তার দেহের অমন অস্বাভাবিক দুমড়ানো অবস্থা, তার উপরে ভরসা কেবল দাঁত ও একখণ্ড ভাঙা

কাচ! মাঝে মাঝে আবার সোজা হয়ে ঝুলে পড়ে কুমার হাঁপ ছাড়ে, মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় বা অন্য কারণে বিমলের ঝুলন্ত দেহ ঘুরে যায়!

প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর বিমলের হাতের বাঁধন কাটা গেল।

বিমল নিম্নমুণ্ডে ঝুলতে ঝুলতেই বিপুল উৎসাহে দুই বাহু ছড়িয়ে বলে উঠল, 'আর কারুর কোনও ভয় নেই! কুমার, তুমি একটি জিনিয়াস! তুচ্ছ একখানা ভাঙা কাচ দিয়ে আজ তুমি তিন-তিনটে মূল্যবান মানুষের প্রাণরক্ষা করলে!'

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু এখনও আমরা কলার কাঁদির মতো শূন্যে ঝুলছি!'

বিমল বললে, 'জীবনে আর কখনও হয়তো এ-ভাবে শূন্যে ঝোলবার অবসর পাবে না, আরও মিনিট-কয়েক শূন্যে ঝোলার আমোদ ভোগ করো ভায়া! কয়-মিনিটের জন্যে বিদায়!' বলেই সে খুব জোরে দুবার দোল খেয়ে নিজের দেহকে উপরদিকে দুমড়ে ফেলে ঊর্ধ্বে উঠে মূল মোটা দড়িগাছা চেপে ধরলে এবং তারপর এক হাত মূল দড়িতে রেখে আর এক হাতে আপনার পায়ের বাঁধন খুলতে লাগল।

পায়ের বাঁধন খুলতে বেশি দেরি লাগল না। বিমল তখন দড়ি ধরে সড়-সড় করে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরেই সে উপর থেকে বললে, 'এইবার আমি তোমাদের তুলছি!'

আমাদের দুজনের দেহ ওজনে চার মনের কম হবে না। কিন্তু বিমল অনায়াসেই আমাদের টেনে তুলতে লাগল।

পাহাড়ের উপরে গিয়ে আমাদের দেহ যখন বন্ধনমুক্ত হল, তখন পূর্ব-আকাশে রাঙা পদ্মের মতো তাজা রং ফুটে উঠেছে!

আমার দেহের অবস্থা এমন যে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আবার অবশ হয়ে বসে পড়লুম। অথচ এমন অবস্থাতেও বিমলের শক্তি ফুরিয়ে যায়নি—একসঙ্গে আমাদের দুজনের দেহ টেনে উপরে তুলেছে!

পাহাড়ের উপরে আমাদের জুতোগুলো পড়ে রয়েছে, আমাদের পা বাঁধবার সময়ে ভৈরবের দল ওগুলো খুলে নিয়েছিল।

নিজের একপাটি জুতো হাতে তুলে নিয়ে বিমল মৃদু হেসে বললে, 'এ জুতোর গুপ্তরহস্য, কুমার, জানো তো?'

কুমারও হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, 'জানি।'

আমি সকৌতূহলে বললুম, 'জুতোর গুপ্তরহস্য! সে আবার কী?'

বিমল বললে, 'শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে আমার খালি এই ভাবনাই হচ্ছিল যে, পাছে ভৈরব আমার জুতো চুরি করে! কিন্তু তুচ্ছ জুতোগুলো নেড়েচেড়ে দেখা সে দরকার মনে করেনি। দিলীপ, যার জন্যে এত হানাহানি, এই জুতোই হচ্ছে তার ভাণ্ডার! দ্যাখো!' বলেই সে জুতোর গোড়ালি থেকে খুদে ড্রয়ারের মতো একটা অংশ টেনে বার করলে এবং তার মধ্যে রয়েছে গুপ্তধনের সেই মূল্যবান ম্যাপ!

আমি সবিস্ময়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম!

কুমার বললে, 'দিলীপ, বিমলের এই স্পেশ্যাল জুতোর চোরা-কুঠুরি আফ্রিকাতেও আর একবার আমাদের মুখরক্ষা করেছিল!'

আমি বললুম, 'ভৈরব যার লোভে এত মহাপাপ করছে, আবার হাতে পেয়েও তাকে হারালে!'

কুমার বললে, 'এই হাতে পেয়েও হারানোর দুঃখ হচ্ছে দুনিয়ার আর একটা বিশেষত্ব! ভগবান আমাদের চারপাশে রয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তবু তাঁকে দেখতে না পেয়ে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে দূরে-দূরান্তরে আকুল হয়ে ছুটে যায় আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভগবানকে খুঁজে না পেয়ে হাহাকার করতে থাকে!'

হঠাৎ বিমল দাঁড়িয়ে উঠে কান পেতে কী শুনতে লাগল। বললে, 'নীচে যেন কাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে! দাঁড়াও, একটু এগিয়ে দেখে আসি!' বলেই সে পথের দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বললে, 'আট-দশজন লোক আসছে। নিশ্চয় ভৈরবের দল সকাল হয়েছে দেখে আবার আমাদের আদর করতে আসছে!'

শুনেই আমাদের সমস্ত শ্রান্তি পালিয়ে গেল, একলাফে আমরা উঠে দাঁড়ালুম।

বিমল ব্যস্ত স্বরে বললে, 'ওদের সঙ্গে লড়বার শক্তি আমাদের নেই—আমরা নিরস্ত্র! আমাদের পালাতেই হবে! কিন্তু কোনদিকে পালাই? আমাদের ফেরবার পথ দিয়েই ওরা আসছে! উতরাই দিয়ে নামা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই! এসো, এসো—জলদি!'

আমরা উতরাইয়ের পথ ধরলুম—শুনেছি এই উতরাই দুই মাইল লম্বা। অতিশয় সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে হবে—কারণ প্রতিপদেই এখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা!

কিন্তু পিছনে আসছে যমদূতের দল, ধরতে পারলে তারা আমাদের কুকুরের মতো মেরে ফেলবে! তাদের ভয়ে আমরা সমস্ত সাবধানতা ভুলে গেলুম! পদে পদে মৃত্যুকে সামনে রেখে যে-রকম মরিয়ার মতো আমরা সেই বন্ধুর, প্রায়-খাড়া চড়াইয়ের পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নামতে লাগলুম, কেউ তা দেখলে নিশ্চয় আমাদের বদ্ধপাগল বলে মনে করত! সেদিন যে আমরা মরিনি কেন, সেটা ভাবলে এখনও বিস্মিত হই! প্রত্যেক লাফেই আমরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেক বারেই মৃত্যু যেন দূরে সরে গিয়ে আবার পরের বারের জন্যে অপেক্ষা করছে!

মাইল-খানেক পথ নেমে আমি শুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বিমল, আমার দম বেরিয়ে গেছে—আমি আর পারছি না!'

বিমল এক টান মেরে আমাকে খাড়া করে তুলে বললে, 'ভৈরব এতক্ষণে আমাদের পলায়ন আবিষ্কার করেছে! সে-ও হয়তো সদলবলে এই পথেই তেড়ে আসছে!'

কুমার বললে, 'আসছে কী—ওই এসে পড়েছে! উপর দিকে চেয়ে দ্যাখো!'

সত্য! উতরাইয়ের অনেক উপরে দেখা গেল, একদল লোক তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে আসছে!

শরীরের শেষ শক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার আমি নামতে লাগলুম। ওই রাক্ষসদের কবলে যাওয়ার চেয়ে এই পাহাড় থেকে পড়ে মরা ঢের ভালো!

কিন্তু আমার গতি ক্রমেই কমে আসছে, হাঁপের চোটে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে; কাল সারা-রাত ওরা পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তার উপরে এই সাংঘাতিক পথ, আমার পা এখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল, আবার আমি আচ্ছন্নের মতো হয়ে শুয়ে পড়লুম।

ভৈরবের দল তখন বেশ কাছে এসে পড়েছে, তাদের তো সারা রাত হেঁটমুখে শূন্যে দোল খেতে হয়নি, তাই সতেজ দেহে এত শীঘ্র এতখানি পথ নেমে আসতে পেরেছে! বিপদের উপর বিপদ! তারা আমাদের লক্ষ্য করে বড়ো বড়ো পাথরবৃষ্টি করতে লাগল! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দরকার হবে না ভেবে ভৈরব আজ বোধহয় বন্দুকটা সঙ্গে আনেনি, বন্দুক থাকলে এতক্ষণে আমাদের আর দেখতে-শুনতে হত না!

বিমল বললে, 'ওঠো ভাই দিলীপ, লক্ষ্মীটি। আর বেশি পথ নেই—আমরা তো নীচে এসে পড়েছি!'

আবার ধুঁকতে ধুঁকতে ওঠবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বৃথা চেষ্টা! আমার দেহে আর একফোঁটা শক্তি নেই! ক্ষীণ স্বরে বললুম, 'বিমল! কুমার! আমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমরাও আর মরণকে ডেকে এনো না! তোমরা পালাও—আমার আয়ু ফুরিয়েছে!'

শত্রুর দল আরও নিকটস্থ হয়ে হই-হই রবে চিৎকার করে উঠল! তারপরেই একরাশ পাথর বৃষ্টি! একখানা পাথর কুমারের মাথা ঘষে চলে গেল—তার মুখের উপর দিয়ে দর-দর ধারে রক্ত পড়তে লাগল!

বিমল তাড়াতাড়ি নিজের রুমাল বার করে কুমারের মাথাটা বেঁধে দিলে, তারপর প্রদীপ্ত চক্ষে ঊর্ধ্বমুখে ভৈরবদের উদ্দেশে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ক্রোধবিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি দিন পাই, এই রক্তপাতের প্রতিশোধ নেব!'

আমি কাতর স্বরে বললুম, 'হয় ওদের ম্যাপ ফিরিয়ে দাও, নয় এখান থেকে পালাও!'

বিমল একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে—তার মুখে দুশ্চিন্তার কোনও চিহ্নই নেই! তারপরেই সে হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ে অতি-অনায়াসে আমাকে ঠিক শিশুর মতোই পিঠে তুলে নিলে! তারপর গায়ের কাপড় দিয়ে আমাকে তার পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আবার নীচের দিকে দ্রুতপদে নামতে লাগল! সেই প্রায়-মূর্ছিত অবস্থাতেও তার অসাধারণ গায়ের জোর দেখে আমার মন সচকিত হয়ে উঠল! তার মাংসপেশিগুলো কি মহাশক্তির গুপ্তমন্ত্রে তৈরি, শত ব্যবহারেও তারা নিস্তেজ হতে জানে না?

খানিকক্ষণ পরে উতরাই যখন শেষ হল তখন ভৈরবদের দল আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত-ত্রিশ উপরে! আর বোধহয় ওদের খপ্পর থেকে রক্ষা নেই!

সামনেই কালী নদী, কিন্তু তার রূপ আজ বদলে গেছে। তার জলে এখন নূপুর-নিক্কণের মতো মিষ্টধ্বনি নেই, নর্তকীর লাস্যলীলাও নেই! নদীর হাত-ত্রিশ চওড়া খাদের ভিতরে ভীষণ-প্রবল জলের ধারা যেন রুদ্ধ ক্রোধে ও আক্রোশে ফুলে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—যেমন ভয়ঙ্কর তার গতি, তেমনি স্তম্ভিত-করা তার গর্জন! তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি করে সূর্যালোকে চকচকে ইস্পাতের দীর্ঘ অস্ত্রের মতো লকলক করতে করতে লাফাতে লাফাতে ছুটে যাচ্ছে—টগবগ করে ফুটছে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা! চিরস্থির প্রস্তর-রাজ্যে সেই মৃত্যুরূপিণী তরঙ্গিনীর

অস্থিরতা দেখে প্রাণ যেন ভয়ে শিউরে উঠল! কিন্তু তার এই হঠাৎ পাগলামির কারণ তখন বুঝতে পারিনি—পরে বুঝেছিলুম।

সেই কালী নদীর উপরে রয়েছে কাঠ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ছোটো একটা পলকা সেতু—উন্মত্ত তরঙ্গের ধাক্কার পর ধাক্কায় তা থর-থর করে কাঁপছে!

বিমল ও কুমার সেইখানে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে বোধহয় কী করবে তাই ভাবতে লাগল! সেই পলকা সাঁকো এখন আমাদের ভার সইতে পারবে কি না, সন্দেহ হয়!

ইতিমধ্যে ভৈরবদের দলের একটা লোক সর্বাগ্রে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল—তার হাতে একখানা মস্ত ছোরা!

কুমার চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই মাটি থেকে প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে নিলে এবং সবেগে ও সজোরে সেই লোকটার দিকে নিক্ষেপ করলে!

আমার মনে হল, সশব্দে হতভাগ্যের মাথার খুলি ফেটে গেল—একটিমাত্র চিৎকার করেই লোকটা ধুপ করে মাটির উপরে ঠিকরে পড়ে ছটফট করতে লাগল! তাকে নিশ্চয় আর পৃথিবীর আলোক দেখতে হয়নি। চোখের সামনে মানুষ বধ এই আমি প্রথম দেখলুম—শিউরে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম!

—'কুমার, কুমার, কী করি?'

—'চলো, পোল দিয়ে ওপারে!'

—'তারপর?'

—'লড়তে লড়তে মরব!'

—'বহুৎ-আচ্ছা! বিছানায় শুয়ে বুড়ো হয়ে রোগে ভুগে মরার চেয়ে সে মরণ ঢের ভালো মরণ! শত্রু মেরে মরব!'

কুমার ও আমাকে পিঠে নিয়ে বিমল সেতুর উপর দিয়ে ছুটল—আমি সভয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের পিছনে পিছনে শত্রুদেরও একজন লোক তরোয়াল উঁচিয়ে তেড়ে আসছে এবং তারও পরে আরও তিনটে লোক হুড়মুড় করে সেতুর উপরে এসে পড়ল! এত চেষ্টার পরেও বোধহয় এ-যাত্রা আর রক্ষা নেই!

—কিন্তু এমন সময়ে ঘটল এক কল্পনাতীত ঘটনা!

আচম্বিতে কালী নদীর সেই সেতু ভীষণ শব্দে ক্ষুধিত জলের গর্ভে মড়মড়িয়ে ভেঙে নেমে গেল!

কুমারের পর আমাকে নিয়ে বিমল তখন সবে ওপারে পা দিয়েছে!

যে-চারজন শত্রু সেতুর উপরে ছিল, তারাও তীব্র আর্তনাদে চারিদিক কাঁপিয়ে তলিয়ে গেল! দুটো দেহ জলের উপরে একবার ভেসে উঠে এবং আর একবার চিৎকার করে বিদ্যুৎ-বেগে পাক খেয়ে আবার অদৃশ্য হল!

বিমল ও কুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

ওপারেও স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভৈরব ও তার সঙ্গীরা!

চোখের সুমুখে এ কী অভাবিত দুঃস্বপ্নের অভিনয়! এও কি সম্ভব?

মাঝখান দিয়ে নির্দয় কৌতুকে মৃত্যু-প্রলাপে মেতে ও অট্টহাস্য করে বেগে ছুটে চলেছে উন্মাদিনী কালী নদী—সেতুর ভাঙা কাঠগুলো পর্যন্ত কোথায় ভেসে গিয়েছে তার আর কোনও ঠিকানাই নেই! সমস্ত এক মুহূর্তে গ্রাস করে জীবন্ত এক বিরাট জলরূপী অজগরের মতো নদী পাকসাট খাচ্ছে, একবার স্ফীত ও উঁচু হয়ে উঠছে, আবার খল-খল চামুণ্ডা-হাসি হেসে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে, এবং বারে বারে প্রচণ্ড হিংসায় হিমালয়ের দেহ যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে কূলে কূলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে!

আমি বললুম, 'আর নয় বিমল, এইবার আমাকে ঘাড় থেকে নামাও!'

বিমল আমাকে নামিয়ে দিলে।

ও আবার কার স্বর? কে চেঁচিয়ে কাঁদে, কে সাহায্য চায়?

তীরের কাছে, জলের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে ঝুলছে সেই লোকটা—যে তরবারি নিয়ে আমাদের পিছনে ধেয়ে আসছিল!

আমাদের উদ্দেশে সক্রন্দনে সে বললে, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! ঢেউ আমাকে টানছে—আর আমি পারছি না!'

স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে বুকে দুই হাত বেঁধে বিমল বললে, 'যা, তুই নরকে যা! একটা দড়ি-টড়ি ফেলে দিয়ে হয়তো তোকে আমি বাঁচাতে পারতুম, কিন্তু তোকে আমি বাঁচাব না!'

—'তোমার পায়ে পড়ি, এমন কাজ আমি আর কখনও করব না! বাঁচাও—গেলুম, গেলুম, বাঁচাও—বাঁচা—' নদীর স্ফীত জলরাশি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঠিক কোনও হিংস্র দানবের মতো তাকে যেন কোঁত করে গিলে ফেললে!

কাঁপতে কাঁপতে আমি চোখ মুদে ফেললুম—এ কী ভয়ানক মৃত্যু!

ওপার থেকে এতক্ষণ পরে ভৈরব কথা কইলে! কর্কশ চিৎকার করে বললে, 'আমাকে বড়ো ফাঁকি দিলি তোরা! আচ্ছা, এর পরের বারে তোদের সঙ্গে আবার যখন দেখা হবে—'

—'তখন তোকেই আমি আগে বধ করব!' বলেই বিমল খিল-খিল করে হেসে উঠল!

ব্যর্থ আক্রোশে আমাদের দিকে একখানা পাথর ছুড়ে ভৈরব বললে, 'জীবন থাকতে আমি তোদের ছাড়ব না!'

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে তুলে ধরে বিমল ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'এই দেখ সেই ম্যাপ! নিবি তো এগিয়ে আয়!'

ভৈরব গর্জন করে উঠল!

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আর দরকার নেই বিমল, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই!'

সেতুভঙ্গের কারণ পরে শুনেছিলুম।

বেশি বৃষ্টি হলে, কিংবা বেশি গরমে হিমালয়ের টঙে বরফ গলে গেলে, কালী নদীর জল ক্ষেপে উঠে এখানকার পলকা সেতু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রতি বৎসরেই নাকি এমন ব্যাপার হয়।

তবু কেন যে এখানে বড়ো ও দৃঢ় সেতু তৈরি করা হয় না তা জানি না, কেননা মানস সরোবরের যাত্রীদের ও স্থানীয় লোকদের পক্ষে এই সেতুটি অত্যন্ত দরকারি।

কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যথাসময়ে এই সেতু ভাঙার মধ্যে আমি ভগবানের মঙ্গলময় হস্তই দেখতে পাই। এই সেতু আত্মদান করে আমাদের বাঁচালে এবং সেই সঙ্গে পাপীদেরও শাস্তি দিলে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোলাপ ফলের মুল্লুক

'নির্পানীকা সড়ক' নামে পথ বটে, কিন্তু আসলে বিপথ। দুইক্রোশব্যাপী বিষম এক চড়াই, ওঠবার সময়ে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যায়, কিন্তু কোথাও জল নেই! কালী নদীর সাঁকো ভেঙে গেলে এই পথই হয় যাত্রীদের অবলম্বন। কাজেই অর্ধ-মৃতদেহ নিয়ে এই বিপথ দিয়েই আমাদের ফিরে আসতে হল।

পথ হোক বিপথ হোক, প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আসতে পারলুম, এইটুকুই সৌভাগ্যের কথা! ভৈরব নিশ্চয়ই তখনও এ-পথের কথা জানতে পারেনি, নইলে আমাদের অবস্থা হত হয়তো তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো!

আমাদের সন্ধান না পেয়ে রামহরির উদ্বেগের সীমা ছিল না, বাঘাও নাকি আজ খাবার ছোঁয়নি। রাতে আমরা ফিরিনি, সকাল গেল—দুপুর গেল তবু আমাদের দেখা নেই এবং উত্থান-শক্তিহীন আহত রামহরির পক্ষে আমাদের খোঁজ নেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং সে কেবল কেঁদে-কেঁদেই সময় কাটিয়েছে!

এখন ক্ষতবিক্ষত শ্রান্ত দেহে সকলকে ফিরে আসতে দেখে সে হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, বিমলের মাথাটা দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কান্না-ভরা গলায় রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমি কি আমার সর্বনাশ করতে চাও? গতর যে চূর্ণ হয়ে গেছে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

রামহরিকে শান্ত করতে সেদিন বিমল ও কুমারের অনেকক্ষণ লেগেছিল!

ধরতে গেলে, এখন শুধু রামহরির নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা শয্যাগত হবার মতো! গায়ের ব্যথা মরতে ও ক্ষতস্থানগুলো সারতে প্রায় দুই হপ্তা লাগল। এই দু-হপ্তা আমরা আর মানস সরোবরের পথে পা বাড়ালুম না।

বিমল বললে, 'এ একরকম ভালোই হল! আমরা যে পিছিয়ে পড়ে এখানে বসে আছি, ভৈরব তা জানে না। দলবল নিয়ে নিশ্চয়ই সে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের চারিদিকে খুঁজছে! আমরা যে মানস সরোবরের দিকে যেতে চাই, তাও সে জানে না। হয়তো আমাদের খোঁজে সে এখন নেপালে ঢুকে পথ হেঁটে মরছে! আমাদের এখন উচিত হচ্ছে, তাকে আরও দূরে আর

ভুল পথে যাবার সময় দেওয়া। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমরা এখানে অলস হয়ে বসে থেকেই খুব মস্ত কাজ করছি! আহত না হলেও আমি এখন এই উপায়ই অবলম্বন করতুম!'

কুমার বললে, 'ভৈরবদের দল এখন প্রায় আধাআধি হালকা হয়ে গেছে। তারা গুণতিতে ছিল বারোজন। একজনকে আমি বোধহয় বধই করেছি, আর চারজনকে গ্রাস করেছে কালী নদী, তাহলে ওদের দলে এখন সাতজনের বেশি লোক নেই। আমরা হচ্ছি চারজন—না, বাঘাও বড়ো কম নয়, তাকে নিয়ে পাঁচজন! ভৈরবকে আর আমি ডরাই না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু ভৈরবের একটা কথায় আমি যে বড়ো দমে গিয়েছি ভাই! আমার ঠাকুরদা তার বাবাকে হত্যা করে গুপ্তধনের ম্যাপ পেয়েছিলেন? তাহলে ধর্মত এই গুপ্তধন থেকে ভৈরব বঞ্চিত হতে পারে না!'

বিমল বললে, 'আমি ভৈরবের মতো মহাপাপীর একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি কি তোমার ঠাকুরদার ইতিহাস জানো না?'

—'ও-সব কোনও কথাই আমি শুনিনি। তবে আমার ঠাকুরদা বড়োই বদরাগি মানুষ ছিলেন—বাবা একমাত্র ছেলে হয়েও তাঁর সামনে ভয়ে মুখ তুলে কথা কইতে পারতেন না!'

কুমার বললে, 'কে জানে ভৈরবের বাপ ছেলের মতোই গুণধর ছিল কি না! তোমার ঠাকুরদা হয়তো আত্মরক্ষার জন্যেই তাকে বধ করেছিলেন—যেমন আমার হাতে মরেছে ভৈরবের এক স্যাঙাত!'

বিমল বললে, 'কিছুই অসম্ভব নয়! মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, ম্যাপ যখন আমাদের কাছে, তখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না! অতএব দিন-কয় এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে খাও-দাও মজা করো, আর ভৈরব পথে পথে ঘুরে কাহিল হয়ে পড়ুক!'

দিন-কয় এ-জায়গাটার হালচাল দেখে কাটিয়ে দিলুম। আবার যাত্রা আরম্ভ করবার আগে, মাইল ত্রিশ পথ খুব সন্তর্পণে এগিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, ভৈরবরাও কোথাও লুকিয়ে আছে কি না! কিন্তু কোথাও তাদের টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না!

এ হচ্ছে থ্যাবড়া নাক ভুটিয়াদের মুল্লুক। মেয়েরাই এখানে বেশি কাজকর্ম করে, পুরুষরা বেশির ভাগ সময়ই পিতলের হুঁকায় তামাক টানতে টানতে আড্ডা দিয়ে আয়েস করে কাটায়।

এদের বিয়ে বড়ো মজার। বর আর কনে পরস্পরকে পছন্দ করলেই এবং কনের আংটি গড়াবার জন্যে বর কন্যাপক্ষকে গোটাকয়েক টাকা দিলেই বুঝতে হবে—ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল,—না আছে সেকেলে বাপ-মায়ের মত নেওয়া, না আছে কোনও আজেবাজে মন্ত্রতন্ত্র, না আছে টিকি-নাড়া পুরুত-টুরুত!

মেয়েরা রুপোর গয়না পরে বাহার দিয়ে বেড়ায়,—গলায় দোলায় সিকি বা আধুলির মালা। কায়দা করে চুল বাঁধবার শখ তাদের খুব বেশি এবং চুল বাঁধবার সময়ে তারা থুঃ থুঃ করে থুতু দিয়ে চুল ভিজিয়ে নেয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে বনগোলাপ গাছের মেলা। গোলাপ এখানে জন্মে তার বিখ্যাত কাঁটাকে ত্যাগ করেছে এবং তার ফুলও বেলফুলের মতো খুদে খুদে। গোলাপফুল বলতে আমরা যা বুঝি এরা তা বোঝে না—এরা বোঝে ও বলে গোলাপফল! স্বচক্ষে দেখলুম, ভুটিয়ারা গোলাপগাছ

থেকে টোপা কুলের মতো ছোটো লাল বা বেগুনি রংয়ের গোলাপফল পেড়ে মুখে পুরে দিচ্ছে এবং দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে! কাঁচা গোলাপফলের রং সবুজ। ওদের দেখাদেখি আমিও একটা গোলাপফল খেয়ে দেখলুম তা একটু-কষা ও একটু-মিষ্ট! আমাকে অবাক করলে এই পাহাড়ি গোলাপ!

চারিদিকে ভৈরবদের খোঁজ নিয়ে বাসায় ফিরে এসেই বিমল যা বললে, তাতে আবার আমাদের চক্ষুস্থির হয়ে গেল!

যে জুতোর গোড়ালির কুঠুরিতে গুপ্তধনের ম্যাপ লুকানো ছিল, সেই জুতোজোড়া আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

রামহরিকে ডেকে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'রামহরি, তুমি কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাইরে গিয়েছিলে?'

রামহরি বললে, 'বাইরে মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে বইকি, কিন্তু দরজায় তো তালা না দিয়ে যাইনি!'

বিমল বললে, 'তাহলে নিশ্চয় কেউ অন্য চাবি দিয়ে তালা খুলেছে! কিন্তু কে সে? এত জিনিস থাকতে সে কেবল আমারই জুতো চুরি করলে কেন? জুতোর গুপ্তরহস্য সে কি জানে?'

উত্তর পেতে দেরি হল না। বিছানার উপরে একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাতে লেখা রয়েছে

'বিমল,

তুমি যে চালাক, তা স্বীকার করি। কিন্তু অতিচালাকি দেখাতে গিয়েই তুমি ঠকে মরলে।

তোমরা নিশ্চয় ভেবেছ যে, আমরা আর এ-মুল্লুকে নেই—কেমন, তাই নয় কি? ভাবছ, আমরা ভুল পথে গিয়ে তোমাদের খুঁজে মরছি?

নিশ্চয়ই নয়! তোমাদের কাছে-কাছেই আমিও আছি, চব্বিশ ঘণ্টাই তোমাদের উপরে সতর্ক পাহারা রেখেছি, কেবল তোমাদের অসাবধানতার সুযোগ খুঁজেছি,—কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব কিছুতেই জানতে দিইনি, কারণ আমরা কাছে আছি জানলে তোমরাও সাবধান হয়ে থাকতে!

তুমি আমাকে বোকা ভেবে আমার চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলে বটে, কিন্তু আসলে তোমারই চোখে ধুলো দিলুম আমি। শত্রুদের যারা বোকা ভাবে, তারাই হচ্ছে অতিবড়ো বোকা!

কিন্তু অতিচালাকি দেখাতে গিয়ে তুমি যে ভ্রম করেছ, সে-ভ্রম আর কখনও সংশোধন করতে পারবে না।

কালী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে ম্যাপখানা দেখিয়ে তুমি প্রথম শ্রেণীর নির্বোধের মতো কাজ করেছ!

আমি তখনই ভেবে দেখলুম, তোমাদের প্রত্যেকের দেহ আর কাপড়চোপড় খুব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যে ম্যাপ পাওয়া যায়নি তা আবার তোমার কাছে এল কেমন করে?

ভেবে-চিন্তে সন্দেহ করলুম, তোমার জুতো খুঁজতে ভুলে গিয়েছিলুম, ম্যাপ হয়তো সেই জুতোর ভিতরেই লুকানো ছিল!

আজ তোমরা বেরিয়ে গিয়েছ, আমিও তোমার ঘরে ঢুকেছি। আগেই আমার চরের মুখে

খবর পেয়েছি, আজ তোমরা সেদিনকার জুতো না পরে বুটজুতো পায়ে দিয়ে গিয়েছ!

আমার অনুমান সত্য হয়েছে! ম্যাপসুদ্ধ এই চমৎকার জুতো জোড়াটি আমি তোমার সাদর উপহার বলে গ্রহণ করলুম। আবার যদি কখনও দেখা হয়, তোমাকে তোমার জুতোজোড়া ফিরিয়ে দেব। কারণ আমি জুতোচোর নই!

আর একটা কথা শুনলেও খুশি হবে। তোমাদের বাসাঘরের দরজায় কান পেতে আমার ছদ্মবেশী চর বসে থাকত। তোমরাও তাকে দেখেছ, কিন্তু চিনতে পারোনি।

তোমাদের অনেক কথাই সে শুনেছে। মানস সরোবরের কাছে রাক্ষস তালে গিয়েই তো তোমাদের পথ চলা শেষ হবে?

সেখানেই তোমাদের সঙ্গে আবার হয়তো আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

তোমাদের জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই থাকব। ইতি

শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস

পুঃ কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না। সেদিন পাহাড়ের দড়ির দোলনা থেকে তোমরা মুক্তি পেলে কেমন করে? দেখা হলে এ-খবরটা দিতে ভুলো না। ভৈঃ

বিমল কপালে করাঘাত করে বসে পড়ে বললে, 'আমি গাধা! আমি গোরু! বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই আমি সব মাটি করলুম!'

কুমার বললে, 'আমাদের পিছনে ফেলে ভৈরব এতক্ষণে মানস সরোবরের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে! আর কি তার নাগাল ধরতে পারব?

আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললুম, 'আমাদের এত কষ্ট সব বিফল হল! এখন খালি কাদা ঘেঁটেই দেশে ফিরতে হবে!'

বিমল সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তীব্র স্বরে বললে, 'কখনও না, কখনও না! আমরা আজই ঝড়ের বেগে ভৈরবদের পিছনে ছুটব। এতদিন তারা আমাদের অনুসরণ করেছিল, এইবারে আমাদের পালা! তাদের নাগাল আমরা ধরবই—নইলে এ মুখ আর কারুকে দেখাব না! আমার ভাগ্য চিরদিনই আমাকে সাহায্য করেছে, এবারেও নিশ্চয় সে আমার পক্ষ ত্যাগ করবে না! প্রতিজ্ঞা করছি দিলীপ, আমি ভৈরবের মুখের গ্রাস আবার কেড়ে নেব! দেখো, অদৃষ্ট আমাদের সাহায্য করবেই!'

আমি কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে বললুম, 'কিন্তু আর রাক্ষস তালে গিয়ে আমাদের লাভ কী? আমরা তো সেখানে বেড়াতে যাচ্ছিলুম না—যাচ্ছিলুম গুপ্তধনের সন্ধানে। কিন্তু এখন আমাদের কাছে ম্যাপ নেই, তবে কেন আর এত কষ্ট আর বিপদ মাথায় করে অন্ধকার হাতড়াতে যাওয়া?'

বিমল বললে, 'ভৈরব আমাকে যতটা মনে করেছে আমি ততটা বোকা নই! আসল ম্যাপ সে পেয়েছে বটে, কিন্তু তার অবিকল নকল আমার কাছে আছে! এখন যে আগে রাক্ষস-তালে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, গুপ্তধন হবে তার।'

মনের ভিতরে কতকটা আশার সঞ্চার হল। এখনও তাহলে সফল হলেও হতে পারি!

বিমল বললে, 'কিন্তু আর এক মিনিট সময় নষ্ট করবারও সময় নেই! প্রতি মিনিটেই

আমাদের আরও পিছনে ফেলে ভৈরব আরও বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। ওঠো কুমার, এসো দিলীপ, জাগো রামহরি! রাক্ষস তালে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে রাক্ষসের মতো ব্যবহারই করতে হবে—দয়া মায়া স্নেহ মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দাও! ভৈরব জানে না, দরকার হলে আমি তার চেয়েও কত নিষ্ঠুর হতে পারি!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমলের ভাগ্যলক্ষ্মী

বুদি, গারবেয়াং, কালাপানি প্রভৃতি পার হয়ে আমরা লিপিধুরায় এসে পড়েছি। এইখানেই ইংরেজ-রাজ্যের শেষ এবং তিব্বতের আরম্ভ।

আমরা এখন যেখানে এসে উঠেছি, বাংলা দেশে তার ঢের নীচে মেঘের দল আনাগোনা করে। বাঙালিরা দার্জিলিঙে গিয়েই পায়ের তলায় মেঘ-চলাচল দেখে অবাক হয়, কিন্তু দার্জিলিংও এখন আমাদের কত নীচে পড়ে আছে! এখানকার অতিরিক্ত নির্মল বাতাস এত লঘু যে নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়—আমরা নীচেকার পৃথিবীর ধুলো-মাটির জীব, এত নির্মলতা পর্যন্ত আমাদের সহ্য হয় না!

দেখতে দেখতে শ্যামলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বললেও চলে, এখানে-ওখানে কাঁটালতা ছাড়া গাছের আর দেখাই নেই। এখন চলেছি আমরা তুষারের শুভ্র রাজ্য দিয়ে—তার কনকনে শীতলতা ভয়াবহ। এমন বিষম ঠান্ডা বাতাস বইছে যে, এর মধ্যেই আমাদের গায়ের চামড়া বুড়োর মতো কুঁচকে গিয়েছে—অথচ সর্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়ে জ্বালা করছে!

কোথাও নদী কি নির্ঝরের, পাখি কি তরুপল্লবের গান আর শোনা যায় না—চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা অসাধারণ। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে শব্দের সৃষ্টি করছে হঠাৎ-জাগা শুকনো হাওয়া এবং এক-একটা দাঁড়কাক।

লিপিধুরাতে এসে শৈলশিখর থেকে চোখের সামনে ছবির মতন স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে দেখা যায়, বিচিত্রবর্ণ শৈলসমাকীর্ণ তিব্বত দেশকে। এবং তারই উপরে অনন্তকাল ধরে জাগ্রত প্রহরীদলের মতো বিরাজ করছে তুষারধবল ব্যোমস্পর্শী গিরিশিখরের পর গিরিশিখর।

মানুষের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি পথ চলা সম্ভব, আমরা তত তাড়াতাড়িই এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ পার হয়ে এসেছি।

কিন্তু লিপিধুরায় পৌঁছবার কিছু আগে এক পথিকের কাছে একটা সন্দেহজনক খবর পেলুম। একদল মানস সরোবরের বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে তার নাকি দেখা হয়েছে।

বিমল শুধোলে, 'সে দলে কজন লোক আছে?'

—'সাতজন।'

—'তারা কি সশস্ত্র?'

—'এ-পথে সবাই মোটা লাঠি নিয়ে চলে, তাদেরও হাতে লাঠি আছে। কেবল একজনের হাতে বন্দুক দেখলুম। কিন্তু তারা ভালো লোক নয়। একজন গরিব দোকানির কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে আর জুলুম করে খাবার জিনিস কেড়ে নিয়েছে!'

বিমল ফিরে বললে, 'জাগো কুমার! জাগো দিলীপ! আমরা বোধহয় ভৈরবেরই দলের খবর পেলুম। ধনুকের তির যেমন কোনওদিকে না বেঁকে সিধে লক্ষ্যের দিকে বেগে ছোটে, ভৈরবও এখন তেমনি সোজা ছুটেছে রত্নগুহার দিকে। আমাদেরও পক্ষে সেই রত্নগুহা হচ্ছে চুম্বক, আর আমরা হচ্ছি তার দ্বারা আকৃষ্ট লোহার মতো। মাঝ-পথের কোনও বাধাই আর মানব না।'

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্ত নিয়ে আমরা লিপিধুরায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

কিন্তু এখানে এসে এক দুঃসংবাদ শুনলুম। তিব্বতের রাজ-সরকার থেকে হুকুম না এলে আমরা নাকি ইংরেজ-রাজত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারব না।

একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এই খবরটা দিলে। এবং আরও বললে যে, চার-পাঁচদিনের মধ্যেই তিব্বতে যাতায়াতের পথ খোলবার জন্যে হুকুম আসার সম্ভাবনা আছে।

বিমল বললে, 'আমরা যদি তার আগেই লুকিয়ে ওদিকে যাই?'

—'বাবুজি, তাহলে আপনারা বিপদে পড়তে পারেন। আমাদের কথা না শুনে কাল একদল বাঙালিবাবু তিব্বতে ঢুকে বন্দি হয়েছে!'

বিপুল আগ্রহে প্রদীপ্ত হয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঙালিবাবু? কে তারা?'

—'তা জানি না। আমরা বারণ করলুম, তবু তারা তিব্বতের সীমায় গিয়ে ঢুকল। শুনেছি, তিব্বতি চৌকিদাররাও ভালো কথায় তাদের ফিরে আসতে বলেছিল, কিন্তু তারা বোকার মতো তাদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে যায়! তখন অনেক চৌকিদার এসে পড়ে তাদের সকলকেই বন্দি করে নিয়ে যায়!'

—'রাজ-সরকার থেকে পথ খোলবার হুকুম এলেই আবার তাদের ছেড়ে দেবে তো?'

—'না। আপাতত কিছুকাল তাদের কয়েদখানাতেই থাকতে হবে। তারা তো কেবল আইন অমান্য করেনি, তিব্বতি চৌকিদারদের সঙ্গে মারামারিও করেছে। এজন্যে তাদের বিচার হবে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের তো কয়েদখানাতে থাকতেই হবে, বিচারে কী হবে সে তো পরের কথা।'

—'তাদের কারুর চেহারা তোমার মনে আছে?'

—'আমাদের চোখে সব বাঙালিবাবুকেই একরকম বলে মনে হয়। তবে তাদের মধ্যে এক বাবুর খুব জোয়ান চেহারা ছিল বটে। আর তার এক হাতে ছিল ছটা আঙুল। সে বাবুর মেজাজও ভারী গরম, কথায় কথায় রুখে ওঠে। সেইজন্যেই তো বিপদ হয়েছে।'

বিমলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আমাদের সংবাদদাতা বিদায় হলে পর সে বললে, 'দেখলে তো, ভাগ্য আমার উপরে কেমন সুপ্রসন্ন! আমার ভাগ্য সঙিন মুহূর্তে একটা আস্ত সাঁকো উড়িয়ে দেয়, তিব্বতি চৌকিদার লেলিয়ে আমার শত্রুদের গ্রেপ্তার করে!'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কেবল তোমার ভাগ্য বলছ কেন, বলো আমাদের সকলকারই ভাগ্য!'

—'ও একই কথা, আমরা যে অভিন্ন—এক প্রাণে একই কর্তব্যসাধন করতে চলেছি। কেবল আমাদের ভাগ্য নয়, পৃথিবীর সমস্ত উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যই এমনি যথাসময়ে সুপ্রসন্ন হয়! হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে মানুষ ভাগ্যলক্ষ্মীর অপমান করে, হতাশ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। কিন্তু থাক ও-কথা। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা যে ভৈরব আর তার দলবল, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ওই তিব্বতি-চৌকিদারদের প্রাণের বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করতে সাধ হচ্ছে। আমরা যা চেষ্টা করেও পারতুম না, তারা তাই করেছে। অতঃপর আমরা এখানে পথ না খোলা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারব। তারপরেও আমরা যখন যাত্রা করব, ভৈরব-বাবাজি তখন তিব্বতি জেলখানার ভিতরে শুয়ে হয়তো কড়িকাঠ গণনা করবে,—আঃ, কী সুসংবাদ! ও রামহরি, শিগগির চায়ের কেটলি চড়িয়ে দাও!'

খানিক পরেই রামহরির চড়ানো কেটলির জল আগুনের আঁচে গর্জন করে উঠল।

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, আশা ও নিরাশার, আনন্দের ও নিরানন্দের এ কী উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই কোন পরিণামের দিকে যাত্রা করেছি! অবশেষে সফল হব কি বিফল হব জানি না, কিন্তু এই অপূর্ব বৈচিত্রের দোলায় দুলে জীবন যে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। সফলতা অর্জন করতে না পারলেও আমার জীবনে এই বৈচিত্রের মূল্য কমবে না! বিমল ও কুমার যে কীসের মোহে বিপদকে এত ভালোবাসে সেটা এখন খুব ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে!

পদে পদে বিপদকে নিয়ে খেলা করা মানুষের পক্ষে একটা মস্ত নেশার মতো। যারা ধনী-বিলাসী, আজন্ম পরম সুখের কোলেই মানুষ, সেই রাজা-মহারাজারাও চিরদিন নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটিয়ে আনন্দ পায় না, স্বেচ্ছায় সুখ-শয্যা ছেড়ে গভীর বনেজঙ্গলে শিকার করতে ছুটে যায়, খানিকক্ষণের জন্যে অনিশ্চিত বিপদের বিপুল পুলক উপভোগ করবে বলে। যারা সাহস ও শক্তির অভাবে কাপুরুষ, তারাও শান্তিময় জীবনযাত্রা থেকে মাঝে মাঝে ছুটি পাবার জন্যে, কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে টিকিট কিনে সার্কাসে গিয়ে বিপজ্জনক খেলা দেখে আসে!

প্রত্যেক মানুষ বিপদকে ভয়ও করে, ভালোওবাসে!

নবম পরিচ্ছেদ

গুহা-ভূত

আজ আমরা একটি পাহাড়ের নীচে তাঁবু ফেলেছি। এই পাহাড়টির নাম গুরলা। এটি পার হলেই রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল।

পথের প্রায় শেষে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে উত্তেজনার অন্ত নেই! রাবণ-হ্রদের কাছেই আছে রত্নগুহার গুপ্তধন!

লিধুপুরা থেকে এই গুরলা পাহাড় পর্যন্ত সর্বদাই আমরা সাবধানে এসেছি—আমাদের সতর্ক

চক্ষু একবারও অন্যমনস্ক হয়নি। কিন্তু শত্রুরা একেবারেই অদৃশ্য। মাঝে মাঝে লাল বা ধূসর রঙের নানা আকারের পাহাড়—তার পরেই তুষার-সাম্রাজ্য। পথে ও প্রান্তরেও বরফের আভাস, সবুজের স্নিগ্ধতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু তারা সবাই হচ্ছে ভুটিয়া কি তিব্বতি। কেউ ঘোড়ায় চড়ে যায়, কেউ যায় হেঁটে। মাঝে মাঝে তিব্বতি ভিখারির দল এসে জ্বালাতন করে। কিন্তু এদের মধ্যে ভৈরবের ছদ্মবেশে থাকাও অসম্ভব। ভৈরব ভুটিয়া কি তিব্বতি পোশাক পরতে পারে, কিন্তু নিজের নাক থ্যাবড়া, গালের হাড় উঁচু ও চোখ কুতকুতে করে তোলবার জন্যে নিজের মুখ তো আর ভেঙেচুরে তুবড়ে গড়তে পারবে না! আমাদের অপরিচিত তিব্বতি চৌকিদার-বন্ধুরা নিশ্চয়ই এখনও তাদের জেলখানা থেকে বিদায় করে দেয়নি! আমি যেন মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোহার শিকল পরে ভৈরবচন্দ্র বিফল ক্রোধে মাথার চুল ছিঁড়ছে, গর্জন করছে এবং ভাবছে এতক্ষণে আমরা হয়তো সদলবলে রত্নগুহা লুণ্ঠন করছি!

এখানেও সকালে ও রাতে রক্ত-জমানো শীত, কিন্তু দুপুরবেলায় বিষম তাপে এবং শুকনো ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে পথ চলা অসম্ভব। চোখের সামনে বরফের বিরাট স্তূপ, কিন্তু বুকের ভিতরে মরুভূমির জ্বালা—কাজেই দুপুরে আমরা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দিবানিদ্রায় সময় কাটাবার চেষ্টা করতুম। সে-সময়ে পাহারা দিত খালি বাঘা। বাঘা এমন সজাগ হয়ে পাহারা দিতে শিখেছিল যে, সকলে মিলে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেও আমরা ভয় পেতুম না।

আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। যদিও ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়, তবু মনে একটা খটকা লেগে গেল।

আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ বাঘার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

বিস্মিত নেত্রে দেখলুম, তাঁবুর দরজার কাছে একটা ভীষণ দুষমন চেহারার লোক দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ করছে!

তার দেহ লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি—খুব জোয়ান চেহারা। মুখখানা একেবারে তিব্বতি ছাঁচের। মাথায় টুপি, পিছনে টিকি বা বেণী, গায়ে কোর্তা, পায়ে এদেশি ধ্যাবড়া বুট। কোমরবন্ধে ঝুলছে তরবারি ও পিঠে বাঁধা সেকেলে গাদা বন্দুক এবং ডান হাতে একগাছা খাটো কিন্তু মজবুত লাঠি।

বিমল ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে হিন্দিতে রুক্ষস্বরে বললে, 'কে তুমি?'

প্রথমে সে কোনও জবাব দিলে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের মোটঘাটগুলো দেখতে লাগল।

বিমল আবার শুধোলে, 'এখানে কী দরকার তোমার?'

অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বিশ্রী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে সে বললে, 'তোমরা এখানে কী করছ?'

বিমল বললে, 'আমরা তীর্থযাত্রী। মানস সরোবর যাচ্ছি।'

লোকটা সন্দেহ-ভরা চোখে আমাদের পোশাকের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাদের মতো প্যান্ট-কোট-বুট পরা তীর্থযাত্রী দেখতে সে বোধ হয় অভ্যস্ত নয়।

বিমল বললে, 'তোমার কোনও দরকার আছে?'

সে জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেল। তারপরেই বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলুম। আমি

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখোলুম, লোকটা ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

কুমার বললে, 'কে জানে, এ আবার কোন মূর্তি!'

বিমল বললে, 'দিলীপের বাবার চিঠির কথা মনে করো। এখানে ডাকাতের ভয় আছে। এখানকার লামারাও নাকি সর্বদাই সাবধান হয়ে থাকে, পাছে কেউ গুপ্তধন চুরি করতে আসে। ও লোকটা হয়তো তাদেরই কারুর চর!'

আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বললুম, 'তাহলে আবার কি আমাদের নতুন নতুন শত্রুর সঙ্গে যুঝতে হবে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'তা হবে বইকি! গুপ্তধন কি নিজের বাড়ির বাগানে গাছের ফল, যে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই হল? এখনও কত নতুন শত্রুর সঙ্গে দেখা হবে, কে তা বলতে পারে? হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা গুপ্তধনের কাছেই যেতে পারব না!'

আমি আরও বেশি মুষড়ে পড়ে বললুম, 'তাহলে মিছামিছি নিজেদের জীবনকে এমন ভাবে বিপন্ন করে লাভ কী?'

বিমল হো-হো করে উচ্চহাসি হেসে বললে, 'কী বললে দিলীপ? লাভ? তুমি কি কেবল লাভের জন্যেই এখানে এসেছ? তাহলে আমরা এখানে এসেছি কেন? গুপ্তধনে তো অধিকার কেবল তোমারই, আমরা তো কোনওদিনই তোমার অংশীদার হতে চাইনি! আমরা এসেছি শুধু বিপদের শিক্ষালাভের জন্যে। মানুষের ভিতরে কতটা শক্তি লুকিয়ে আছে, এই বিপদের শিক্ষালয়েই তার চরম পরীক্ষা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যাবার জন্যে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠবার জন্যে, উড়োজাহাজে চড়ে পৃথিবীর এপার থেকে ওপারে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে মানুষ এই যে দলে দলে প্রাণ দিচ্ছে, এ-সব করছে তারা কোন লাভের আশায়? প্রাণ গেলে আবার লাভের আশা কী? আমরা বলি—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ওরা তা বলে না! মানুষের সুনামের জন্যে ওরা হাসতে হাসতে আত্মবলি দেয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই মানুষ মৃত্যুজয়ী হয়, এইটুকুই হয়তো ওদের লাভ! কোনও লাভের আশা রেখো না দিলীপ, বিপদের ভিতর দিয়ে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে শেখো। মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হতে পেরেছে কেবল এই শিক্ষার গুণেই।'

আমি মাথা নামিয়ে লজ্জিত স্বরে বললুম, 'ভাই বিমল, বিপদের পাঠশালায় সবে আমার হাতেখড়ি হচ্ছে, মাঝে মাঝে তাই ভুল কথা বলে ফেলি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

কুমার আমার পিঠ চাপড়ে সহানুভূতি জানিয়ে বললে, 'অতটা লজ্জা পাবার দরকার নেই। রোমও একদিনে তৈরি হয়নি, শিশুও একদিনে মানুষ হয় না।'

বিমল ততক্ষণে গুপ্তধনের নকল ম্যাপখানা নিয়ে বিছানার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানা দেখে সে মুখ তুলে বললে, 'দিলীপ, কুমার, তোমরাও দ্যাখো। এখন চড়াই পার হয়ে আমাদের গুরলার উপরে উঠতে হবে। তারপর উতরাই দিয়ে নেমে গিয়ে পড়ব রাবণ হ্রদের ধারে। ম্যাপের দিকে তাকালেই দেখোতে পাবে, মাঝখানে পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল সোজা চলে গিয়েছে, তার একধারে রাবণ হ্রদ, আর একধারে মানস সরোবর—ম্যাপে এই দুটো

হ্রদের নাম নেই, শুধু লেখা আছে—'সরোবর', কেন, তা তোমরা আগেই শুনেছ। দুই হ্রদের মাঝখানকার পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে এক জায়গায় ট্যারাকাটা আর পাশেই লেখা 'গুহা'। এই গুহাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য স্থান, কেননা এখানেই আছে গুপ্তধন! কিন্তু কেবল গুহা বললে তো কিছুই বলা হয় না, এমন দীর্ঘ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে গুহা আছে হয়তো শত শত, প্রত্যেক গুহা খুঁজলেও হয়তো বুঝতে পারব না ঠিক কোনটি হচ্ছে গুপ্তধনের রত্নগুহা। যিনি ম্যাপ এঁকেছেন, তিনি সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই দ্যাখো, যেখানে 'গুহা' লেখা, ঠিক তার উপরেই আঁকা পাশাপাশি তিনটি শিখর। জায়গাটা দেখছি পাহাড় শ্রেণীর ঠিক মাঝ-বরাবর। তাহলে ওই পাহাড় শ্রেণীর মাঝ-বরাবর গিয়ে আমাদের এমন একটা পাহাড় খুঁজে বার করতে হবে, যার উপরে পাশাপাশি তিনটি শিখরের তলায় গুহার অস্তিত্ব আছে। এ ম্যাপ বোঝা খুবই সহজ, কোথাকার ম্যাপ জানলে আর কিছুই বেগ পেতে হয় না। কুমার, মনে পড়ে, আসামে যকের ধন আনতে যাবার আগে মড়ার মাথার উপরে ক্ষোদা সাঙ্কেতিক লিপি পড়বার জন্যে আমাদের কী কষ্টই না করতে হয়েছিল?'

কুমার বললে, 'মনে পড়ে না আবার? সেই তো আমাদের প্রথম বিপদের শিক্ষা, সে কথা কি ভুলতে পারি?'

এমন সময়ে রামহরি হঠাৎ আমাদের পিছন থেকে গলাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে সাগ্রহে বললে, 'দেখি খোকাবাবু, আমিও একবার ম্যাপটা দেখি!'

বিমল বললে, 'কেন, তুমি আবার ম্যাপে কী দেখবে?'

—'তোমাদের গুহা-ভূত কোথায় থাকে, একবার দেখোতে সাধ হচ্ছে!'

কুমার বললে, 'গুহা-ভূত আছে তোমার মুণ্ডুর ভিতরে, ম্যাপে তার চেহারা আঁকা নেই।'

রামহরি চটে বললে, 'আমার মুণ্ডুর ভিতরে কোনওদিন কোনও ভূতকে আড্ডা গাড়তে দিইনি, ভূত চেপেছে তোমাদের ঘাড়ে, তাই দেশ ছেড়ে এখানে ছুটে এসেছ?'

বিমল বললে, 'রামহরি, প্রস্তুত হও। আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, সন্ধের আগেই তাঁবু তুলে আমরা গুরলা পাহাড়ে উঠব! হয়তো কালকেই আমরা তোমার সঙ্গে গুহা-ভূতের পরিচয় করিয়ে দিতে পারব!'

দশম পরিচ্ছেদ

মূর্তিমান বিপদের জনতা

এখানে ফুল ফোটে না, কিন্তু চাঁদ ওঠে। আর সে চাঁদ বোধহয় বাংলা দেশের চাঁদের চেয়ে ঢের বেশি ফরসা। একই চাঁদ ওঠে সব দেশে, কিন্তু সব দেশে তার বাহার একরকম নয়।

যাঁরা ভাবছেন বনভূমি নেই বলে চাঁদের শোভা এখানে কম, তাঁদের আমি মত বদলাতে বলি। প্রকৃতির সমস্তটাই শোভাময়, দেখার মতো দেখতে পারলে। গভীর অন্ধকার ভরা অরণ্য,

সীমাহীন ধু-ধু মরুভূমি, কূলহারা নীল সমুদ্র, অনুর্বর কঠিন পর্বত, আবার ছোট্ট নদী বা নির্ঝরিণী ও একরত্তি গাছের চারা পর্যন্ত যা কিছু আমরা দেখি, প্রত্যেকেই আপন আপন রূপে অপরূপ হয়ে ওঠে।

পূর্ণিমার চন্দ্রলেখা যখন তুষারভূষণ হিমালয়ের শিখরে শিখরে স্বপ্নের আলপনা এঁকে দেয়, তখন তার অপূর্বতা বাংলা দেশের কেউ দেখতে পায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে বিপুল আলো-ছায়ার কী বিচিত্র মৌন অভিনয়! বনরাজ্যে আলো-ছায়া জীবন্ত রূপে নৃত্য করে, কিন্তু এখানে তারা এই হিমালয়ের মতোই চিরস্থির। যোগী-ঋষিরা তাই বুঝি এই স্থিরতার অন্তঃপুরে এসে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হয়ে অকম্পিত দীপশিখার মতো বসে থাকতে ভালোবাসেন।

স্থিরতার সঙ্গে মিলেছে এখানে নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা।

পৃথিবী যে এত সাড়াহীন হতে পারে, সেটা ভাবতেই মনে জাগে পরম বিস্ময়! নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও এখানে এত উচ্চ বলে মনে হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে নিজেরাই চমকে-চমকে উঠছি!

এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্থিরতা, নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি হাড়ভাঙা শীতে কাঁপতে কাঁপতে। পূর্ণিমার কিরণ এখানে তুষার-শুভ্রতায় প্রতিবিম্বিত হয়ে দ্বিগুণ উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করেছে।

কুমার বললে, 'চড়াইয়ের উপরে খানিকটা উঠলেই আমাদের দেহ গরম হয়ে শীত কমিয়ে দেবে।'

কিন্তু আমার কান তখন কুমারের কথা শুনলেও আমার চোখ আকৃষ্ট হয়েছিল পথের একটি জিনিসের দিকে। জিনিসটি সাদা, হাওয়ায় নড়ছিল বলেই দেখতে পেলুম!

দু পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, একখানা শৌখিন রুমাল!

হিমালয়ের আঠারো-উনিশ হাজার ফুট উপরে অসভ্য তিব্বতিদের দেশে এমন একখানা শৌখিন রুমাল দেখে চোখ আমার চমকে উঠল! হেঁট হয়ে তখনই সেখানা পথ থেকে কুড়িয়ে নিলুম।

বিমল বললে, 'ওটা কী দিলীপ?'

—'রুমাল।'

বিমল কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বললে, 'বোধহয় কোনও পথিকের পকেট থেকে পড়ে গেছে।'

রুমালখানা একমনে পরীক্ষা করতে করতে আমি বললুম, 'তাই হবে। কিন্তু এই পথিকটি খুব শৌখিন। সে বিলিতি রুমাল ব্যবহার করে, আর তাতে বকুলের এসেন্স মাখায়! তিব্বতিরা এত বাবু হয়েছে বলে জানতুম না! রুমালের কোনে বাংলাতে কার নামের একটা প্রথম অক্ষরও আছে দেখছি!'

ততক্ষণে বিমল ও কুমার তাড়াতাড়ি আমার দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!

—'দিলীপ, কী বলছ!'—বলেই বিমল রুমালখানা আমার হাত থেকে ফস করে টেনে নিলে!

কুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'রুমালের কোণে কী অক্ষর আছে বিমল?'

—'ভ।'

—'ভ!'

কিছুক্ষণ আমরা সকলেই স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে রইলুম! বোধহয় আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের ভিতরে তখন ঝড় বইছিল!

সর্বপ্রথমে কথা কইলে বিমল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এই 'ভ' হচ্ছে ভয়াবহ! অর্থাৎ 'ভ' অর্থে এখানে ভৈরবকেই বুঝতে হবে! আর কোনও বাঙালি এখন মানস সরোবরের পথে এলে সে-খবর আগেই আমাদের কানে উঠত। তাহলে বরং ওই 'ভ'কে ভীমচন্দ্র বলে সন্দেহ করা চলত। এখন এইটেই বুঝতে হবে যে, আমরা যখন একচক্ষু হরিণের মতো ভৈরবের ভাবনা ভুলে নিজেদের সাফল্যে পুলকিত হয়ে ধীরে-সুস্থে ভ্রমণ করছিলুম, ভৈরব তখন আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে দ্রুতপদে রাবণ হ্রদের দিকে এগিয়ে গেছে!'

কুমার বললে, 'কারাগার থেকে সে কবে মুক্তি পেলে?'

—'ভগবান জানেন, তবে রুমালখানা নিশ্চয়ই এখানে বেশিক্ষণ পড়ে নেই, খুব সম্ভব আজকেই কিছুক্ষণ আগে পকেট থেকে কোনওগতিকে পড়ে গেছে। কারণ কালকের সারারাত শিশিরে ভিজলে, আর আজকে সারাদিন রোদে পুড়লে রুমালে এসেন্সের গন্ধ নিশ্চয়ই উবে যেত! দিলীপ, এই রুমাল আজ খবরের কাগজের মতো সব খবরই আমাদের জানিয়ে দিলে! কিন্তু এখনও হয়তো সময় আছে, এখনও হয়তো যবনিকা পড়বার আগেই আমরা যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারব,—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! মানুষ আশার দাস—আশার শেষ নেই!'

আমার পা আর এগুতে চাইছিল না! মানুষের আশার শেষ নেই বটে, কিন্তু এ আশা যেন আলেয়ার মতো আমাদের অন্ধকার থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ কখনও নাগালের ভিতরে আসছে না পূর্ণতাকে নিয়ে! কিন্তু এখনও আমরা যেতে চাই কোথায়? বার বার দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে অনেকটা যখন নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, তখন হঠাৎ স্থির-সমুদ্রের টাইফুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে এই রুমালখানা আবির্ভূত হল! তুচ্ছ একখানা রুমাল! সময়বিশেষে তারও দাম কত বেশি!

বিমল বললে, 'দিলীপ, তোমার মুখ দেখলে যে প্যাঁচারাও আশ্চর্য হবে! কীসের এত ভাবনা? দেখতে পাচ্ছ না, এই রুমালখানা আমাদের চোখের সামনে ভগবানের অনুগ্রহের পতাকার মতো এসে পড়েছে? এ যে আমাদের ঘুমন্ত চোখকে জাগিয়ে বলতে চায়—ভয় নেই বন্ধুগণ! সর্বশেষের ঘণ্টা বাজাবার আগেই আমি তোমাদের সাবধান করে দিতে এসেছি! বুঝেছ দিলীপ, গুপ্তধন যদি ভৈরবের হাতের মুঠোর ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তাহলেও সে নিজে এখনও আমাদেরই হাতের মুঠোর ভিতরে থাকবে! যখন আগে থাকতে খবর পেয়েছি, তখন সে কোথায় পালাবে? এ হচ্ছে প্রায় অরাজক দেশ, তাকে ধরতে গেলে কোনও সভ্য আইন আমাদের বাধা দিতে পারবে না!'

কুমার বললে, 'এতক্ষণ ভৈরব ছিল না, আমাদের এই যাত্রাকে যেন লবণহীন তরকারির মতো বিস্বাদ লাগছিল! ভৈরব এসে ব্যাপারটাকে আবার জমিয়ে তুললে! দিলীপ, এইবারেই তো আসল খেলা শুরু হল!'

এই দুটি অপূর্ব যুবকের প্রচণ্ড উৎসাহের ধাক্কায় সমস্ত নিরাশাই যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! ধীরে ধীরে আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলুম।

আমরা গুরলার চড়াই অবলম্বন করে উপরে উঠছি। সেখানকার ঘুমন্ত নীরবতা আমাদের পায়ের ও হাতের লাঠির শব্দে যেন সবিস্ময়ে জেগে চমকে চমকে উঠতে লাগল! মাঝে মাঝে আমাদের পা লেগে গড়ানে পথ দিয়ে রঙিন নুড়িগুলো খড়বড় খড়বড় করে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল সে যেন স্তব্ধতার হাসির শব্দ!

চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে। পথ দেখে চলতে—অর্থাৎ উঠতে আমাদের কোনওই কষ্ট হচ্ছে না! অত্যন্ত লঘু বাতাসে শ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চন্দ্রালোকের সমুদ্রেই ডুবে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! চাঁদের আলো, চাঁদের আলো, চাঁদের আলো,—কোথাও তা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কোথাও তা তুষারের সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে গেছে, কোথাও তা হিরার কণার মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে, কোথাও তা ছায়াময় হয়ে যেন আঁধারকে খুঁজছে!

আমি যখন নিজের মনে চাঁদের আলো নিয়েই মেতে আছি, তখন কুমার হঠাৎ চুপিচুপি বললে, 'আচ্ছা বিমল, তোমার মনে কি কোনও অস্বস্তি জাগছে না?'

এই আলোকময় স্তব্ধতার শান্তির মধ্যে কুমারের কথাগুলো কেমন বেসুরো শোনাল! যেখানে জনপ্রাণী নেই, কোনও গোলমাল নেই, সেখানে আবার অস্বস্তি কীসের?

কিন্তু কুমারের কথা শুনে বুকের কাছটা তবু ছাঁৎ করে উঠল! একবার চারিদিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলুম, কিন্তু ঘুমন্ত চন্দ্রালোকের স্বপ্নজগতে হিমালয়ের ধ্যানমূর্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

বিমল প্রথমে চুপ করে রইল। অল্পক্ষণ পরে বললে, 'কুমার, তোমার কি অস্বস্তি হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ ভাই, হচ্ছে।'

—'কী অস্বস্তি বলো দেখি?'

—'মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের উপরে যেন আমরা ছাড়াও আরও অনেক লোক আছে।'

—'আর কিছু?'

—'যেন তারা আমাদের প্রত্যেক ভাবভঙ্গি লক্ষ করছে! যেন অনেকগুলো হিংসকুটে চোখ আমাদের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!'

কুমার বলে কী! ভাবলুম, বিমল বোধ হয় তার অকারণ ভয় দেখে এখনই ঠাট্টা শুরু করবে! কিন্তু সে ঠাট্টা করলে না! পিঠ থেকে নিজের বন্দুকটা নামিয়ে একবার পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'কুমার, আমারও মনের অবস্থা অনেকটা তোমারই মতো। কেবল তোমার আর আমার নয়, বাঘার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো! ও চলতে চলতে হঠাৎ থেমে থেমে দাঁড়াচ্ছে, আর কান খাড়া করে যেন কী শোনবার চেষ্টা করছে!'

ফিরে চেয়ে দেখলুম, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘা দু-কান খাড়া করে পাহাড়ের উপরদিকে তাকিয়ে আছে!

চাঁদের আলোর কথা তখনই মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল! খালি চাঁদের আলোই দেখছি একচক্ষু হরিণের মতো! কিন্তু ওই যে পাহাড়ের আশেপাশে শত শত কালো ছায়া অমাবস্যার

রহস্যকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিও যাদের ভিতরে ঢুকতে না পেরে ফিরে আসে, ওগুলোর মধ্যে কি কোনও বিভীষিকা লুকিয়ে থাকা অসম্ভব? যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি আমি তাড়াতাড়ি বিমল ও কুমারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালুম। এই দুটি লোক, অসংখ্য বিপদে অভিজ্ঞতা লাভ করে বিপদ সম্বন্ধে এদের একটা সহজ জ্ঞান হয়েছে নিশ্চয়ই!

এইবারে বাঘা রুদ্ধ ক্রোধে গর গর করতে লাগল—শত্রুর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন নিঃসন্দেহ হয়েছে! পাছে বাঘা নাগালের বাইরে ছুটে যায়, সেই ভয়ে রামহরি তাড়াতাড়ি তার গলায় শিকল লাগিয়ে দিলে!

আমার মনের ভিতরে যাইই হোক, বাইরে আমি কিন্তু এখনও কিছু দেখতে-শুনতে পেলুম না বা কোনও বিপদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলুম না! চতুর্দিক তেমনি স্থির, স্তব্ধ ও শান্তিময়!

আচম্বিতে রামহরি পাহাড়ের নীচের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো খোকাবাবু, দ্যাখো!'

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অবাক হয়ে দেখলুম, যে নির্জন পথ দিয়ে আমরা উপরে উঠেছি সেই পথ দিয়ে নীচে থেকে দলে দলে লোক নীরবে উপরপানে উঠে আসছে। আলোর ভুবনে যেন দলবদ্ধ ছায়ামূর্তি আকাশ থেকে অকস্মাৎ খসে পড়েছে!

বিমল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'যে কুলিগুলো আমাদের মোটঘাট নিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল, তারা কোথায় গেল?'

কুমার বললে, 'তারা হয় বিপদ দেখে পালিয়েছে, নয় ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে!'

বিমল কঠিন হাস্য করে বললে, 'যাক, তল্পিতল্পার ভাবনা চুকে গেল, এখন নিজেদের ভাবনা ভাবা যাক!'

ঠিক সেই সময়ে মুখ তুলে দেখি, পাহাড়ের উপরদিকেও দলে দলে নরমূর্তি ঠিক যেন পাথর ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করছে!

আমাদের নীচের ও উপরের—পিছনের ও সুমুখের, দুইদিকেই পথ বন্ধ!

বিমলের চোখ বিদ্যুৎবেগে চারিদিকটা একবার দেখে নিলে—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টর্চটাও ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দিকে সমুজ্জ্বল আলোক-রেখা নিক্ষেপ করলে।

এমন সময়ে উপরের জনতাও নীচে আমাদের দিকে নেমে আসতে লাগল!

বিমলের মুখ প্রশান্ত। কুমারের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তারও ওষ্ঠাধরে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কঠোর হাস্য। সেই ভূতভয়গ্রস্ত প্রৌঢ় রামহরি, সেও অটল পদে বিমলের পিছনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—এমনকি বাঘা পর্যন্ত সদর্পে ল্যাজ তুলে গরর-গরর করছে! প্রভু, ভৃত্য, কুকুর,—সব এক ধাতুতে গড়া! বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্যই করে না!

এদের মধ্যে আমি শেষ পর্যন্ত কোন ভূমিকায় অভিনয় করব জানি না, কিন্তু আমার মনের অবস্থা বিশেষ শান্ত নয়!

উপর ও নীচে থেকে যারা আসছে, তারা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে কোনও শব্দ শোনা গেল না। যেন তারা সবাই বোবা!

হঠাৎ বিমল পাশের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললে, 'ওই যে একটা শুঁড়িপথ, ওর শেষে একটা গুহার মতো দেখা যাচ্ছে! ওই গুহার মুখে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে হাজার শত্রু থাকলেও শুঁড়িপথের ভিতরে ঢুকতে পারবে না! ওই ঠাঁই ছাড়া আপাতত আর কোথাও আশ্রয় দেখছি না! চলো সবাই ওর মধ্যে!'

আমাদের পথ ছেড়ে ওখানে যেতে দেখে উপর ও নীচে থেকে জনতার শত শত কণ্ঠে সমুদ্রনির্ঘোষের মতো গম্ভীর এক গর্জন জেগে উঠল! এবং সে গর্জন ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে—আরও দূরে! স্তব্ধতাকে হত্যা করে এ যেন শব্দময় মৃত্যুর নৃশংস উল্লাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাবা কৈলাসের মহাদেব

সেই বিরাট জনতার বিপুল চিৎকার যখন নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতাকে নির্বাসিত করে আকাশ বাতাস ও হিমাচলকেও কাঁপিয়ে তুলছে, বিমল তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে টর্চের আলোকে গুহার ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগল। তার ভাব দেখলে মনে হয়, ও-চিৎকারে যেন ভয় পাবার কিছুই নেই, ও যেন বৈঠকখানার পাশের রাস্তায় আনন্দমেলায় সমবেত নিরীহ জনতার নিরাপদ কোলাহল!

কুমার বললে, 'গুহাটা ছোটো হলেও আপাতত আমাদের আশ্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট!'

আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত হতে পারলুম না! বললুম, 'কিন্তু আমরা হচ্ছি চারজন আর ওরা বোধহয় আড়াইশোর কম হবে না!'

কুমার আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'আজ এই গুরলা গিরিসঙ্কটে থার্মাপলির পুনরভিনয় হবে! কিন্তু হায়, আমাদের সঙ্গে কোনও কবি নেই, এই বীরত্ব-কাহিনি পৃথিবীকে শোনাবে কে? দিলীপ, তুমি পদ্য লিখতে পারো?'

এই কি কৌতুকের সময়? আমি রেগে-মেগে মাথা নেড়ে বললুম, 'না! লিখতে পারলেও এখন পদ্য নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না!'

—'তবে কী করতে?'

—'কী উপায়ে প্রাণ বাঁচানো যায়, সেই চেষ্টাই করতুম।'

—'কেবল চেষ্টা করেই যদি প্রাণ বাঁচানো যেত, তাহলে পৃথিবীতে আজ কোনও জীবজন্তুই মরত না। না-মরবার জন্যে সবাই চেষ্টা করে, তবু তো সবাই মরে! সুতরাং ও-চেষ্টা ছেড়ে ভবিষ্যতে তুমি পদ্য লেখবার চেষ্টা কোরো, তবু কবি বলে নাম কিনতে পারবে।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে এমন কোনও কবি আছেন বলে মানি না, যিনি এখন কবিতা লিখতে পারেন।'

—'আমি কবি হলে লিখতে পারতুম দিলীপ! জীবন কী? মৃত্যু কী? দীপশিখা জ্বালা আর নেবার মতোই সহজ! আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো কবি তাই বলেছেন—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'!'

তারপর একটু থেমে বিমল ডাকলে, 'কুমার!'

—'বলো।'

—'তিব্বতি হনুমানগুলো প্রায় আমাদের সামনে এসে পড়েছে। ওরা খুব জয়ধ্বনি করছে! ভাবছে আমরা ফাঁদে পড়েছি, এখন একে একে ধরে টিপে মেরে ফেললেই হয়! কিন্তু ওদের ধারণা যে ভুল, সেটা কী ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায় বলো দেখি?'

কুমার একবার মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে বললে, 'ওদের কাছেও বন্দুক আছে।'

—'কিন্তু সেকেলে গাদা বন্দুক। ইংরেজদের তিব্বত-অভিযানের সময়ে ওই বন্দুক নিয়েই ওরা বীর-দম্ভে লড়াই করতে এসেছিল, আর তার ফল কী হয়েছিল তা জানো তো? আজও দেখছি ওরা ও-বন্দুক ছাড়েনি! ও-সব বন্দুক প্রত্যেকবার মাটিতে রেখে বারুদ ঠেসে তারপর টিপ করে গুলি ছুড়তে কত সময় লাগবে বুঝেছ?'

—'হ্যাঁ, তার আগেই আমরা শত্রুদের ঝড়ে কলাগাছের মতো মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারব। ওরা অবশ্য এই শুঁড়িপথে ঢুকে হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের কাবু করবার চেষ্টা করবে।'

—'হ্যাঁ, ওরা কাছে আসতে পারলে আমরা আর বাঁচব না। কিন্তু ওরা কাছে আসতে পারবে না!'

—'এই শুঁড়িপথে একসঙ্গে দুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি চলা অসম্ভব। এ পথে ঢুকলে কেউ আর জীবন নিয়ে বেরুতে পারবে না। বেঁচে থাকুক আমাদের হাতের একেলে বন্দুক!'

—'কিন্তু ওরা যদি এই গুহা অবরোধ করে?'

—'তাহলে দু-চারদিন পরেই অনাহারে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু সে আজকের কথা নয়! আজকের কথা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'মারো মারো, শত্রু মারো'!'

—'ওই ওরা এসে পড়েছে! কুমার, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও! রামহরি, দিলীপ! তোমরা আমাদের পিছনে থাকো! এখন আমাদের দরকার, খুব-তাড়াতাড়ি বন্দুক ছোড়া! আমি আর কুমার বন্দুকের নলগুলো খালি করেই দিলীপ আর রামহরিকে দেব, তারা তাদের বন্দুক আমাদের হাতে দিয়ে আবার আমাদের বন্দুকে টোটা ভরতে থাকবে! এ ব্যবস্থায় দিলীপ আর রামহরি বন্দুক ছুড়তে পারবে না বটে, কিন্তু আমরা শত্রুদের উপরে গুলিবৃষ্টি করতে পারব অশ্রান্ত ভাবেই!'

তখন পাহাড়ের উপরকার ও নীচেকার দল একসঙ্গে মিলে গুহার শুঁড়িপথের সামনে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে! এরা সবাই তিব্বতি, আজ দুপুরে আমাদের তাঁবুর ভিতরে হঠাৎ যে বেয়াড়া মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, এদের সকলকেও দেখতে প্রায় সেই-রকম। এদের অনেকের পিঠে বন্দুকের বদলে তিরধনুকও দেখা গেল!

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ভৈরবই বোধহয় লোকজন সংগ্রহ করে পথের কাঁটা সরাবার

জন্যে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। এরা নতুন লোক! কিন্তু কারা এরা? ডাকাত, না গুপ্তধনের রক্ষক? যদিও এখনও এরা আক্রমণ করেনি, তবু এরা যে আমাদের বন্ধু নয় সেটা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে!

বিমল ও কুমার গুহার অন্ধকারে সরে এসে হুমড়ি খেয়ে বসে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করছে, বোধহয় এদের উদ্দেশ্য কী, বুঝবার জন্যেই। যদি এরা ঠিক শত্রু না হয়!

কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝতে আর বিলম্ব হল না! হঠাৎ কয়েকটা বন্দুকের গর্জন শোনা গেল এবং তারপরেই কয়েকজন লোক বিকট চিৎকার করে শুঁড়িপথের দিকে ছুটে এল! নির্বোধ!

বিমল বললে, 'ব্যস, আর দয়া নয়—আগে শুঁড়িপথ সাফ করো, তারপর চড়াইয়ের পথে যারা আছে তাদের মারো! চালাও গুলি!'

এবং বিমল ও কুমারের বন্দুকরা স্বভাষায় অনর্গল কথা কইতে শুরু করল! তাদের বন্দুক শূন্য হলেই আমাদের হাতে আসে এবং আমাদের বন্দুক যায় পূর্ণোদরে তাদের হাতে!

দুইপক্ষের বন্দুকের শব্দে, জনতার চিৎকারে, আহতদের আর্তনাদে কান আমার কালা হয়ে যাবার মতো হল, শিকল-বাঁধা বাঘাও আর কিছু সুবিধা করতে না পেরে কেবল গলাবাজির দ্বারাই আসর মাত করে তুললে!

দেখতে দেখতে শুঁড়িপথ সাফ হয়ে গেল, সেখানে পড়ে রইল কেবল হত ও আহতদের দেহগুলো! তারপর চড়াইয়ের পথে যারা ছিল গরমাগরম গুলির আস্বাদ পেয়ে তাদেরও সাহস উবে গেল, তারাও তাড়াতাড়ি পাহাড়ের আরও উপরদিকে উঠে বন্দুকের নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে কেবল চেঁচিয়ে ও লাফিয়ে আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল! এত বিপদেও তাদের বাঁদুরে ভাবভঙ্গি দেখে আমি না হেসে পারলুম না!

বাঙালির ছেলে আমি, চিরদিন আদুরে-গোপালের মতো বাপ-মায়ের কোলেই মানুষ হয়ে এসেছি, আজকের এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হতে লাগল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি রূপকথার রাজ্যে গিয়ে স্বপ্ন দেখছি!

এই হিমালয়ের জ্যোৎস্নাময় তুষারসাম্রাজ্য, এই দলবদ্ধ শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ও যুদ্ধহুঙ্কার, এই বন্দুকের ঘন ঘন বজ্রগর্জন, এই চোখের সামনে এতগুলো নরবলি, এই মৃত্যুভয়ের মূর্তিমান লীলা, এ-সমস্তই আমার কাছে নূতন—একেবারে অভিনব! গল্পে এ-রকম ঘটনা পড়া বা শোনা, আর স্বচক্ষে তা দেখা এককথা নয়। আমি অভিভূতের মতো হয়ে গেলুম।

শুঁড়িপথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আহতরা পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এবং চড়াইয়ের উপরে দশ-বারোটা দেহ একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছে—সে-হতভাগ্যরা আর কখনও পালাতে পারবে না।

বিমল বললে, 'দেখেছ কুমার, ওই জংলি-বাঁদরগুলো বন্দুকের ব্যবহারও ভুলে গেছে? এতগুলো বন্দুকের শব্দ শুনলুম, কিন্তু একটাও গুলি গুহার ভিতরে এল না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দুটো তির গুহার ভিতরে এসেছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, বন্দুকের চেয়ে ধনুকে ওদের হাত ভালো। কিন্তু এখন ওরা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে তির ছুড়লেও আমাদের কোনও ভয় নেই। ওদের তির এতদূর আসবে না।'

ওরা দূরে দাঁড়িয়ে সমানে চিৎকার করতে লাগল। আমাদের বন্দুকের প্রতাপ দেখে ওদের মন থেকে যুদ্ধ-সাধ বোধহয় একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তবু তারা ওখান থেকে নড়ল না। ওদের উদ্দেশ্য কী?

বিমল বললে, 'বোধহয় যা ভেবেছিলুম তাই। আক্রমণ করে ফল নেই বলে হয়তো ওরা আমাদের এইখানেই বন্ধ করে রাখতে চায়।'

তাহলে উপায়? আমাদের সঙ্গে চামড়ার বোতলে সামান্য জল আছে বটে, কিন্তু তা ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ? বিশ্বাসঘাতক কুলিরা আমাদের মালপত্তর নিয়ে পালিয়েছে, খাবার পাব কোথায়? অনাহারে কতদিন আত্মরক্ষা করতে পারব?

আচম্বিতে ও আবার কী ব্যাপার? আমাদের গুহার উপরে গড়-গড় করে কী-একটা শব্দ উঠল। এবং তারপরেই গুহার ঠিক মুখেই ভীষণ শব্দে বড়ো বড়ো কতকগুলো পাথর এসে পড়ল। ওরা কি পাথর ছুড়ে আমাদের মারতে চায়? গুলি গেল, পাথর? কিন্তু কোথা থেকে ছুড়ছে?

তারপর লক্ষ করে দেখলুম, এমন সব প্রকাণ্ড পাথর কোনও-একজন-মানুষের পক্ষেই ছোড়া সম্ভবপর নয়! এ-সব পাথরের এক-একখানা শূন্যে তুলতেই তিন-চারজন লোকের দরকার!

আবার গুহার গড়ানে ছাদে তেমনি গড়গড় শব্দ, আবার তেমনি কতকগুলো পাথর গুহার মুখে এসে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে শুনলুম শত্রুদের কণ্ঠে দ্বিগুণ উৎসাহে উল্লাসের চিৎকার! তখন আন্দাজ করলুম, শত্রুদের ভিতর থেকে বোধহয় একদল লোক অন্য কোনও পথ দিয়ে আমাদের গুহার ছাদে এসে উঠেছে এবং সেইখান থেকেই এই পাথরগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে ফেলে দিচ্ছে! ক্রমাগত পাথর পড়ছে, গুহা থেকে বেরিয়ে ছাদের শত্রুদের মারবারও উপায় নেই!

বিমলও ব্যাপার বুঝে বললে, 'কুমার, এইবারে আমাকে ভাবালে দেখছি! ওরা গুহার ছাদ থেকে পাথর ফেলে গুহার মুখ বন্ধ করে দিতে চায়!'

কুমার দমে গিয়ে বললে, 'সে যে জ্যান্ত কবর!'

—'কিন্তু এখন গুহা থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় গেলে হয়তো অনেক শত্রু মারতে পারব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই তাহলে আমাদের মরতে হবে।'

কুমার চুপ করে রইল।

রামহরি বললে, 'হে বাবা কৈলাসের মহাদেব! আমরা তোমার রাজ্যে এসেছি, আমাদের রক্ষা করো!'

বিমল বললে, 'কিন্তু রামহরি, মহাদেব যে প্রলয়কর্তা, সে কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ?'

রামহরি খাপ্পা হয়ে বললে, 'থামো থামো, তোমায় আর অত ব্যাখ্যানা করতে হবে না, তুমি ভারী পণ্ডিত! দুনিয়াসুদ্ধ লোক যে শিবপুজো করছে তা কি মরবে বলেই করছে?... হে বাবা কৈলাসের মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার কথায় তুমি রাগ কোরো না, তুমি আমাদের রক্ষা করো—এই পাথর পড়া বন্ধ করে দাও!'

গড়গড় আওয়াজ হচ্ছে তো হচ্ছেই, পাথরের পর পাথর পড়ছে তো পড়ছেই এবং সেইসঙ্গে বারংবার জেগে জেগে উঠছে শত শত নির্মম কণ্ঠে পৈশাচিক অট্টহাস্য! গুহার

আধখানা মুখ তখন বন্ধ হয়ে গেছে, বাকি আধখানা বন্ধ হলেই জীবন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্কের অবসান!

অর্ধরুদ্ধ গুহাপথ দিয়ে চন্দ্রকিরণ ভিতরে ঢুকে তখন নীরব ভাষায় যেন ডাক দিয়ে বলছিল, 'বন্ধু, এখন কি আমায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে না?'

কুমার বললে, 'রামহরি, এত রাতে আর এই শীতে শিব কৈলাসপুরীতে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তোমার প্রার্থনা তিনি শুনতে পাননি!'

রামহরি বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'ও হচ্ছে ক্রিশ্চানের কথা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কি তোমার-আমার মতো? পৃথিবী তাঁদের মুখ চেয়ে আছে, তাঁরাও পৃথিবীর শিয়রে দিন-রাত জেগে বসে আছেন! তাঁরা যদি আমাদের দয়া না করেন তাহলে বুঝব আমরাই মহাপাপী, দয়ার যোগ্য নই!'

অশিক্ষিত রামহরির সরল বিশ্বাসের কথা শুনে আমার চোখে জল এল।

বিমল বললে, 'কুমার, আমি এই অন্ধকূপের মধ্যে দিনে দিনে তিলে তিলে মরতে পারব না!'

—'কী করবে?'

—'এখনও বাইরে যাবার পথ আছে। আমি বাইরে যাব!'

—'তারপর?'

—'তারপর শত্রু মারতে মারতে বীরের মতো হাসতে হাসতে মরব।'

—'আমারও ওই মত। দিলীপ, কী বলো?'

কোনওরকমে মনের আবেগ সামলে বললুম, 'আমার কোনও মত নেই। তোমরা যা বলবে তাই করব।'

আচম্বিতে বাইরের সমস্ত চিৎকার একসঙ্গে থেমে গেল এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল, বহু—বহু দূরে অনেকগুলো জয়ঢাক ও তূরী-ভেরি বেজে উঠেছে! হিমারণ্যের এই অপরিসীম নিস্তব্ধতায় বহুদূরের শব্দকেও মনে হয় যেন কাছের শব্দ বলে। তাই কত দূর থেকে সেই তূরী-ভেরি ও ঢাকের শব্দ আসছে, ভালো করে সেটা বোঝা গেল না।

রামহরি খুশি কণ্ঠে বললে, 'খোকাবাবু, খোকাবাবু, পাথর আর পড়ছে না!'

আমি সাগ্রহে বললুম, 'ব্যাপার কী বিমল?'

বিমল বললে, 'কিছু তো আমিও বুঝতে পারছি না! তবে কৈলাসের মহাদেব এসে যে ওদের পাথর ছুড়তে বারণ করেননি, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই! কিন্তু ওই ঢাক আর ভেরী বাজছে কেন? ও কি কোনও সঙ্কেতধ্বনি?'

গুহামুখে যে পাথরগুলো জড়ো হয়েছে তার উপর দিয়ে দেহের আধখানা বাড়িয়ে কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! ওরা চলে যাচ্ছে!'

—'চলে যাচ্ছে!'

—'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে! দৌড়চ্ছে! যেখানে ওরা এতক্ষণ ছিল, সে-জায়গাটা প্রায় খালি হয়ে গেছে!'

রামহরি গদগদ কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, 'হে বাবা কৈলাসের মহাদেব, ওদের সুমতি দাও বাবা, ওদের সুমতি দাও! কলকাতায় গিয়ে খুব ঘটা করে আমি তোমাকে পুজো দেব!'

কুমার বললে, 'ব্যস, পাহাড়ের উপরে আর কেউ নেই! পথ সাফ!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এটা হতভাগাদের নতুন কোনও চাল নয় তো? হয়তো আমাদের বাইরে বার করবার আর একটা ফিকির!'

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা গুহার ভিতরে বসে রইলুম, কিন্তু বাইরে আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না।

বিমল ফিরে হাসতে হাসতে বললে, 'রামহরি, মহাদেব সত্যিই ঘুমোন না! তিনি তোমার কথা শুনতে পেয়েছেন!'

রামহরি বললে, 'কলকাতায় গিয়ে আমাকে দশটা টাকা দিয়ো। আমি ঠাকুরকে পুজো দেব বলে মানত করেছি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, সমস্ত ব্যাপারটাই যে রহস্যময় আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে!'

—'চলো, বাইরে গেলে হয়তো একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে।'

আমরা পাথরের স্তূপ টপকে একে একে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে, যে-সব পাহাড়ের শিখর এতক্ষণ জ্যোৎস্নাময় হয়েছিল, এখন তারা হয়েছে ছায়াময়। এবং যেখানে ছিল ছায়া, সেখানে এসেছে আলো।

শুঁড়িপথে জন-পাঁচেক তিব্বতি মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের প্রাণবধ করতে এসে এরা নিজেদের প্রাণই রক্ষা করতে পারলে না। পৃথিবীতে মানুষের যদি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাকত, তাহলে জগতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহই ঘটত না! অনেক পাপীও সাবধান হত।

মৃতদেহগুলোর বিকৃত ভয়ানক মুখ দেখে শিউরে উঠলুম। কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে আবার চড়াইয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

হঠাৎ আমার পায়ের তলায় কে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'বাবুজি, পানি!'

চমকে চেয়ে দেখি, সেখানে একজন আহত তিব্বতি পড়ে রয়েছে!

বিমল তখনই নিজের বোতল থেকে তার মুখে জল ঢেলে দিলে। বন্দুকের গুলি তার বুকে লেগেছে। সে এত হাঁপাচ্ছে যে বেশ বোঝা গেল, তার মৃত্যুর আর দেরি নেই!

বিমল হিন্দিতে শুধোলে, 'তোমাদের লোকজনরা হঠাৎ পালিয়ে গেল কেন?'

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'লামারা বিপদের সঙ্কেত করেছে বলে চলে গেছে। তারা পালায়নি।'

—'তাই কি ভেরি আর ঢাক বাজছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিপদটা কীসের?'

—'বোধহয় গুপ্তধনের গুহায় চোর ঢুকেছে!'

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বিমল হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কী ভেবে আবার বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা আমাদের আক্রমণ করেছিলে কেন?'

—'পুরাংয়ে কজন বাঙালিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম। জুম্পানওয়ালাকে (শাসনকর্তাকে) অনেক টাকা জরিমানা দিয়ে তারা ছাড়ান পায়। সেই বাঙালিদের মুখে শোনা গেল, গুপ্তধন আনবার জন্যে তোমরা এদিকে এসেছ। জুম্পানওয়ালা তাই আমাদের পাঠিয়েছে।'

—'আর সেই বাঙালিরা?'

—'জানি না, বাবুজি, আর আমি কিছু বলতে পারব না—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে আর একটু জল দাও।'

বিমল তার গলায় আবার জল ঢেলে দিলে। মিনিট দশ পরে সে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করলে।

বিমল বললে, 'চমৎকার!'

কুমার বললে, 'চমৎকার আবার কী?'

—'এই ভৈরবের বুদ্ধি! বেশ বোঝা যাচ্ছে, শাসনকর্তাকে ঘুষ দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। তারপর এখানকার সেপাই-চৌকিদারদের চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তারা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্যমনস্ক হয়ে আছে, আর সেই ফাঁকে ভৈরব তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছে! কিন্তু এমন চমৎকার চালাকি খাটিয়েও ভৈরব বোধহয় শেষরক্ষা করতে পারেনি। লামার দল তাদের আবিষ্কার করে ফেলেছে, জয়ঢাক প্রভৃতি বাজিয়ে তাই তারা করেছে সাহায্যপ্রার্থনা! এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল! এখন নাটকের শেষ-অঙ্কের অভিনয় হচ্ছে,—চলো, চলো, আমাদের যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হতে হবে!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভৈরবের পুনঃপ্রবেশ

আমরা যখন গুরলার উপরে উঠে ওপাশের উতরাই দিয়ে নীচের দিকে নামছি, তখন চাঁদের আলো ধীরে ধীরে ঊষার আলোর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে! কোনও অদৃশ্য চিত্রকর যেন দু-রকম আলো-রং একসঙ্গে মিলিয়ে নতুন কোনও অপূর্ব ছবি আঁকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন!

কুয়াশার ভিতর থেকে যেন রূপকাহিনীর মায়াজগৎ একটু-একটু করে আত্মপ্রকাশ করছে। ক্রমে কুয়াশার স্বপ্ন-যবনিকা বিরাট কোনও রঙ্গালয়ের অর্ধ-স্বচ্ছ পাতলা পরদার মতো ধীরে ধীরে শূন্যে উপরে উঠতে লাগল দুলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে!

ওই সেই ভুবনবিখ্যাত কৈলাস পর্বত,—নীলিমার কোলে যেন তুষারে-গড়া বিরাট এক শিবলিঙ্গ! গৌরী ঊষার অরুণ কিরণ-কুসুম প্রভাতী পূজার নিবেদনের মতো মহাতাপস শিবের তুষার-কান্তির উপরে এসে পড়ে তাকেও রাঙা করে তুললে!

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এ কী! সরোবর, না সাগর? নীলাকাশের অসীমতার তলায় আর এক বিপুল নীলিমার সৃষ্টি করে রাবণ হ্রদ প্রভাতের প্রথম আলোকের আশীর্বাদ গ্রহণ

করছে! ধু-ধু-ধু প্রস্তরময়প্রান্তরে মাইলের পর মাইল থই-থই করছে অগাধ জলের রাশি! স্বপ্নাতীত মহাবিস্ময় যেন মূর্তি ধরেছে!

এমন মনোহর সরোবর, যেখানে এলে তপস্যা করতে সাধ যায়, সেখানে কিন্তু লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত দেখলুম না। মরুভূমিতেও লোকের বসতি থাকে, কিন্তু এ যেন অভিশপ্তের মুলুক! সেইজন্যেই কি একে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল বলে ডাকা হয়? মনে পড়ল, পথে একজন লোক সাবধান করে দিয়েছিল যে, রাক্ষস তালের রূপ দেখে ভুলে যেন তার জলে নামতে না যাই! কেন, এখানে তো ভয়ের কিছুই দেখছি না! কিন্তু একটু পরেই আমরা ভয়ের কারণ বুঝতে পারলুম!

রামহরি শিবলিঙ্গরূপী আশ্চর্য কৈলাস-শিখর দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বোম মহাদেব! আজ আমার জন্ম সার্থক হল!'—বলেই সে পাহাড়ের উপরে দণ্ডবত হয়ে শুয়ে পড়ে প্রণামের পর প্রণাম ঠুকতে লাগল!

আমিও কৈলাসের সূর্যোদয় দেখতে দেখতে ভুলে গেলুম আর সব কথা।

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো,—ও কী কাণ্ড!'

চমকে ফিরে কুমারের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবিস্ময়ে দেখলুম, রাবণ হ্রদের পাশ দিয়ে নানা-রঙা নুড়ি-ছড়ানো পথে ছয়-সাতজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে গুরলার দিকেই!

কে ওরা? দূর থেকে চেনা গেল না! কিন্তু অমন করে ছুটছে কেন? যেন ওদের বাঘে তাড়া করেছে!

তারা আরও কাছে এসে পড়ল! ক্রমে আরও কাছে!

এমন সময়ে তাদের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে দেখা গেল পিঁপড়ের সারির মতো দলে দলে লোক! তারাও ছুটে আসছে! তাহলে প্রথম দল পালাচ্ছে ওদেরই ভয়ে?

বিমল উৎকট আনন্দপূর্ণ স্বরে বললে, 'কুমার, আমাদের প্রিয়বন্ধু ভৈরব আর তার স্যাঙাতদের চিনতে পারছ কি? পিছনে তিব্বতি পঙ্গপাল নিয়ে ওরা এইদিকেই আসছে!'

ভৈরব, ভৈরব! আবার তাহলে ভৈরবের সঙ্গে দেখা হল,—আমার পিতৃহত্যাকারী ভৈরব! হ্যাঁ, আজ আমি তার সঙ্গে শেষবার দেখা করতে চাই!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই হাতে বড়ো বড়ো এক-একটা বাক্স রয়েছে কেন?'

বিমলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'ওগুলোকে বড়ো বাক্স না বলে ছোটো সিন্দুক বলাই উচিত! ওগুলোর ভিতরে কী আছে?'

রামহরি আমাদের সকলের মনের সন্দেহ ভাষায় প্রকাশ করে বললে, 'গুপ্তধন নয় তো?'

বিমল বললে, 'তা ছাড়া আর কী হতে পারে? প্রাণের ভয়ে পালাবার সময়েও ওরা যখন সিন্দুকগুলো ছাড়েনি, তখন ওদের মধ্যে খুব দামি জিনিস ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারে না!'

রামহরি আশ্চর্য স্বরে বললে, 'ওরা যকের ধন নিয়ে এল, ভূত কিছু বললে না!'

খেদে দুঃখে আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার মতো হল! সাত ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে হাজির হলুম কি এই দেখবার জন্যে?

কুমার আমার চিন্তার প্রতিধ্বনি করে বললে, 'বিমল, বিমল! আমাদের চোখের সামনে ওরা গুপ্তধন নিয়ে পালাবে, আর আমরা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব?'

বিমল বললে, 'ওরা আর কোথায় পালাবে কুমার? ওদের পিছনে পঙ্গপালের মতো শত্রু, ওদের একপাশে পাহাড়, আর একপাশে হ্রদ, ওদের সুমুখে আছি আমরা,—আর ওরা এদিকেই আসছে সিন্দুকগুলো আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে! আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল!

আমি এখন খালি এই কথাই ভাবছি যে, সিন্দুকগুলো ওদের হাত থেকে নিতে কত সময় লাগবে? তার মধ্যে তিব্বতি হনুমানগুলো কাছে এসে পড়বে না তো? আমাদেরও তো যথাসময়ে পালাতে হবে?'

কুমার বললে, 'তিব্বতিরা এখনও অনেক তফাতে আছে, আমাদের কাছে আসতে হলে এখনও ওদের আধমাইল পথ পার হতে হবে!'

আমি ব্যগ্রভাবে বললুম, 'কিন্তু ভৈরবরা যে এসে পড়ল! ওরাও আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে!'

বিমল বললে, 'ওদের পালাবার আর কোনও পথ নেই! আবার ধরো বন্দুক! অগ্রসর হও!'

বন্দুক তুলে আমরা বেগে তাদের আক্রমণ করতে ছুটলুম!

প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভৈরবরা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল,—আমাদের এখানে দেখবার জন্যে ওরা কেউই প্রস্তুত ছিল না! ভৈরব একবার পিছনপানে তাকালে, কিন্তু সেদিকের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর! কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে, জনতার যেন শেষ নেই! এ জনতা-সাগর কাছে এসে পড়লে ভৈরবের সঙ্গে আমাদেরও কোথায় তলিয়ে যেতে হবে!

বিমল একবার বন্দুক ছুড়লে,—বোধহয় ভৈরবকে ভয় দেখাবার জন্যেই, কারণ গুলি কারুর গায়েই লাগল না!

ভৈরব মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে বললে, 'ভাই-সব! জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো! সাঁতার দাও!'

চোখের নিমেষে তারা সাতজনেই রাবণ হ্রদের দিকে ফিরল!

বহুদূর থেকে তিব্বতিদের কণ্ঠে আবার প্রায় সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর চিৎকার জেগে উঠল—তারাও ভৈরবদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে! কিন্তু তারা চ্যাঁচালে কেন? ওরা জলে ঝাঁপ দিলে গুপ্তধনের সিন্দুকগুলো ডুবে যাবে বলে?

বিমল অট্টহাস্য করে চেঁচিয়ে বললে, 'আর কোথায় যাবে তুমি ভৈরব? তুমি যদি জলে ঝাঁপ দাও, আমি পাতালে গিয়েও তোমাকে ধরব!'

কুমার বললে, 'হয় বাক্সগুলো দাও, নইলে জলে পড়েও বাঁচবে না!'

কিন্তু তারা কেউ আমাদের কথায় কানও পাতলে না—একবার ফিরেও তাকালে না! আমরা তাদের কাছে যাবার আগেই তারা অতি বেগে রাবণ হ্রদের মধ্যে গিয়ে পড়ল!

তারপরেই চোখের সুমুখে যে অভাবিত ও ভয়ানক দৃশ্য জেগে উঠল তা আমাদের সকলেরই দেহ প্রস্তর-মূর্তির মতো আড়ষ্ট করে দিলে! সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলুম, এই হ্রদের নাম রাক্ষস তাল হয়েছে কেন? আমি হলে এ হ্রদের নাম রাখতুম 'মৃত্যু-সায়র'! সে দৃশ্যের কথা মনে হলে ভয়ে এখনও আমার সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে যায়! কিন্তু হয়তো এটা বিধাতার দেওয়া শাস্তি!

ভৈরবের দলের ছয়জন লোক দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ঠিক পাগলের মতোই জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল! কিন্তু হাঁটুজলে গিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তাদের প্রত্যেকের দেহ কোমর পর্যন্ত হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তারা সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল!

তারপর দেখতে দেখতে তাদের বুক পর্যন্ত ডুবে গেল—যেন পাতাল তাদের পা ধরে সজোরে আকর্ষণ করছে!

রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—'চোরাবালি! চোরাবালি!'

অভাগারা পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে বললে, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'—কিন্তু জীবন যেতে বসেছে, তবু তারা সিন্দুকগুলো ছাড়লে না—বরং যেন আরও-বেশি জোরে দুই হাতে বুকের উপরে আঁকড়ে ধরে রইল! আমার বিশ্বাস, ওই সিন্দুকগুলোর ভারেই তাদের দেহ বেশি-শীঘ্র চোরাবালির মধ্যে বসে যাচ্ছে!

রামহরি আবার চ্যাঁচালে—'লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো! লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো!'

কিন্তু কে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে? তখন তাদের গাল পর্যন্ত বসে গেছে এবং মুখ খালি চিৎকার করছে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে!

বিমল একবার জলের ভিতরে পা বাড়াল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তারও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল!

রামহরি একলাফে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড টান মেরে তাকে সরিয়ে আনলে!

বিমল বললে, 'এ কী ভয়ানক মৃত্যু! আমরা কি কোনও সাহায্যই করব না?'

কুমার বললে, 'নিজেদের প্রাণ দিয়ে? দুরাত্মাদের জন্যে আমি প্রাণদান করতে রাজি নই!'

তখন কারুর দেহ একেবারে তলিয়ে গিয়েছে, কারুর কেবল মাথা দেখা যাচ্ছে এবং কোথাও বা একখানা হাতমাত্র জলের উপরে জেগে ছটফট করছে!

কিন্তু পালের গোদা ভৈরব ছিল সর্বশেষে, ঝাঁপ দেবার আগেই দলের লোকের অবস্থা দেখে সে আর জলে নামেনি!

এতক্ষণ সে আড়ষ্টের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, প্রবল উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি!

আমরাও এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে হঠাৎ অমন মৃত্যুফাঁদে পড়তে দেখে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলুম।

এখন আমার হুঁশ হল! তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি ভৈরব যেখানে ছিল সেখানে আর নেই!

সেও জলে ঝাঁপ দিলে নাকি? না, তাহলে এত-শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে যেত না!

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিব্বতিরা চিৎকার করতে করতে অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। সেদিকেও ভৈরব নেই!

চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল! কুমার! ভৈরব কোথায় গেল?'

তারা বিদ্যুৎ-বেগে ফিরে দাঁড়াল! এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বিমল বললে, 'ভৈরব কী আবার ফাঁকি দিলে?'

রামহরি বললে, 'ওই যে, শয়তান পাহাড়ে উঠছে!'

তাই তো! সিন্দুকটা কাঁধে করে ভৈরব দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে!

বিমল বললে, 'ভৈরব, যদি বাঁচতে চাও এখনও দাঁড়াও!'

ভৈরব দাঁড়াবার নামও করলে না!

বিমল বললে, 'প্রাণ থাকতে তোমাকে পালাতে দেব না! বাঘা!'

বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিমল হাত দিয়ে ভৈরবকে দেখিয়ে ইশারা করে বললে, 'বাঘা! ধর ওকে!'

বাঘা লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের দিকে ছুটল এবং আমরাও তার অনুসরণ করলুম!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যবনিকা পতনের আগে

মেঘলোকবাসী পবিত্র কৈলাস-শিখর এবং হিমাচলবাসী আরক্ত প্রভাতসূর্য নীলপদ্মনীল রাবণ হ্রদকে দেখে আসছে না জানি কত হাজার হাজার শতাব্দী ধরে; এই নির্জন তটভূমিতে গীতকারী পাখির তান বা হরিৎ অরণ্যের গান পর্যন্ত জাগে না, মাঝে মাঝে এখানকার ধ্যানমৌন বিজনতা ভঙ্গ করে শ্রান্তদেহে পথ পেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় কেবল মানস সরোবর ও কৈলাসের যাত্রীরা! কিন্তু এখানে আজ অকস্মাৎ যে মৃত্যু-দৃশ্যের অভিনয় চলছে, সৈন্যদল চলাচল করছে, আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করছে, মহাদেব ও সূর্যদেব তা দেখে কি বিস্মিত হচ্ছেন না?

এখনও বুঝতে পারছি না এই সাংঘাতিক নাটকের সমাপ্তি কোথায়? একটা ঘটনা শেষ হতে না হতেই নূতন ঘটনার আবির্ভাব হচ্ছে, একটা বিপদের পিছনে ছুটে আসছে আর-একটা বিপদ, যেন বায়োস্কোপের এক অনন্ত 'সিরিয়াল' ছবি! কিন্তু ভৈরবের মতন পিচ্ছল দুরাত্মা আমি কোনও চলচ্চিত্রেও দেখিনি! আজ ভাবলুম সব লুকোচুরি শেষ হল—কিন্তু আবার সে পালিয়ে গেল আমাদের হাত পিছলে!

পাহাড়ের অপথ-বিপথ দিয়ে একটা সিন্দুক ঘাড়ে করে মানুষ যে এত তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে পারে, আজ স্বচক্ষে ভৈরবের পলায়ন না দেখলে কখনও আমি বিশ্বাস করতুম না! প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এই বুঝি সে পা হড়কে আছাড় খেয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়ে, কিন্তু তার পরেই দেখি, সে নিজেকে আশ্চর্য ভাবে সামলে নিয়ে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফ মারছে! মানুষ এমন মরিয়াও হতে পারে!

বাঘা যদি সমতল ক্ষেত্রে থাকত, তাহলে ভৈরবকে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারত! কিন্তু এই দুরারোহ পাহাড়ের উপরে উঠে ভৈরবকে ধরা তার পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠল! শেষ পর্যন্ত সে হয়তো ভৈরবকে ধরতেই পারবে না!

আমরাও প্রাণপণে পাহাড়ে উঠছি। উঠতে উঠতে আমি বললুম, 'বিমল, ভৈরবকে ধরবার ঝোঁকে নিজেদের বিপদের কথা যেন ভুলে যেয়ো না! পিছনে তিব্বতি সেপাইরা আছে, তারা আর মিনিট ছয়-সাতের মধ্যেই পাহাড়ের তলায় এসে পড়বে!'

বিমল প্রায় ডিগবাজি খেয়ে নীচে থেকে উপরের একখানা পাথরে উঠে বললে, 'আমি তাদের কথা ভুলে যাইনি। কিন্তু তারা বোধহয় অনেকক্ষণের জন্যেই আমাদের কথা ভুলে যাবে!'

কুমার হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঢালু জায়গা পার হয়ে বললে, 'কেন?'

—'গুপ্তধন যে কারা চুরি করেছে সেটা তারা স্বচক্ষেই দেখেছে। আর এটাও তাদের চোখ এড়ায়নি যে, চোরেরা সিন্দুক জড়িয়ে হ্রদের চোরাবালির তলায় আশ্রয় নিয়েছে! তখন তারা অত চ্যাচাচ্ছিল কেন জানো? হ্রদ যে বিপজ্জনক, নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে চোরদের সাবধান করবার জন্যে! চোরদের প্রাণের চেয়ে তাদের কাছে ঢের বেশি মূল্যবান হচ্ছে ওই সিন্দুকগুলো! আমার বিশ্বাস এখন তারা চোরাবালির ভিতর থেকে রত্নোদ্ধার করতেই ব্যস্ত থাকবে। সে বড়ো অল্প সময়ের কাজ নয়—ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে সরে পড়তে পারব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা চোর যে সিন্দুক নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠেছে!'

—'গোলমালে আমরাই যা প্রথমে দেখতে পাইনি, অতদূর থেকে তিব্বতিরা কি সেটা লক্ষ করতে পেরেছে?'

এখন ভৈরব বা বাঘা কারুকেই দেখা যাচ্ছে না, কেবল পাহাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে বাঘার চিৎকার! সেই চিৎকার শুনেই বুঝতে পারছি কোন দিকে যেতে হবে!

কুমার ক্রুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'রাস্কেল ভৈরব! আমার যে দম ছুটে গেল! এখনও সে কতদূরে আছে?'

বিমল বললে, 'বোধহয় আর বেশি দূরে নেই! খুব কাছেই বাঘার চিৎকার শোনা যাচ্ছে!'

—'লোকটার গায়ে শক্তি তো কম নয়! অত বড়ো একটা বোঝা নিয়ে এখনও এই পথ দিয়ে উঠতে পারছে!'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'হুঁ। বলবান বটে!'

এমন সময়ে একটা উঁচু পাথরের উপরে লাফিয়ে উঠেই দেখি, সামনেই খানিকটা সমতল জায়গা এবং তার উপর দিয়ে প্রথমে ভৈরব ও তার পিছনে বাঘা বেগে দৌড়াদৌড়ি করছে!

আমি মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বিমল! কুমার! এই যে ভৈরব!'

তারাও এক এক লাফে আমার পাশে এসে দাঁড়াল!

ভৈরব বাঘাকে এড়াবার জন্যে শেষে সিন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়েই ছুটতে শুরু করলে—কিন্তু বাঘা এখন সমতল জমি পেয়েছে, তার সঙ্গে ভৈরব পারবে কেন?

বাঘাকে তখন দেখলে সত্যই ভয় হয়! তার বাঘের মতন ছোপ-ধরা প্রকাণ্ড দেহ ক্রোধে ফুলে যেন আরও বড়ো হয়ে উঠেছে, রাঙা-টকটকে জিভখানা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, পথশ্রমে মুখের দুপাশ দিয়ে ফেনা ঝরছে, বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতগুলো শিকার ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তীক্ষ্ণ দুটো চক্ষুতে ফুটেছে ক্ষুধিত হিংসার বিদ্যুৎ! সে একবার মস্ত লাফ মেরে

ভৈরবের বুক পর্যন্ত উঠে তার গলা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, ভৈরব তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্যদিকে ছুটে গেল!

কুমার উৎসাহে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাহ্‌বা বাঘা! বাহাদুর বাঘা! ধর ওর টুঁটি কামড়ে!'

ভৈরব ছুটতে ছুটতে বিষম চেঁচিয়ে বললে, 'রক্ষা করো! আমি ধরা দিচ্ছি!'

কুমার বললে, 'বাঘা, থাম!'

বাঘা অমনি দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন নিশ্চল মূর্তি! আশ্চর্য শিক্ষিত কুকুর!

আমরা সকলে যখন ভৈরবের চারপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে তখন দুই হাতে ভর রেখে মাটিতে বসে পড়ে হেঁটমুখে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে!

খানিকক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম—এমন ভয়ানক মানুষ দ্রষ্টব্য জীবই বটে! আমাদেরই মতন দেখতে তার দেহ, কিন্তু তার মন যে কোনও পশুর চেয়েও হীন! এক-একজন মানুষকে সৃষ্টিকর্তা এমন করে গড়েন কেন?

বিমল তার সামনে বসে পড়ে বললে, 'তারপর ভৈরব! এখন কী করা যেতে পারে তোমাকে নিয়ে?'

ভৈরব তার তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটো তুলে হেসে বললে, 'আমাকে নিয়ে? কী করতে চাও তুমি?'

বিমল বললে, 'আমি কী করতে চাই? আচ্ছা, আগে তোমার কীর্তিকলাপের ফর্দটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। প্রথমত, তুমি দিলীপের বাবাকে হত্যা করেছ। দ্বিতীয়ত, তুমি কিষণ সিংকে হত্যা করেছ। তৃতীয়ত, তুমি আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করেছ। বার বার গুপ্তধনের ম্যাপ চুরি, আমাদের পিছনে তিব্বতিদের লেলিয়ে দেওয়া, তোমার এ-সব কীর্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এখন তুমিই বলো দেখি, আমাদের কাছ থেকে কতটুকু দয়া তোমার প্রত্যাশা করা উচিত?'

ঘৃণায় ওষ্ঠাধর বেঁকিয়ে ভৈরব ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'দয়া? দয়া আমি কারুর কাছেই প্রত্যাশা করিনি! আমি আমার কর্তব্যপালন করেছি। দিলীপের ঠাকুরদা আমার বাবাকে খুন করেছিল। আমি তারই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।'

আমি বললুম, 'মিথ্যা কথা!'

—'মিথ্যা কথা? জানো তুমি দিলীপ, গুপ্তধনের গুহায় গিয়ে আমি আমার বাবার কঙ্কাল আবিষ্কার করেছি? সেই কঙ্কালের পাশে এখনও একখানা ছোরা পড়ে আছে! তিব্বতিদের ভয়ে তোমার ঠাকুরদা আমার বাবাকে মেরেও গুপ্তধন আনতে পারেনি। এ-সব কথা আমি আমার মায়ের মুখে শুনেছি।'

বিমল বললে, 'তোমার বাবা হয়তো তোমার মতোই সাধু ছিলেন! হয়তো তাঁকে মেরে দিলীপের ঠাকুরদা কোনও অন্যায়ই করেননি—যেমন আজ তোমাকে বধ করলে আমাদেরও কোনও অন্যায় হবে না।'

ভৈরব অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তোমাদের সঙ্গে আমি আর কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। তোমরা জিতেছ, আমি হেরেছি। যদিও আসলে জয়ী হয়েছি আমিই। কারণ গুপ্তধনের গুহায় তোমরা ঢুকতে পারোনি, কিন্তু পথ থেকে সমস্ত বাধা সরিয়ে

আমিই সেই বিশাল গুহা আবিষ্কার করেছি, তার ভিতরে ঢুকেছি, সেখানকার কুবেরের ঐশ্বর্য স্বচক্ষে দেখেছি। যে অফুরন্ত ধনরত্ন সেখানে থরে থরে সাজানো আছে, তোমরা কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি তার কয়েকটি কণা মাত্র! আমার দলের লোকরা যদি নিরেট বোকার মতো আচ্ছন্ন আর অবাক হয়ে, আমার নিষেধ অমান্য করে গুহার ভিতরে অতক্ষণ বসে না থাকত, বিহ্বল হয়ে গোলমাল না করত, যথাসময়ে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে তিব্বতি বানরগুলো কিছুই টের পেত না, তোমরাও আমাদের ধরতে পারতে না, আর আমার সঙ্গীদেরও পাতালপ্রবেশ করতে হত না। এই সিন্দুকগুলো পাহাড়ের অন্য কোনও গুহায় লুকিয়ে রেখে, আমরা আবার সেখানে যেতুম, আবার আরও ধনরত্ন নিয়ে আসতুম! কিন্তু সেখানে যাবার পথ এখন একেবারে বন্ধ,—তিব্বতিরা সাবধান হয়ে গেছে, তোমরাও তাদের চোখে আর ধুলো দিতে পারবে না! এখন এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্ছে যে, নিয়তির চক্রান্তে সফল হয়েও আমি বিফল হয়েছি বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তোমাদেরও সব আশা নির্মূল হয়েছে!'—এই বলে সে পাগলের মতো অট্টহাস্য করে উঠল!

বিমল গম্ভীর ভাবে বললে, 'ভৈরব, তোমার বক্তৃতা এতক্ষণ ধরে শুনলুম। এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, অতঃপর তোমাকে নিয়ে কী করা যেতে পারে?'

ভৈরব সগর্বে বললে, 'তোমরা আমাকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারো, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। তোমরা চারজন, আমি একলা। তোমাদের অস্ত্র আছে, আমি নিরস্ত্র—গুহা থেকে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে আমার বন্দুকটা পর্যন্ত ফেলে এসেছি। কাজেই তোমাদের বাধা দেবার কোনও শক্তিই আমার নেই।'

বিমল মৃদু হেসে হাতের বন্দুকটা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলে। কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটাও বার করে রামহরির হাতে দিলে। তারপর ধীর স্বরে বললে, 'আমিও এখন তোমার মতোই নিরস্ত্র।'

—'আর তোমার দলের লোকরা?'

—'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার দলের কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না।'

ভৈরব বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'তোমার উদ্দেশ্য কী?'

বিমল শান্ত স্বরে বললে, 'আমি আগে ন্যায়যুদ্ধে একলা তোমার দর্পচূর্ণ করতে চাই। তারপর ভেবে দেখব, কোন শাস্তি তোমার উপযুক্ত।'

—'তুমি আমার সঙ্গে হাতাহাতি লড়বে?'

—'হ্যাঁ।'

—'যদি আমি জিতি?'

—'তাহলে তুমি স্বাধীন! ওই সিন্দুকটা নিয়ে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো!'

মহা আনন্দে ভৈরবের দুই চক্ষু জ্বল-জ্বল করতে লাগল! সে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'তাহলে ধরে নাও, আমি এখনই স্বাধীন হয়েছি! আমার এই হাত দুখানা দেখছ তো?

এই দুখানা হাত অনেক বড়ো বড়ো পালোয়ানকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। খালি হাতে তোমরা চারজনও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমি হাসতে হাসতে লড়তে রাজি আছি!'

বিমল হেসে বললে, 'তোমাকে আর অতটা বাহাদুরি দেখাতে হবে না। তুমি কেবল আমার সঙ্গেই লড়ো!'

ভৈরব যখন তার বিপুল দেহ আরও ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন বিমলের জন্যে আমারও ভয় লাগল! বিমলের চেয়ে তার চেহারা কেবল বড়োই নয়, জোয়ানও বটে!

রামহরি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'খোকাবাবু, ও-পাপিষ্ঠের সঙ্গে তোমার আর লড়ে কাজ নেই!'

বিমল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তুমি থামো রামহরি!'

কুমারের দিকে তাকালুম, সে কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্তের মতো দুই পা ছড়িয়ে বসে বাঘার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—তার মুখে মৃদু মৃদু হাসি! যেন যুদ্ধের ফল কী হবে সেটা সে এখন থেকেই জানে!

বিমল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভৈরব, তুমি কী লড়বে? কুস্তি, ঘুসি, না যুযুৎসু?'

—'কুস্তি!'

কুমার বললে, 'কিন্তু সাবধান ভৈরব! অন্যায় যুদ্ধ করলে আমাদের কাছ থেকে তুমি একতিল দয়াও পাবে না!'

ভৈরব নির্দয় হাস্য করে বললে, 'একটা তুচ্ছ লোককে হারাবার জন্যে অন্যায় যুদ্ধের দরকার হবে না! তোমার বন্ধুকে আমি ধরব, আর আছাড় মারব! হুঁশিয়ার!'

বুনো মোষের মতো সে তেড়ে এসে বিমলকে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বিমল সাঁৎ করে তার নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল! ভৈরব আবার সেই চেষ্টা করলে, কিন্তু সেবারেও কোনও সুবিধা করতে পারলে না!

আমি বিমলের শক্তির কথা ঠিক জানি না, কিন্তু গোড়াতেই এটা বুঝতে পারলুম যে, ভৈরবের চেয়ে তার গতি বেশি ক্ষিপ্র!

ভৈরব আবার আক্রমণ করলে, কিন্তু এবারে বিমল আর সরে গেল না, দুজনেই দুজনের কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল এবং দুজনেই দুজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলবার জন্যে প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল!

উত্তেজনায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল—এইবারেই আসল পরীক্ষা!

বিমলের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভৈরবের মুখ দেখলুম রাঙা-টকটকে হয়ে উঠেছে! নিশ্চয়ই দেহের সমস্ত শক্তি সে ব্যবহার করছে!

কিন্তু বিমল ভূমিসাৎ হল না, হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিলে। বুঝলুম, ভৈরবের চেয়ে সে বেশি-কৌশলী!

আবার দুজনে খানিকক্ষণ জড়াজড়ি হল, আবার ভৈরবের পেশিস্ফীত বাহু ছাড়িয়ে বিমল সরে এল।

ভৈরব হাঁপাতে শুরু করলে, কিন্তু বিমলের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। বুঝলুম, বিমলের দম বেশি! আমার মনে আশার উদয় হল।

ভৈরব এতক্ষণ লড়ছিল হাসতে হাসতে। কিন্তু তার মুখ এখন গম্ভীর। সে বুঝে নিয়েছে, কেবল গায়ের জোরে বিমলকে সহজে কাবু করা যাবে না, এবং তাকে তাড়াতাড়ি কাবু করতে না পারলে শেষটা হয়তো দমের জোরেই বিমল তাকে কাবু করে ফেলবে!

এতক্ষণ বিমল শুধু আত্মরক্ষাই করছিল, এইবারে হঠাৎ বেগে আক্রমণ করলে, বোধ হয় সে ভৈরবের শক্তির মাত্রা বুঝে নিয়েছে!

ভৈরব তার আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—বিমল তাকে মাটি থেকে দুই হাত উঁচুতে তুলে হাত-চারেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে!

তার শক্তি সম্বন্ধেও আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না, সানন্দে আমি কুমারের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখি, সে তখনও সেই ভাবে বসেই বাঘার গায়ে সাদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণে তার নিশ্চিন্ততার কারণ বুঝলুম! বিমলের ক্ষমতা সে জানে!

ভৈরবের মুখের ভাব তখন ভয়ানক! মাটির উপরে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে রাগে অজ্ঞানের মতো বেগে ছুটে এল, কিন্তু এবারে বিমল আর তাকে এড়াবার চেষ্টা করলে না, সে কাছে আসতেই কী-এক কৌশলে তার দেহকে চোখের নিমেষে আবার শূন্যে তুলে ভূতলে নিক্ষেপ করলে!

ভৈরব বেজায় হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠে দাঁড়াল, তার গায়ের জোরের গর্ব আর রইল না!

কুমার অবহেলা ভরে বললে, 'বিমল, ওকে চিত করে এবারে এই বেলে-খেলা সাঙ্গ করে দাও!'

—'হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি' বলেই বিমল আবার বেগে অগ্রসর হল, কিন্তু হঠাৎ একখানা বড়ো পাথরে হোঁচট খেয়ে ভূমিতলে পড়ে গেল!

চোখের পলক না পড়তেই ভৈরব প্রকাণ্ড একখানা প্রস্তর তুলে নিয়ে বিমলের মাথার উপরে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল—

এবং সেই মুহূর্তেই অতি-সতর্ক রামহরির হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল!

বিমল যখন উঠে দাঁড়াল, দুরাত্মা ভৈরবের দেহ তখন মাটির উপরে স্থির হয়ে পড়ে আছে!

বিমল এগিয়ে গিয়ে তার দেহটাকে নেড়েচেড়ে বললে, 'পৃথিবীকে আর এর ভার সইতে হবে না। গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করেছে।'

বিমল সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললে।

তার ভিতরে তাকিয়ে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল! হিরে, চুনি, পান্নার ছড়াছড়ি! পায়রার ডিমের মতো বড়ো বড়ো মুক্তো! এ কী অসম্ভব দৃশ্য! আমার মাথা ঘুরতে লাগল!

বিমল সহাস্যে বললে, 'দিলীপ, এখানে যা আছে তাই দিয়েই তুমি একটা রাজ্য কিনতে পারো। এ সব এখন তোমার!'

আমি বললুম, 'না, না,—এ ধনরত্ন আমরা সবাই সমান ভাগ করে নেব!'

কুমার মাথা নেড়ে কঠোর কণ্ঠে বললে, 'আমরা এখানে এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে,—তোমার দান গ্রহণ করতে নয়!'

বিমল বললে, 'আমারও ওই মত। কিন্তু আপাতত রত্নগুলো ওর ভিতর থেকে বার করে নিয়ে প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে কিছু কিছু লুকিয়ে রাখো। ও সিন্দুক ঘাড়ে নিয়ে যেতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই ধরা পড়ব।'

তাড়াতাড়ি সিন্দুক খালি করে ফেলে আমরা দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে এলুম।

রত্নশূন্য সিন্দুক ও জীবনশূন্য ভৈরবের দেহের দিকে কৈলাসের রক্তমুখ দীপ্ত সূর্য তাকিয়ে রইল নিষ্পলকনেত্রে।